রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়

ডক্টর [illegible] মুখোপাধ্যায়

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

RABINDRA KABYER SHES PARYAY
BY DR. KHANA MUKHOPADHYAY

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৬৩

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

আমার কাকা
৺হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় শেষ ষোলো বছরের রচনার (১৯২৫-১৯৪১) বিচার-বিশ্লেষণ এই আলোচনায় গ্রহণ করেছি। কবির প্রথম জীবনের কাব্য এবং শেষ জীবনের কাব্য রূপ এবং প্রকৃতির দিক থেকে দুটি আলাদা মেরুতে অবস্থান করছে। তবে আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করেছি যে দু'যুগের কাব্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল প্রবণতার দিক থেকে পার্থক্য সামান্যই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের পরিধির মধ্যেই বাংলা দেশ তথা সমগ্র পৃথিবীর সমাজ-পরিবেশে নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বাংলা দেশে স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের প্রসার ঘটেছিল যখন, রবীন্দ্রনাথ তখন বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে কাব্য রচনা করেছেন, আবার রবীন্দ্রকাব্যের অস্তলগনে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে যুদ্ধের হুঙ্কার, মানুষের প্রভুত্ব-লোভ এবং ধনগর্ব, যা সভ্যতার এক কলঙ্কময় অধ্যায়। বাংলা দেশের, বিস্তৃত অর্থে ভারতবর্ষের, প্রায় পঞ্চাশ বছরের উত্থান-পতনের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্য ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে—তাঁর কাব্য-আলোচনায় এই দিকটির প্রতি আলোক-পাতের প্রয়াস পেয়েছি। রবীন্দ্রকাব্যের প্রকাশ এবং পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করে মোটামুটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে এই শেষ পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকটি মৌলিক চিন্তার ক্রমবিবর্তন দেখাবার চেষ্টা করেছি।

যিনি আমাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ দিয়ে কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন তিনি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহোদয়। তিনিই এই গবেষণা-নিবন্ধের নির্দেশক ছিলেন। নিজস্ব বহু গ্রন্থের অবাধ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে তিনি আমার উপকরণ সংগ্রহের পথ সুগম করেছেন। এইরূপ সক্রিয় সংযোগিতা ব্যতীত এই দুরূহ কার্য সম্পাদন এক প্রকার অসম্ভব ছিল। অতিশয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি স্নেহবশতঃ গ্রন্থখানির একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

সাহিত্য পাঠের হাতেখড়ি যাঁদের কাছে, উইমেনস্ ক্রীশ্চান কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী অলকা আমেদ এবং বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীমতী অমিতা মিত্রের সস্নেহ উপদেশের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এঁদের তত্ত্বাবধানে আমার শিক্ষার্থী-জীবন অতিবাহিত হয়েছে, এঁদের স্নেহচ্ছায়ায় আমার কর্মজীবনের প্রারম্ভ। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। অন্যান্য সহযোগিতা যাঁর কাছে পেয়েছি তিনি সহকর্মী অধ্যাপিকা শ্রীমতী সাগরিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবশেষে 'জিজ্ঞাসা'র শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। এই গ্রন্থ প্রকাশের মূলে তাঁর সহৃদয়তা ও সহানুভূতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানি প্রকাশনার ব্যাপারে নানাভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

খনা মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাসেও কবি, আর কিছু নন। যে বয়সে মানুষ ভূমির সম্পর্ক পরিত্যাগ করে ভূমার দিকে আকৃষ্ট হয়, সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথ ভূমার সকল প্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করে ভূমিকে আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বক্ষেত্র তাঁর কাব্য, সেইজন্য তার প্রতি তাঁর এই নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে এবং সে নিষ্ঠা যে কত গভীর এবং কত আন্তরিক, তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোই তার প্রমাণ। কারণ, শেষ জীবনের সাধনার মধ্য দিয়েই মৌলিক জীবনাদর্শের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায়; মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তিতে নাকি মানুষ মিথ্যা কথা বলে না।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, মনন ও সৃষ্টিশক্তি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। এমন কি, শেষ জীবনে তা আরও স্বচ্ছ হয়েছিল, রবীন্দ্র-জীবনে তাও একটি পরম বিস্ময়। বাংলা সাহিত্যের আর কোনো লেখকের পক্ষে তাঁর শেষ জীবন এতখানি সুস্পষ্ট জীবন-সচেতনতার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর জীবনের শেষ তিনখানি উপন্যাস রচনায় অধ্যাত্মবাদী হয়েছিলেন বলে অনেকেই মনে করে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্র-ভাবনা তার মর্ত্যপ্রীতি, মানব-প্রেম এবং সৌন্দর্যানুভূতি নিয়ে জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক অখণ্ড ধারায় অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। জীবনের প্রথম পর্যায়ে অনেক সময় তা ভাব-স্বপ্নে কখনো কখনো আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও শেষ পর্যায়ে এসে তা স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। সেইজন্য রবীন্দ্র-মানসের যথাযথ উপলব্ধিতে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলো যত সহায়ক, প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলো তত সহজে তা হতে পারে নি। সেইজন্যই তাঁর এই পর্যায়ের কবিতাগুলো বিশেষভাবে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী-সোনার তরী-চিত্রা' পর্যায়ের কাব্য-গ্রন্থগুলোর যত ব্যাপক অনুশীলন হয়েছে, তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতা-গুলোর বহুকাল পর্যন্ত তা বিশেষ কিছুই হয় নি।

কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের পর্যায় বিভাগের অর্থ এই নয় যে তা নতুন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ের সকল সংস্কার থেকে একেবারে সম্পূর্ণ মুক্ত

হয়েছে। এক অখণ্ড রবীন্দ্র-কবিমানসের ভিত্তির উপরই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য-সাধনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এমন কি, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কেবল মাত্র কাব্যই নয়, তাঁর নাটক, প্রবন্ধ, পত্রাবলী এমন কি, অনেক সময় তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কারণ এক অভিন্ন কবি-মানস সকল কিছুরই উৎস। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই একটি ভাবগত অখণ্ডতা অনুভব করা যায়। রবীন্দ্র-প্রতিভা একটি সহস্রদল পদ্মের মত, তার সমগ্র সত্তা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একটি অখণ্ড রূপে বিকাশ লাভ করেছে। সুতরাং তা খণ্ডে খণ্ডে কিংবা পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বিচার করাও কত দূর সমীচীন তাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর ভিতর দিয়ে জীবনের যে নূতন কোনো বাণী কিংবা জীবন-সত্য প্রচার করেছেন, তা নয়। যে কথা তিনি আগেও বলেছিলেন; সে কথাই তিনি আরও সহজ করে বলেছেন মাত্র ; পৃথিবী তখন তাঁর কাছে আরও আপনার হয়েছে, তাকে তিনি তাঁর দীর্ঘ-জীবনের মধ্যে আরও নিবিড় করে আরও কাছে থেকে পেয়েছেন, স্বপ্ন কিংবা কল্পনার সকল ব্যবধান তখন তার সঙ্গে ঘুচে গেছে, তার আরও মুখোমুখী হয়ে তিনি তাকে খুঁটিনাটি করে দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছেন ; তার ভালো-মন্দ, তার ক্ষুদ্রতা, অসম্পূর্ণতা সব কিছুই তখন তিনি আরও নিবিড় করে গভীর ভাবে দেখেছেন, তারই ভিতর দিয়ে তার প্রতি তাঁর মমতা সহস্রগুণ বেড়েছে, তার মহিমা সহস্রগুণ তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। যে সত্য একদিন তিনি স্বপ্নে এবং কল্পনায় উপলব্ধি করেছিলেন, শেষ জীবনে তাই তিনি প্রত্যক্ষ রূপে লাভ করেছিলেন। সেইজন্য তার প্রতি সেদিন তাঁর যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আসন্ন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার আশঙ্কায় তিনি বেদনাবোধ করেছিলেন। সেই বেদনাতেই তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলো মধুর হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্য পাঠকের পক্ষে এই বিষয়টি বিশেষ করে বুঝবার প্রয়োজন আছে। কাব্যভাষার ঐশ্বর্য, কল্পনার সমৃদ্ধি, সৌন্দর্যানুভূতির গভীরতা ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনায় 'মানসী-সোনার তরী-চিত্রা'র যুগ রবীন্দ্র-সাধনার সমৃদ্ধতম যুগ। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার তা-ই যে একমাত্র বিশেষত্ব নয়, একটি উচ্চ জীবন-ভাবনা যে নিতান্ত সহজ, স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ এবং আরও ঘরোয়া-

ভাবেও প্রকাশ করা যায় এবং তা যে যথাযথই পাঠকের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে, তাও রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর মধ্য থেকে অনুভব করা যায়। সমৃদ্ধ ভাষা এবং বিচিত্র কাব্যালঙ্কার যে কাব্যের অনেক সময় ভাব স্বরূপ হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের সকল বহির্মুখী ভারমুক্ত কবিতাগুলো থেকে তা বুঝতে পারা যায়। একই রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর রচনায় দুই রূপে আবির্ভূত হয়েছেন—প্রথম জীবনে ভারযুক্ত রূপে, শেষ জীবনে ভারমুক্ত রূপে। বরং ভারযুক্তরূপে তাঁর ভাবনায় যে অস্পষ্টতা ছিল, শেষজীবনে ভারমুক্ত হয়ে তা থেকেও তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর একটি প্রধান গুণ এই যে, এখানে রবীন্দ্রনাথ পরম আশাবাদী। জীবনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে তাঁর মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে যে ভয় এবং আশঙ্কা দেখা দিয়ে কবি-চিত্তকে শঙ্কিত করে তুলেছিল, তা এ পর্যায়ের কবিতাগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। অপরিণত জীবনে পৃথিবীর রস ও সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে ভোগ করবার আগেই কবিমানসে যে মৃত্যুচিন্তা মধ্যে মধ্যে উদয় হয়েছে, তার মধ্যে স্বভাবতঃই মৃত্যুর নিষ্ঠুর রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর পার্থিব সুখদুঃখ ভোগজীবনের পরিসমাপ্তিতে তিনি প্রসন্ন হাস্যমুখে ধীরে ধীরে মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে তার সম্পর্কে আর কোনো ভয়, কোনো আশঙ্কা রইল না। এই মনোভাবের ভিতর দিয়ে তিনি মৃত্যুভয়কে জয় করলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, রবীন্দ্র-চিন্তাধারার মধ্যে যে আমরা এক অখণ্ডতা অনুভব করি, তা এখানে কি ভাবে রক্ষা পেয়েছে? জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি মৃত্যুভীত, শেষ পর্যায়ে তিনি তা থেকে মুক্ত, প্রসন্ন চিত্তে তিনি তখন মৃত্যুকে বরণ করছেন। এই দুই ভাবনার মধ্যে ঐক্য কোথায়? এদের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের কোন্ ধারণা ও বিশ্বাসকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি? এইখানেই তাঁর শেষ জীবনের কাব্যের মধ্যে আসতে হয়, শেষ জীবনের এই বিষয়ে যে উপলব্ধি, তাই সত্য বলে স্বীকার করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর কবিতার মধ্যে যে মৃত্যুচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে তার মধ্যেও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ভয় এবং নির্ভীকতা দুটি সুরই যুক্ত থাকতে দেখা যাবে। জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত

ভয়কে কাটিয়ে উঠে প্রত্যয়লব্ধ নির্ভীকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। শেষ জীবনের প্রকাশই তাঁর জীবনের চরম সত্যের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি বলে স্বীকার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতাগুলো যে দার্শনিক চিন্তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত তাও নয়, তবে দার্শনিক চিন্তা তাকে বাস্তব জীবন-রসে অনেক বেশি জারিত করেছে এইমাত্র।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্যায়ের কবিতা-গুলো নিয়ে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলো নিয়ে সেইভাবে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি। যা হয়েছে, তা নিতান্তই সাধারণ, অসম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক ধারারই গতানুগতিক অনুবর্তন মাত্র। কিন্তু তা যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন বিষয় হতে পারে এই উপলব্ধি থেকে এই বিষয়ে কেউ গভীরভাবে আলোচনা করেন নি।

আমার ছাত্রী শ্রীমতী খনা মুখোপাধ্যায় এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর যখন আমার নিকট গবেষণা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল, তখন আমি এই বিষয়টি নিয়েই তাকে তার গবেষণাপত্র রচনা করবার জন্য পরামর্শ দিলাম। দীর্ঘদিন ধরে সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলো পাঠ করে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর বিশেষত্ব উদ্ধার করল এবং তারই অধ্যয়নের ফলস্বরূপ বর্তমান গবেষণা-গ্রন্থটি সে রচনা করেছে। এই বিষয়ে যেসকল রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচক যেখানে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছেন, তাও সে অনুসন্ধান করে সেই বিষয়ের উপর তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি যোগ করেছে, বিনা বিচারে কারো যুক্তি কিংবা সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করে নি। সেই-জন্য অনেকের সঙ্গে সে একমত হতে পারে নি, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রেও নিজের যুক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অন্যের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে সে অস্বীকার করে নি। তার ব্যক্তিগত মতবাদ বিষয়ে তার কোনো ঔদ্ধত্য কিংবা অন্ধ আত্মবিশ্বাস কোথাও প্রকাশ পায় নি। বর্তমান গ্রন্থটির তা একটি বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হবে।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
ও অধ্যক্ষ, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ

প্রাক্-কথা

মহাকাশের অসংখ্য নক্ষত্র এবং সমুদ্র বক্ষের অনন্ত তরঙ্গলীলার মতই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সীমাহীন বৈচিত্র্য। মনন এবং সর্বোপরি ভাবোচ্ছ্বাসিত কল্পনার অবাধ বিচরণ পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। রবীন্দ্রকাব্য দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ হলেও তা দেশকালোত্তীর্ণ। ইহকাল এবং চিরকালের মধ্যে সমন্বয় সাধনই রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম প্রধান সুর।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পকার বা প্রাবন্ধিক হিসাবেও তিনি অনন্য ; কিন্তু সর্বোপরি তিনি কবি। সাহিত্যের নানা চর্চার মধ্যে সর্বত্রই তাঁর কবিস্বভাব জয়যুক্ত হয়েছে। তিনি তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন রসস্রষ্টা। তাঁর অনুভূতির দর্পণে ধরা দিয়েছে জগৎ ও জীবনের নিগূঢ় রহস্য। এই রহস্যানুভূতির অননুকরণীয় প্রকাশ তাঁর কাব্য-সম্ভার। এই প্রকাশ সর্বত্রই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতেই হয়েছে। কোন বিশিষ্ট রীতি বা সাধনের পরিপোষক তিনি হন নি।

ক্ষুদ্র, খণ্ড বা সীমার মধ্য দিয়ে বৃহৎ এবং অসীমকে লাভ করার ব্যাকুলতা সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে পরিব্যাপ্ত। জীবনের কোন ঘটনাই তাঁর কাছে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সর্বত্রই তিনি অনন্তের সুর অনুভব করেছেন। বৃহৎই ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সীমাই আবার অসীমে পূর্ণতা লাভ করে, ব্যক্তিজীবন সার্থক হয় বিশ্বজীবনের সঙ্গে মিলনে। ব্যক্ত-অব্যক্ত, খণ্ড-পূর্ণ এবং সীমা-অসীমের এই লীলাকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরে উপলব্ধি করেছেন এবং এই উপলব্ধিরই অপূর্ব নিদর্শন তাঁর কাব্যগুলি।

জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে বিচ্ছিন্ন সত্তার প্রকাশ নয়। একটি অনাদি অনন্ত প্রাণ-প্রবাহের অঙ্গীভূত করেই তিনি জীবনকে অনুভব করেছেন। তাই মৃত্যু তাঁর কাছে স্বতন্ত্র কিছু নয়, জীবনেরই একটি ভিন্নতর প্রকাশ মাত্র। এই ভাবোপলব্ধি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব এমন কথা বলা না গেলেও, অনুভূতির প্রকাশে নিজস্বতা অনস্বীকার্য। এই চিরকালীন অবিনশ্বর প্রাণ-প্রবাহের ধারণা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে স্বীকার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আপন প্রাণ-চেতনার আলোকে প্রকাশ করেছেন—

হোক তাই
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পুর্বের পথ অপুর্বের পথে দ্বার খোলা।

—পূরবী, 'পদধ্বনি'

সৌন্দর্য ও প্রেম-চিন্তায় রবীন্দ্র-মনের এক অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। তাঁর প্রেম দেহাতীত। নরনারীর আত্মার মাহাত্ম্য প্রকাশক, সেই দেহহীন নিত্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত প্রেম বিশ্বজনীন অনন্ত প্রেমের স্রোতে যুক্ত। এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা ; রবীন্দ্রপূর্ব কাব্যসাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম ও কাম অবিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কামের সীমা থেকে বিশুদ্ধ প্রেমকে মুক্তি দেন। রবীন্দ্রকাব্যে অনাবিল দেহ-সম্পর্ক-বিযুক্ত প্রেমের জয়গান সর্বত্রই। নারী তাই দেবীর মর্যাদা পেয়েছে, ভোগের সামগ্রী-রূপে স্বীকৃত হয় নি। আধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত এই প্রেম শুধু এক জন্মের সম্পর্ক নয়—'অনাদি কালের হৃদয় উৎস' থেকে উৎসারিত।

রবীন্দ্রনাথের দেশকাল এবং জীবন-বোধ সমস্তই চিরন্তন মানবতা এবং ন্যায়বোধের মানদণ্ডে বিচার্য। কোন ক্ষুদ্রতা বা খণ্ডতা তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। তাই "রবীন্দ্র-কাব্যে মানবের অবিনশ্বর অনুভূতির প্রকাশ আছে"[১] একথা অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য কবি ও সমালোচক মহৎ কবি এবং কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—"The essential is that each (poem) expresses in perfect language some permanent human impulse. What every poet starts from is his own emotions. He is occupied with the struggle which alone constitutes life for poet to transmute his personal and private agonies into something rich and strange something universal and impersonal"[২]

১. শচীন সেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় (১৯৫৫), পৃ, ১৬
২. T. S. Elliot, Points of view (1941), P. 38

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি, তাঁর কাব্যের ধর্ম গীতিধর্ম। পৃথিবীর তাবৎ গীতিকবির মতই প্রথম যৌবন থেকেই আত্মপ্রকাশের বেদনায় তিনি আকুল হয়েছেন। তাই কাব্যে তিনি একের পর এক পর্ব উন্মোচন করেছেন। কোন ভাব বা রূপের মধ্যে স্থিতি লাভ করেন নি। প্রতিভার ধর্ম চির চাঞ্চল্য এবং চির অতৃপ্তি। তিনি সুদূরের পিয়াসী, অনন্তের অভিসারী; তাই তাঁর কাব্যে সর্বত্রই গতির ইঙ্গিত। কোন কাল-পরিধির মধ্যেও তাঁর সাহিত্য আবদ্ধ নয়। অতীতের মহৎ স্মৃতি, বর্তমানের আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতের কামনা একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রকাব্যে বিবর্তনের ধারায় লক্ষ্য করা যায় যে তাঁর এই গতি-প্রবণতা, প্রকৃতি, মানব এবং অধ্যাত্ম মননে ধাপে ধাপে সার্থকতা লাভ করেছে। সুধী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মানসভঙ্গীর পরিবর্তনকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্বপ্ন ভাঙ্গিল, 'মানসী' কাব্যে যে সংশয় দোলা দিল; 'সোনার তরী' কাব্যে সে সংশয় অতিক্রান্ত হইল—'চিত্রা' কাব্যে সেই কর্মের ডাক স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। তারপর 'খেয়ার' যুগে কর্ম হইতে বিদায় লইবার যে বাসনা দেখা যায়, তাহা 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' কাব্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে কর্মময় জীবনের ঘোষণা পুনরায় আত্মপ্রকাশ পাইল 'বলাকা' কাব্যে।"[১] এই বলাকা কাব্যের পর থেকে সমগ্র শেষ পর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরণ লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের ধারণাগুলি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে আশ্চর্য বাণীমূর্তি লাভ করেছে।

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এই বিষয়গুলিই রবীন্দ্রকাব্যের মূল উপাদান; তাঁর দীর্ঘ কবিজীবনের উদ্দীপন-শিখা।

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সুর। বাল্যকালে ভৃত্যতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে, উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে দূরে লালিত-পালিত হওয়ার জন্য কবির মনে প্রকৃতির প্রতি একটি নিবিড় রহস্যময় আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী কালে বিহারীলালের কাব্যের সংস্পর্শে এসে কবির প্রকৃতির প্রতি ঔৎসুক্য আরও গভীর হয়। বহিঃপ্রকৃতি কবিকে নানা-

১. শচীন সেন, রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় (১৯৫৫), পৃ. ১৮

ভাবে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতিকে কবি কখনই জড় পদার্থ বলে মনে করেন নি বরং কালের অনন্ত প্রবাহে সঞ্জীবিত শান্ত কল্যাণী মূর্তিতেই গ্রহণ করেছেন। বিশ্বনিসর্গের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত রূপে অনুভব করে, কবি তৃপ্তি লাভ করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে।
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি···

—সোনার তরী, 'বসুন্ধরা'

রবীন্দ্রনাথের কবিমন ছিল উপনিষদের প্রাণরসে পুষ্ট। তাই তিনি একই প্রাণধারা সমগ্র জগৎ ও জীবনের মধ্যে প্রবাহিত বলে অনুভব করেন। প্রকৃতির মধ্যেই তিনি বিধাতার আনন্দময়, সৌন্দর্যময় প্রকাশকে উপলব্ধি করেন। প্রকৃতি চিরদিনই তাঁর কাছে মায়াময়, রহস্যময় নবীন। যেহেতু সৃষ্টির আদিতে একই প্রাণরসে মানব ও প্রকৃতি উভয়েই সঞ্জীবিত হয়েছিল, তাই বিশ্বনিসর্গ ও মানবের মধ্যে অচ্ছেদ্য ঐক্যের সম্পর্ক। প্রকৃতির খণ্ডরূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি চিরন্তন সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

প্রকৃতি-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ও ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একই মন্ত্রের উদ্‌গাতা। দুজনেই অনুভব করেছেন যে প্রকৃতি প্রাণময়ী এবং প্রকৃতি ও মানব একই সত্যের প্রকাশ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দিককেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির খণ্ড-সৌন্দর্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত পরম সত্যকে অনুভব করেছেন। উপনিষদের ভাবধারায় সিক্ত রবীন্দ্র-কবিমন প্রকৃতির সৌন্দর্যে চিরসুন্দরের লীলা অনুভব করেছেন। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুধাবনের মধ্য দিয়ে পরম সুন্দর ও পরম রসময়কে আস্বাদন করেছেন।

প্রেম রবীন্দ্রকাব্যের একটি অন্যতম মূল উপাদান। রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতা বিশ্লেষণের সময় প্রেম সম্পর্কিত ধারণার উল্লেখ করেছি। এখন রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

রোমান্টিক কবিদের মনে সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণতার আদর্শ বিরাজ করে। সেই আদর্শকেই তাঁরা জগৎ ও জীবনের মধ্যে অনুভব করার চেষ্টা করেন। এই আদর্শ একটা বস্তুনিরপেক্ষ ভাবরূপে তাঁদের মধ্যে অনন্ত প্রেম-সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের মনে প্রেমের এই ভাবময় আদর্শের জাগরণে বিহারীলালের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদেরও কিছু পরিমাণে প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই প্রভাব কথাটি বিশেষ সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। কারণ সব প্রভাবকেই তিনি স্বীকরণ করে নিয়েছেন। নিছক বাহ্য প্রভাবরূপে তাঁর রচনায় কোথাও কিছু নেই, সব কিছুই তাঁর নিজস্ব ভাবধারার প্রকাশক হয়ে উঠেছে। মানসী থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট প্রবণতাগুলিতে স্থিত হয়েছেন। এই সময় থেকেই কবি প্রেমের একটা অবিনশ্বর অনন্ত সত্তা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছেন এবং পৃথিবীতে নারীর মধ্যে সেই প্রেমের অন্বেষণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রেমের এই আদর্শ বিশুদ্ধ রূপকে পার্থিব নারীর মধ্যে উপলব্ধি না করতে পেরে ব্যথিত হয়েছেন। প্রেম দেহ-কামনার ঊর্ধ্বে এক আনন্দময় অনুভূতি রূপে প্রতিভাত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' আপনার মধ্যে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতা সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্যের মতটি প্রণিধানযোগ্য, "সাধারণভাবে যাহাকে আমরা প্রেম কবিতা বলি, যাহাতে দেহ ও হৃদয়ের চরম আবেগ ও আকুলতা একটা অত্যাশ্চর্য গভীর অমরতার অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করে, সেরূপ প্রেম-কবিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল।"[১] রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম বাস্তবধর্মী নয়, তা মূলতঃ ভাবধর্মী।

ঈশ্বর-চিন্তা রবীন্দ্রকাব্যের একটি অন্যতম আলোচনার বিষয়। তাঁর আধ্যাত্মিকতা কোন প্রচলিত বিশেষ ধর্ম-নীতির বিধান মেনে নয়। উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাধকদের উপলব্ধি এবং সর্বোপরি আপন অধ্যাত্ম উপলব্ধির মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্ চিন্তা বিকাশ লাভ করেছে। ভগবানকে তিনি মহান্ পুরুষরূপে, অনন্ত ঐশ্বর্যময়রূপে কল্পনা করেছেন। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। ভগবানকে

১. রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ ৭২

এইভাবে অনুভবের মূলে আছে উপনিষদীয় অদ্বৈত ব্রহ্মের প্রভাব। তাঁর নানা সঙ্গীতে, নৈবেদ্যের কবিতায়, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির কিছু কবিতায় এবং শেষ জীবনের কয়েকটি কবিতায় এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। নৈবেদ্য কাব্যে কবির ভগবানের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

—নৈবেদ্য, ১৬ সংখ্যক কবিতা

সমগ্র বিশ্বই ভগবানের লীলাক্ষেত্র, বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁরই প্রকাশ। তাই বিশ্বের কোন কিছুকেই ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য। জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম ও প্রীতির মধ্য দিয়েই মুক্তির আস্বাদ লাভ করা যায়। তাই কবি বলেছেন—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে!
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে বহিবে ফলিয়া।

—নৈবেদ্য, ৩০ সংখ্যক কবিতা

আবার কখনও কখনও কবি ভগবানকে লীলাময়রূপে, সখারূপে এবং প্রিয়তমরূপে অনুভব করেছেন। খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির কবিতায় কবির এই ভগবদ্ অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। খেয়া কাব্যে লীলাময় ঈশ্বরের প্রথম অনুভূতি, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি-তে এর পূর্ণরূপ। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিতে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার আকুল আগ্রহ এবং সেই বাঞ্ছিত মিলন না হওয়ার জন্য বেদনা প্রকাশ পেয়েছে —

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।

যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল—
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।

—গীতাঞ্জলি, ৭২ সংখ্যক কবিতা

গীতাঞ্জলির বিরহ গীতিমাল্য-এ এসে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেছে। গীতিমাল্য-এ ভক্ত ও ভগবানের নিবিড় মিলন ঘটেছে। তবে এই মিলনেই সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে নি, নব নব রূপে তিনি সেই পরমানন্দকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে শ্রীঅজিত-কুমার চক্রবর্তী বলেছেন —" 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' এই দুই নামের মধ্যেই দুই কাব্যের পার্থক্য দিব্য সূচিত হইয়াছে 'গীতাঞ্জলি' যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রম গীতি নিবেদন—সেখানে 'দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে ; বন্ধু বলে দু'হাত ধরিনে', 'গীতিমাল্য' বধূর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। দূরত্বের বাধা দূর হইয়া অত্যন্ত নিকট নিবিড় পরিচয়।"[১]

মানুষের প্রেম না হলে ভগবানের লীলা সার্থক হয় না। মানুষ যেমন ভগবানকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল তিনিও তেমনি মানুষের প্রেম লাভের জন্য উৎসুক—

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

—গীতাঞ্জলি, ১২১ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার সঙ্গে বৈষ্ণবের লীলাবাদের সাদৃশ্য আছে। বৈষ্ণবগণ মানবীয় রসে দেবতাকে আরাধনা করেছেন। সেখানে পরম রস-স্বরূপ আপন লীলা আস্বাদনের জন্য বহু হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণবের লীলাবাদের সাদৃশ্য থাকলেও বৈষ্ণবের তাত্ত্বিক মতবাদ রবীন্দ্রকাব্যে অনুপস্থিত।

ঈশ্বরের অজানা রহস্যময় একটি রূপ কখনও কখনও রবীন্দ্র-মানসে প্রতিভাত হয়েছে। বিশ্বের নিয়ত পরিবর্তন, ভাঙা-গড়া, প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য, মানব জীবনের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, সমস্তের মধ্যেই পরম লীলাময়ের রসলীলা। এই

১. কাব্যপরিক্রমা (১৯৪৪), পৃ. ১৪৪

লীলার মধ্য দিয়েই তিনি মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। অনন্ত কাল ধরে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর এই লীলা চলেছে। মানুষও জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে অনন্ত অভিসারে যাত্রা করেছে। ভগবান তাই কবির কাছে চির পথিক, অনন্ত পথযাত্রী—

> যত আশা পথের আশা,
> পথে যেতেই ভালোবাসা,
> পথে চলার নিত্য রসে
> দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।
>
> —গীতালি, ৮৩ সংখ্যক কবিতা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে রবীন্দ্রকাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যেতে পারে। তাঁর কাব্যে যে প্রবণতাগুলি দেখলাম সেগুলি রবীন্দ্র-মানসের উপলব্ধি-জাত ফসল হলেও প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আবাল্য উপনিষদের রস রবীন্দ্র-কবিমনকে সিঞ্চিত করেছে। বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব ও লীলাবাদ, মধ্যযুগের মরমী সাধু কবীর, দাদূ প্রভৃতির রচনা রবীন্দ্র-কবিমানসকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। কাব্য রচনার প্রথম যুগে বিহারীলালের রোমাণ্টিক মিষ্টিক সৌন্দর্যানুভূতি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যের বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবময় সত্তার কল্পনাকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত করেছিল। তবু বলা যায়, এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাত্রা শুরু করলেও আপন পথে এবং আপন সৃষ্টিতে ঐ সমস্ত প্রভাবকে তিনি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে গেছেন, শুধু তাঁর কাব্যে রয়ে গেছে তাদের সুরভি। তিনি সমগ্র ভারতীয় ধ্যান-ধারণাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, আপন প্রতিভার দ্বারা তাদের নূতন রূপে প্রকল্প করেছেন—"Tagore in our time experienced in his person all the essential Indian heritage and made it articulate."

১. Uma Shankar Joshi, Tagore's Poetic Vision Centenary Volume (1961), P. 141

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্ব ও শেষ পর্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের ঐশ্বর্য পরম বৈচিত্র্যময়, রূপ থেকে রূপান্তরে, ভাব থেকে ভাবান্তরে এর অনন্ত যাত্রা। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিত্যই নূতন উদ্ভাবনার পরিচয় রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-জীবনকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করলে প্রত্যেক নূতন পর্বে আমরা নব নব চেতনার উদ্বোধন লক্ষ্য করতে পারি। আমাদের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলি। কিন্তু শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির যে বৈশিষ্ট্য তা তাঁর পূর্ববর্তী যুগের চিন্তার রূপান্তর না এই সময়ের চিন্তাগুলি কবির একেবারে নূতন? পৃথিবীর অধিকাংশ বড় কবি বা লেখক যাঁরা দীর্ঘকাল সাহিত্যজগতে অবস্থান করেছেন তাঁদের রচনায় একটা ক্রম-বিবর্তন বা ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘকাল ধরে কবিতা রচনা করেছিলেন; তবে তাঁর শেষ জীবনের কবিতা কোন মহান স্বাক্ষর বহন করে না; একথা অনেক সমালোচকই তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তিনি যতই জীবনে অন্ত-দিগন্তের দিকে অগ্রসর হয়েছেন ততই তাঁর কাব্যে নবতর সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে—"বিশেষত উত্তর কাব্যের স্বল্প পরিসরেও নানাবিধ ব্যাপ্তি প্রয়াস, অন্বেষণ ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত। বিশুদ্ধ কাব্য বিচারে অশীতিপর কবির মৃত্যু অকালমৃত্যুই।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম জীবনচেতনা, প্রাণপ্রাচুর্য ও প্রকাশের নানাবিধ রূপ রবীন্দ্রকাব্যকে গৌরবের উচ্চাসন দিয়েছে। এ হেন বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্লভ। রবীন্দ্র-কবিচিত্ত চিরপথিক ও চিরচঞ্চল। তাই তাঁর মন কোথাও থেমে থাকে নি, তাঁর কাব্যে তাই 'ঋতু পরিবর্তন' হয়েছে বারবারই। কাব্যের এই নব নব রূপ ও বৈচিত্র্যের মূলে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মানস প্রকৃতিরই প্রতিফলন, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিসত্তা বা 'আমি' অসীমের অনুচর,

১ শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য (১৩৬৮), পৃ. ১২

তাই তাঁর অন্তর্নিহিত কবিস্বরূপ কোন সীমা বা বন্ধনের অধীন নয়, সমগ্র দেশকালে পরিব্যাপ্ত। তাঁর এই অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী কবির জীবন ও সাহিত্য উভয়কেই প্রভাবিত করেছে। কবি সৃষ্টির মধ্যে উপলব্ধি করেছেন অনন্ত যাত্রা। তাই সৃষ্টি কোন একটা রূপের মধ্যে আবদ্ধ নয়। কবির ভাবজীবনেও এই চির-পরিবর্তনশীলতা এবং চলিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায়। কোন বিশেষ ভাবধারা বা চিন্তার মধ্যে কবি তাঁর মনকে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। নব নব রূপ ও ভাবের আকর্ষণকে তিনি এড়াতে পারেন নি বলে তাঁর সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বিপুল বৈচিত্র্য। কোন বিশেষ চিন্তার মধ্যে তিনি চরম সার্থকতাকে অনুভব করেন নি। কবি বারে-বারেই তাঁর কাব্য-জীবনের সমাপ্তি হয়েছে বলে মনে করেছেন, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই নূতন ভাবধারা ও নবচিন্তার স্বাক্ষর নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে তাঁর নূতন কাব্য। তাই পরিশেষ রচনার পরেও কবিকে পুনশ্চ দিয়ে আবার নূতন করে আরম্ভ করতে হয়েছে। তবে, কবির প্রতিভা-উন্মেষের প্রথম যুগ থেকেই কতকগুলি চিন্তা বা মৌল ধারণা আত্মপ্রকাশ করেছে যেগুলি তাঁর কাব্য-রচনার শেষ পর্যায়েও অবিকৃতই ছিল, শুধু তার আঙ্গিক বা প্রকাশ -কলায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে কবির এই বিচিত্র চিন্তা আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাবসাদৃশ্যের দিক থেকে বিচার করে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থকে একত্র করে এক-একটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। বনফুল থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাব্য-জীবনে কয়েকটি স্তর বা 'পর্ব' লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই যুগ-বিভাগের সূক্ষ্ম বিচারে ত্রুটি থাকতে পারে। এক পর্বের কাব্য বা কবিতা অন্য পর্বে সন্নিবেশিত হতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করা যাবে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তর পর্বে কতটা উপস্থিত তা লক্ষ্য করা যাবে। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্ব : উন্মেষ পর্ব, ১৮৭৮-১৮৯০ পর্যন্ত বিস্তৃত। কবি-কাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, কালমৃগয়া, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, শৈশব সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ছবি ও গান, বাল্মীকিপ্রতিভা, কড়ি ও কোমল, মানসী—এই পর্বে রচিত হয়।

এই পর্বের প্রথম দিকে কবির কৈশোর-প্রচেষ্টা ; স্বভাবতই এই সময় কবির প্রতিভা-পরিণতি লাভ করে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রয়াসকে নিজে কোন গুরুত্ব দেন নি। তাঁর এই উন্মেষ পর্বের প্রথম দিকের কিছু কাব্য বিহারীলালের

প্রেরণায় রচিত। এই পর্ব সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য কথা হল তাঁর এই প্রতিভা স্ফুরণের যুগেই কিছু কিছু ভাব কল্পনা ও আবেগকে লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁর পরবর্তী সমগ্র কাব্য-জীবনের সঙ্গে জড়িত। তবে প্রথম যুগে যা ইঙ্গিত বা সম্ভাবনার আকারে রয়েছে পরবর্তী যুগে তাই পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন এই যুগের কাব্যে উচ্ছ্বাস ও হৃদয়াবেগের অসংযম প্রকাশ পেয়েছে। উন্মেষ পর্ব নামে যে যুগটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যেও আবার (ক) উন্মেষ পর্বের সূচনা (খ) উন্মেষ পর্বের পরিণতি—এই দুটি বিভাগ করা যায়। প্রথম থেকে প্রভাতসঙ্গীত পর্যন্ত সূচনা অংশে এবং ছবি ও গান থেকে মানসী পর্যন্ত পরিণতি অংশে সন্নিবেশিত করা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এখন কাব্যগুলির অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে মূল প্রবণতাকে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

বনফুল-এ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির নিগূঢ় সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাই যা পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যের একটি মৌল উপাদান।

কবি-কাহিনী একটি ট্রাজিক রোমান্স। এখানে বিশ্বজীবন ও বিশ্বপ্রেমের বিস্তৃত আভাস। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত এখানে দিয়েছেন কবি। মানবজীবন ও প্রকৃতি যেন উভয় উভয়ের পরিপূরক। এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যে আমরা বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করি। শেষ পর্যায়ের কাব্য পত্রপুট এবং শ্যামলীর মধ্যে এবং মধ্য পর্বে সোনার তরী ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিময়তার একটি বৈশিষ্ট্য যে লিরিক-প্রবণতা সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের সম্পদ, তার উন্মেষ এই রচনাগুলির মধ্যেই।

ভগ্নহৃদয় একটি নাটকাকারে গীতিকাব্য। এখানে উচ্ছ্বাস অতিমাত্রায় প্রাবল্য লাভ করেছে। জীবনে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস এবং সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধির যে ইঙ্গিত এখানে লক্ষ্য করা যায় তার পরিপূর্ণ প্রকাশ পরবর্তী পর্বগুলিতে লক্ষ্য করা যাবে।

এই পর্যায়ের সমস্ত কাব্যগুলিই হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। শৈশব-সঙ্গীত-এর প্রায় কবিতাগুলি গাথা-জাতীয় এবং অধিকাংশই ট্রাজেডি। এই সময়কার রচনাতে কৈশোরোচিত উচ্ছ্বাস, বাক্‌বহুলতা ও শিথিলতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কবির উত্তর জীবনের বস্তু, প্রকৃতি এবং মানব সম্বন্ধে মৌল ধারণাগুলির উন্মেষ এখানেই আমরা অনুভব করতে পারি। প্রকৃতি তাঁর কাছে কোন দিনই নিষ্প্রাণ প্রতিভাত হয় নি। প্রকৃতির ভিতর তিনি একটি

বৃহত্তর আদি-প্রাণের প্রবাহ অনুভব করেছেন। এই ধারণা তাঁর এই উন্মেষ-যুগের কাব্যে যেমন, তেমনি উত্তর কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শেষ পর্যায়ের বনবাণী কাব্যে প্রকৃতির মধ্যে আদিম প্রাণস্পন্দন উপলব্ধির ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীত-এ এসে কবি অপরের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করে নিজের হৃদয়ের অনুশাসনে চালিত হলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি বিহারীলালের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। মনের অবরুদ্ধ অবস্থা এবার মুক্তির পথ ধরল। এই সময় থেকেই তিনি প্রাচীন রীতির বন্ধন ভেঙে আখ্যান-নিরপেক্ষ কবিতা রচনা আরম্ভ করলেন। এখানেই কবির নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের সূচনা দেখা যায়। তাই এই সময়ের কবিতাগুলির একটা মূল্য আছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন—"কাব্য হিসেবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ, ভাষা, ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।"[১] সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর অধিকাংশ কবিতার কেন্দ্রগত ভাব বিষাদবোধ। একটা অনির্দেশ বেদনা, একটা হতাশা ও একটা অতৃপ্তি এই কবিতাগুলিকে অধিকার করে আছে। মোহিতচন্দ্র সেন যথার্থই এই সময়কে হৃদয়-অরণ্য পর্যায়ে ফেলেছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর শেষের দিকেই কবির চিত্তদেশে, , নূতন আলোর প্রতিফলন হয়েছে। পূর্ণ প্রকাশ ঘটল প্রভাত সঙ্গীত-এ।

প্রভাতসঙ্গীত রচনার সময় কবি এক বৃহতের আহ্বান শুনেছেন—

> ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই,
> বাহির হইয়া আয়।
>
> —প্রভাতসঙ্গীত, 'আহ্বান সঙ্গীত'

এই কাব্যের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাকে কবি-জীবনের একটি সূচক কবিতা বলতে পারি। মোহিতচন্দ্র সেন এই কবিতায় কবির 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে নিষ্ক্রমণ বলেছেন। এই একটি কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথের ঐ যুগের মানসিক অবস্থার সম্যক্ চিত্র পাওয়া যায়।

---

১. রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি (বিশ্বভারতী ১৯৬২), পৃ. ১১২

এই কাব্যে কবির প্রকৃতি ও মানবের সঙ্গে কবির মানসিক মিলন সংঘটিত হল। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্য-ধারায় যে মানব ও প্রকৃতি একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছে এখানে কবির সেই মনোভঙ্গীর সূচনা লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র সৃষ্টির অন্তরালে এক আনন্দময় নিত্য সত্তার উপলব্ধি এই কাব্যের 'প্রতিধ্বনি' কবিতার মধ্যে দেখা যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গীই শেষ পর্যায়ে এসে বিশ্বৈক্যবোধ ও অখণ্ডতার ধারণায় সংহত হয়েছে। এখানে কবির বিশ্বের ক্ষণস্থায়িত্ব ও জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়েছে। কবির মৃত্যু সম্বন্ধে যে ধারণা পরবর্তীকালে দেখা যায় অর্থাৎ মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, মৃত্যু অনন্ত জীবনপ্রবাহের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজীবনে উত্তরণ —এখানেই তার পরিচয় পাওয়া যায়—

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।

—প্রভাতসঙ্গীত, 'অনন্ত-জীবন'

প্রভাতসঙ্গীত পর্যন্ত কাব্যগুলিতে কৈশোরের একটা নিজস্ব বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। তবে এই বেদনা তিনি প্রভাতসঙ্গীতে—এই অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর মনের মধ্যে নব চেতনার আবির্ভাব তিনি অনুভব করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জড় ও চেতনের মধ্যে বিশ্বচেতনাকে উপলব্ধিও এই পর্বেই ঘটে গেছে।

এই পর্যন্তই উন্মেষ-পর্বের সূচনা অংশ বলা হয়েছে। শৈশবের অবরুদ্ধ মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং এর পর থেকে আমরা কবির সৃষ্টিতে নূতনত্ব ও নব নব ভাববৈচিত্র্য দেখতে পাব।

উন্মেষ-পর্বের পরিণতি অংশে তিনটি কাব্যগ্রন্থকে স্থান দেওয়া হয়েছে। অনেক বিদগ্ধজন এই প্রভাতসঙ্গীত পর্যন্তই রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম অংশ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মনে হয় প্রতিভার উন্মেষ থেকে যে কাব্যে এসে প্রতিভা পরিণতি লাভ করে সেই পর্যন্তই উন্মেষ-পর্ব বলে অভিহিত হওয়া উচিত এবং সেই পরিণত শক্তির কাব্য থেকে অন্যান্য ভাবধারা-সম্বলিত কাব্য-পরম্পরার মধ্য দিয়ে অন্যান্য পর্যায়কে বিভক্ত করা যুক্তিযুক্ত। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই উন্মেষ-পর্বের বিস্তৃতি মানসী পর্যন্ত ধরা হয়েছে।

ছবি ও গান-এ আমরা কথার ফ্রেমে ছবিকে বাঁধবার একান্ত প্রয়াস লক্ষ্য করি। সৌন্দর্য-উপভোগই এই কাব্যের মূল সুর। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতে আত্মকেন্দ্রাভিমুখী ভোগপ্রবৃত্তির অকল্যাণকর শক্তির কথা বলেছেন।

পরবর্তী কাব্যগুলিতে কবি এই ভোগাকাঙ্ক্ষাকে প্রেম ও সৌন্দর্যের ভূমিতে স্থাপন করেছেন। এইটাই রবীন্দ্রকাব্যের একটি অন্যতম মূল সুর।

কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলিতে মানব-জীবনের বিচিত্র লীলারহস্যের প্রকাশ। কবির মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রীতির স্বাক্ষর এই কাব্যটিতে। 'প্রাণ' কবিতায় বলেছেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কবির এই মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রীতি উত্তর কাব্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম যুগে কবি মানবকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেছেন। সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ সংসারের মধ্যে স্থাপন করে তাকে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতি মানব-বন্দনায় পরিণত হয়েছে। সাংসারিক মানবের মধ্যে তিনি নিত্য-মানবের উপস্থিতি অনুভব করেছেন। নারীর দেহসৌন্দর্য বর্ণনামূলক কবিতায় কবি দেহের মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান করেছেন। এখানে কবির মৃত্যু-চেতনার একটি পরিণত রূপ দেখা যায়। 'কোথায়', 'শান্তি', 'নূতন', 'পুরাতন' ইত্যাদি কবিতায় কবির মৃত্যু-ভাবনা প্রকাশিত। এই মৃত্যু-চেতনার একটি মহিমান্বিত রূপ দেখা যায় শেষ পর্যায়ের কাব্যে। মৃত্যু যে জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি এই ধারণা কড়ি ও কোমল-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন —"বস্তুত, নিবিড় মৃত্যু-ভাবনার প্রথম সূচনা এই কড়ি ও কোমল গ্রন্থেই এবং উত্তর জীবনে নানাভাবে নানা রূপে সেই ভাবনার প্রকাশ।"[১] এই কাব্যে কবির ভোগাকাঙ্ক্ষা একটি সৌন্দর্যমিশ্রিত রোমান্টিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যার চরম প্রকাশ সোনার তরী, চিত্রা ইত্যাদিতে। 'শেষ কথা' কবিতায় কবির রোমান্টিক অতৃপ্তি লক্ষ্য করা যায়। এই অতৃপ্তি ও প্রকাশের আকাঙ্ক্ষাই কবিকে নূতনতর ভাব ও সৃষ্টির দিকে অগ্রসর করায়। তাই রবীন্দ্রকাব্যে আমরা বারবারই পালা-বদল লক্ষ্য করি।

কড়ি ও কোমলের মধ্যে কবির অপরিণত শক্তির যেটুকু পরিচয় ছিল মানসীতে এসে তা লুপ্ত হয়ে গেল। 'মানসী'তেই কবি প্রথম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কবিতাগুলি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, তীব্র অনুভূতি, ভাব-গভীরতা ও ছন্দসম্পদে সমৃদ্ধ। পরবর্তীকালে এই সমৃদ্ধি সোনার তরী,

---

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬৯), পৃ. ৪৯

চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, বলাকা ও পূরবীতে বিচিত্রতর রূপ লাভ করেছে। মানসীতে প্রেম ও সৌন্দর্যকে আদর্শায়িত করা হয়েছে। কামনার আবিলতা ও সঙ্কীর্ণতা-মুক্ত বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেমের জয়গান করা হয়েছে। কবি প্রতিভা-উন্মেষের আদিলগ্ন থেকে ধাপে ধাপে 'মানসী' যুগের চিন্তাধারায় উপনীত হয়েছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর অবরুদ্ধ আবেগ প্রভাতসঙ্গীত-এর বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। কড়ি ও কোমল-এ মানব-জীবন ও নারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। ভোগপ্রবৃত্তি এবং খণ্ডতা এবং ক্ষণ-স্থায়িত্বের উপর নিত্যতা ও অখণ্ডতাকে স্থাপন করলেন মানসী-তে। দেহাতীত অপার্থিবতার মধ্যেই প্রকৃত প্রেমকে উপলব্ধি করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-চিন্তার ভাবধর্মী রূপটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে যা পরবর্তীকালে সোনার তরী, চিত্রা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যায়ে সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

মানসী-র নিসর্গ-সম্পর্কিত কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে প্রকৃতি-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা পরবর্তীকালে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবির যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার মনোভাবটি দেখা যায় পরবর্তীকালে 'সোনার তরী' এবং শেষ পর্যায়ের অনেক কবিতায় এই বিশ্বৈক্য-বোধের পরিচয় আছে।

এছাড়াও মানসী-তে দেশের অবস্থা সম্পর্কে ও কবির সমালোচক-সম্প্রদায়কে উল্লেখ করে কিছু কবিতা আছে। শেষ পর্যায়ের কাব্যেও এই সমকালীন সমাজ-সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তবে বক্তব্যে ও আঙ্গিকের পরিবর্তন শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য।

মানসী-তেই কবির অসীম আবেগ ও সুতীব্র অনুভূতি প্রকাশের যথার্থ পথ খুঁজে পেয়েছে। এইখানে কবির উন্মেষ-পর্বের সমাপ্তি। প্রতিভার স্ফুরণ থেকে প্রতিভার স্থিতি পর্যন্তই এই পর্বের আলোচ্য। এরপর নূতন চিন্তা ও ভাবধারা নিয়ে নূতন পর্ব আবির্ভূত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বের নাম দেওয়া যেতে পারে সৌন্দর্যানুভূতির পর্ব। ১৮৯০-১৮৯৬ সাল পর্যন্ত এই পর্বের বিস্তার। এই সময় তিনি সোনার তরী, বিদায়-অভিশাপ, চিত্রা ও চৈতালি রচনা করেছেন। এই দ্বিতীয় পর্বে রচনায় শিথিলতা দূরীভূত হয়েছে। Art form-এর দিক থেকে তিনি পরিণত হচ্ছেন। প্রেম, সৌন্দর্য-বোধ ইত্যাদি বিষয়ে এই পর্বে কবির মন একান্তভাবে ব্যাপৃত। সোনার তরী ও চিত্রায় দেহোত্তর প্রেম ও পরিপূর্ণ বিশ্ব-সৌন্দর্যানুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ।

এই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্মবোধ। এই কবিতাগুলির গৌরব তাঁর অপূর্ব ছন্দ ও শব্দচয়ন-কৌশল।

পদ্মা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের একটি অন্যতম প্রেরণা। পদ্মার প্রেরণা-সঞ্জাত অপূর্ব কাব্যই সোনার তরী। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম পত্রসাহিত্য ছিন্নপত্রাবলী ও ছোটগল্পগুলিতে পদ্মার প্রভাব অপরিসীম। সোনার তরী-তে পৌঁছে কবির প্রকৃতি ও মানব-চেতনা দৃঢ় ও পরিণত রূপ লাভ করল। বাংলার উন্মুক্ত পল্লী-প্রকৃতির মধ্যে কবি প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও পল্লী-বাংলার জীবনধারাকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করলেন। প্রকৃতিকে অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করায় বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালের রহস্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবির যে সচেতনতা বা এক কথায় যাকে বিশ্ববোধ বলে অভিহিত করা যায় তা সোনার তরী-র পরবর্তী রচনাগুলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যে কবির কল্পনা বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই যুগে কবি শুধুমাত্র ভাবের দিক থেকে যে স্থিতি লাভ করেছেন তা নয়, প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকেও কবির কাব্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ছন্দ হয়েছে সংযত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ; আবেগে, কল্পনায় মননে, আঙ্গিকে এই যুগের কাব্যে যে মহিমান্বিত রূপ ফুটে উঠেছে তার তুলনা পাওয়া যায় পরবর্তীকালে বলাকা ও পূরবী-র যুগে।

এই যুগকে কেউ কেউ 'জীবনদেবতা'র যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই 'চেতনা' রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণার উৎসস্বরূপ বলা যায়। এই প্রত্যয় শুধু এই যুগেই নয়, কবির সমগ্র কাব্য-জীবনে এই ধারণার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। চিত্রা-য় এই ধারণা অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে এবং কল্পনা, বলাকা, পূরবীর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলিতে নব নব রূপ ধারণ করেছে। চিত্রা-য় জীবনদেবতা পর্যায়ের কতকগুলি কবিতা আছে।

সোনার তরী-র প্রেম ও সৌন্দর্য চিত্রায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ছোট ছোট সুখ ও আনন্দ এই কাব্যের কবিতাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। চিত্রা-র কতকগুলি কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবন এবং অন্য কয়েকটি কবিতায় বিশ্ব-জগৎ-সংসার রূপায়িত হয়েছে। অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের স্তুতিমূলক কয়েকটি কবিতা আছে এই কাব্যে। এই সময়ের মধ্যেই কবি তাঁর মৌল বিশ্বাসগুলিতে স্থিতিলাভ করেছেন। তাই প্রান্তিক-এ কবি যে আহ্বান করেছেন তার সঙ্গে চিত্রায় কবি যে ডাক দিয়েছেন তার পার্থক্য খুব বেশি নয়।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি উৎপীড়িত-লাঞ্ছিত, ব্যথিত-দুর্বলের অসহায়তার প্রতিকারকল্পে মানুষকে সচেতন করেছেন—

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের একেবারে অন্তিম পর্যায়েও রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনায় কাতর হয়েছেন। প্রান্তিক-এ রবীন্দ্রনাথের একই সুরের আহ্বান—

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

—প্রান্তিক, ১৮ সংখ্যক কবিতা

চৈতালি এই পর্যায়ের শেষ ফসল, চিত্রা-য় কবি যে পরিণতি লাভ করেছেন চৈতালিতে তাকে অতিক্রম করার আভাস দেখতে পাই। এই কাব্য সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"হয়ত কবি একথা মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে, এই কবিতাগুলি তাঁহার কবি-জীবনের শেষ ফসল, এই ধরনের ধারণা উত্তর জীবনে বার বার কবির মনে জাগিয়াছে। তবে সত্য সত্যই চৈতালি একটি সুদীর্ঘ জীবন-পর্যায়ের শেষ ফসল বলিলে অন্যায় কিছুই বলা হয় না।"[১]

'সোনার তরী'-চিত্রা যুগের রসানুভূতি একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে চৈতালিতে। এখানে কবির মানসিকতা শান্ত, সংহত। অনুভূতির তীব্রতার পরিবর্তে এখানে গভীর উপলব্ধি। কবির কাব্য-জীবন যে একটি পরিবর্তনের সম্মুখীন তার ইঙ্গিত চৈতালিতে স্পষ্ট। পূর্ববর্তী কাব্যগুলির ন্যায় এখানে বিশ্বনিসর্গ এবং অনন্ত সৌন্দর্যের উপলব্ধিই প্রধান হয় নি, এখানে মানবজীবনের প্রতিই কবির অধিক আকর্ষণ। এই স্বল্প-আয়তন কাব্যটিতে কবির মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রীতি অপূর্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই মানবপ্রীতির ফলে কবি মানবমহিমা ও আদর্শবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, চৈতালিতে এই মনোভাবের

সূচনা বলা যায়। পরবর্তীকালে কথা ও কাহিনী এবং নৈবেদ্য-র মধ্যে এর পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে কবির ঐতিহ্য চিন্তারও পরিচয় আছে, প্রাচীন ভারত ও তপোবনের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের সূচনা এখানেই। রবীন্দ্রকাব্যের ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে চৈতালি-র সুর ঠিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে না, সোনার তরী-চিত্রা-র সৌন্দর্য ও আনন্দ এখানে অনুপস্থিত।

এই কাব্যের সনেটগুলি উল্লেখযোগ্য। কড়ি ও কোমল-এই সনেটের প্রথম দর্শন পাই এবং এর পূর্ণতর রূপ নৈবেদ্য-এ।

এই চৈতালি-তেই রবীন্দ্রকাব্যের একটি পর্বের অবসান। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা নূতন ভাবধারা-সম্বলিত নূতন কাব্য-প্রবাহের দর্শন পাব।

তৃতীয় পর্বের বিস্তৃতি ১৯০০-১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই পর্যায়কে ঐতিহ্যচিন্তা ও গভীরতর মননপর্ব বলা যায়। এই পর্বে কবির চিন্তা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিচরণ করেছে। কথা, কাহিনী, কল্পনা, কণিকা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া প্রভৃতি এই সময়ে রচিত। কথা থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত কবি-জীবনের একটি বিশিষ্ট সন্ধিক্ষণ বলা যায়।

প্রাচীন ভারতের শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও মহত্ত্বের উপাখ্যান কথা ও কাহিনীতে রূপ লাভ করেছে। এই যুগে শুধুমাত্র প্রেম ও সৌন্দর্যসাধনায় কবিমন তৃপ্ত থাকতে পারে নি, বৃহৎ আদর্শ ও মনুষ্যত্বের দিকে ধাবিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুরাণ ও আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে কবি সেই পরিপূর্ণ আদর্শের মূর্তি দেখতে পেয়েছেন। তাই কথা ও কাহিনী-র বিষয়বস্তু কবি এইখানেই সন্ধান করেছেন।

কল্পনা রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম কাব্য, সোনার তরী-চিত্রা-র প্রেম ও সৌন্দর্যসাধনার সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে মহাজীবনের ইঙ্গিত। কল্পনা-র ধ্যান-ধারণা পরিণতি লাভ করেছে নৈবেদ্য-এ। এই কাব্যে কবির মন, ত্যাগ, বীর্য, সত্য, নিষ্ঠা এবং শাশ্বত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে কবি অতীতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন তাই প্রেম-সৌন্দর্য-কল্পনামূলক কবিতাগুলিকে কবি প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছেন।

কল্পনা-র চিন্তাধারা নৈবেদ্যে এসে আরও পরিণত হয়েছে। যে ধ্যাননিমগ্ন গভীর প্রশান্তির সুর কল্পনায় ধ্বনিত নৈবেদ্যে এসে তা আরও নিবিড়তর হয়েছে। কিন্তু এই দুটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আর একটি কাব্য রচিত হয়েছে :

সেটি হল ক্ষণিকা। এই কাব্যের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। এখানে রচনার চালটা হালকা। নৈবেদ্য-এর গভীর চিন্তাগুলি ক্ষণিকা-তে সরলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যের আপাত চটুলতার অন্তরালে আছে গভীর ইঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য ও আধ্যাত্মিক আস্তিক্য-বোধ সমস্ত পর্বগুলিতে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। চিত্রা-তে যে মৃত্যুচিন্তা আছে ক্ষণিকা-তেও সেই চিন্তার প্রকাশ কিন্তু ভঙ্গীটা ভিন্ন। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে একটা উদ্দীপনা ও উল্লাস যুক্ত হয়ে গেল। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রেম-সৌন্দর্য ও মাধুর্যময় দিনগুলিকে পরিত্যাগ করে মহান গভীর মহাজীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, পরিচিত জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার বেদনা পরিহাসমুখর চটুল ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে ক্ষণিকায়। এই কাব্যের ভাষা-চয়নে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কথ্য ভাষায় এবং হসন্ত শব্দের ব্যবহারে ক্ষণিকার রচনাভঙ্গী তীক্ষ্ণ সরস এবং মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে।

এই পর্বেরই পরবর্তী অংশে কবির মনন গভীরতর হয়েছে। চৈতালি থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত কবিমানসে পূর্ণতার দিকে যে ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে নৈবেদ্য কাব্যে এসে তা পরিণত রূপ ধারণ করেছে। এখানে কবি উন্নততর মহিমান্বিত সমাজ প্রার্থনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কবির ঔপনিষদিক চেতনা ও ভাগবত সাধনা জাত অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে কবি অবগাহন করেছেন। এই পর্বে কবির পূর্ণতার আদর্শ অনেকাংশে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতায় উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের আদর্শের সঙ্গে বৈষ্ণবের লীলাবাদের আদর্শের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ব্রহ্মবাদ এবং উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট ভারতীয় ধর্মচেতনা রবীন্দ্রনাথকে আজীবন প্রভাবিত করেছে। এই ঔপনিষদিক চেতনারই একটি পূর্ণতর রূপ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায়। কথা, কাহিনী বা নৈবেদ্য-এ রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের যে পরিপূর্ণ আদর্শের অনুসন্ধান করেছেন, শেষ পর্যায়ের কবিতায় তা এক অপূর্ব মানব বন্দনায় পরিণত হয়েছে। সেখানে তিনি অখণ্ড মানবতাকে উপলব্ধি করেছেন।

স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে স্মরণ কাব্যগ্রন্থ রচিত। এখানে ব্যক্তিগত শোকের উদ্‌ভ্রান্ততা নেই বরং প্রশান্ত গাম্ভীর্যে শোককে মহিমান্বিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, শোক কাব্য বলতে যা বোঝায় স্মরণকে সেই পর্যায়ে

ফেলা যায় না। এখানে রবীন্দ্রনাথের শোক দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। এখানে মৃত্যুকে কবি অনন্তের একটি বিশেষ অবস্থা বলে মনে করেছেন। মানব অখণ্ড সত্যের অংশ তাই তার বিনাশ নেই। মৃত্যু জীবনের অবস্থান্তর মাত্র। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন পূর্ণতা পায়, নবরূপ লাভ করে। কবির মৃত্যু সম্পর্কিত অখণ্ড দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এই পর্যায়েই পরিণত রূপ লাভ করেছে। এই মনোভাব রবীন্দ্র-কাব্যের আদি থেকে অন্ত পযায় পযন্ত সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যায়ের কাব্যে মৃত্যুচিন্তা একটি বিশিষ্ট আকার লাভ করেছে। কবি নিজ জীবনে মৃত্যুর পদধ্বনি অনুভব করেছেন এবং সেই অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়েছেন ঐ সময়ের কবিতাগুলিতে। মৃত্যুই যে সমাপ্তি নয় এই ধারণা রবীন্দ্রনাথ আজীবন পোষণ করেছেন।

শিশু গ্রন্থের কবিতাগুলি। শিশুকে আশ্রয় করে উচ্চবঙ্গের বাৎসল্য রসের কবিতা। শিশুর মনোজগতের মধ্যে প্রবেশ করে কবি জাগতিক দুঃখের প্রতি নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করেছেন।

এই সময় কবিচিত্ত কয়েকটি উপর্যুপরি আঘাতে (স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যু) কিছুকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রায় বৎসর খানেক পর খেয়া-র সূচনা। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে গভীর বেদনা দেখা যাচ্ছে। কবির মন অন্তর্মুখী হয়েছে, কৌতুক এখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ধ্যান,এখানে পরিপূর্ণতার পথে। নৈবেদ্যে যে দেবতাকে আত্মনিবেদন করেছেন, সেই দেবতাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষা খেয়াতে। কবি এই সাধনাকে রূপক ও সংকেতের মধ্য দিয়ে কবিতাগুলিতে প্রকাশ করেছেন। তাই এখানে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মিলন ঘটেছে। ভগবান এখানে লীলাময় মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। কবির মন আধ্যাত্মিক হয়ে পড়লেও পূর্বের প্রেম সৌন্দর্যময় জগতের স্মৃতিকে তিনি বিস্মৃত হন নি। তাই আধ্যাত্মিক জীবন ও পূর্ব জীবনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়, তাই এই কাব্য বিষাদাত্মক। এই খেয়া-তেই গীতাঞ্জলি পর্বের পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ পর্বকে ভগবদলীলা রসানুভূতির যুগ বলা যায়। সুর এখানে সকল কথাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই অধ্যাত্মবোধের শুরু খেয়া-তে, গীতাঞ্জলি-তে এর স্পষ্ট রূপধারণ এবং গীতিমাল্য-এ চরম সার্থকতা, গীতাঞ্জলি-র ভগবদ্ আকূতি গীতিমাল্য-এ ও গীতালি-তে শান্তিলাভ করেছে। আমাদের দেশের

অধ্যাত্ম পটভূমিকায় যেমন আউল, বাউলের গানের ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মবোধ আকস্মিক কিছু নয়। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী স্থৈর্য ও প্রশান্ত গাম্ভীর্যে ভাস্বর। খেয়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের কল্পনার উচ্ছ্বাস, বুদ্ধির দীপ্তি, সৌন্দর্য-পিপাসা ইত্যাদি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে। নিজের সর্বস্ব উজাড় করা আত্মনিবেদন। পূর্বযুগে কবি যা কিছু আস্বাদন করেছেন, এ যুগে তা উপলব্ধি করেছেন—তার গভীরে প্রবেশ করেছেন, সেই রস স্বরূপ লীলাময়কে অনুভব করতে চেয়েছেন।

গীতাঞ্জলি-তে কবিহৃদয়ের আকূতি, অশান্ত বেদনা লক্ষ্য করা যায়। দেবতাকে জীবনের নানা অবস্থার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা 'গীতাঞ্জলি'র প্রতিটি কবিতায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরিপূর্ণ উপলব্ধি এখানে হয় নি তাই একটা গভীর বেদনার সুর সুস্পষ্ট। যেমন—

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।

—গীতাঞ্জলি, ২৬ সংখ্যক কবিতা

কিন্তু অতৃপ্তির বেদনায়ই আধ্যাত্মিকতার সমাপ্তি হতে পারে না। পরিপূর্ণতা আনন্দ ও শান্তির মধ্যেই সার্থকতা। এই শান্তি ও তৃপ্তির সন্ধান পাওয়া যায় পরবর্তী গীতিমাল্য ও গীতালি-তে। গীতাঞ্জলি-তে দূর থেকে দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন, আর গীতিমাল্য-এ সেই দূরত্ব ঘুচে গিয়ে দেবতার সঙ্গে মিলনের আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে—

মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে
মনে হল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে
হৃদয় যেন শিশির নত
ফুটল পূজার ফুলের মতো
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে।

—গীতিমাল্য, ৩৫ সংখ্যক কবিতা

গীতালি-তে নিবিড় উপলব্ধি ও আত্ম সমর্পণের সুর ধ্বনিত। এখানে কবি অনুভব করেছেন দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়েই ভগবানের আবির্ভাব। তাই বলেছেন—

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।

—গীতালি, ৯ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রকাব্যের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দেখা গেল এইখানে এসে কবির জীবন একটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কৈশোর যৌবনের প্রেম-সৌন্দর্য অনুভূতির জগৎ এবং পরিণত বয়সের অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে কবি একটি পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। খেয়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের পূর্বের কাব্যজগৎ বিদায় নিয়েছেন এবং কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপাত দৃষ্টিতে এখানেই জীবনের সমস্ত চাওয়ার অবসান এবং উপলব্ধির শেষ পর্যায়। কিন্তু প্রতিভার ধর্ম চির অতৃপ্তি। তাই গীতালি-র শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যেও কবির ঊর্ধ্ব-আকাশচারী মন এই জগতের দিকেই আবার ফিরে তাকিয়েছে। পৃথিবীর রূপ-রসের মধ্যেই, তিনি ভগবানের লীলাকে নব নব রূপে আস্বাদন করতে চাইলেন।

আবার যদি ইচ্ছা কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।

... ...

আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে॥

—গীতালি, ৮৬ সংখ্যক কবিতা

তাই নূতন পর্ব নিয়ে আবির্ভাব হয়েছে বলাকা-র কবিতাগুলি। এখান থেকেই রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ আবার ভিন্ন পথে চলেছে।

রবীন্দ্রকাব্যের পঞ্চম পর্ব ১৯১৬-১৭ থেকে ১৯২৪-২৫ পর্যন্ত বিস্তৃত। এইযুগের কাব্য—বলাকা, পলাতকা, শিশু ভোলানাথ। এই পর্যায়কে 'প্রকৃতিতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন পর্ব' বলে অভিহিত করা যায়। রবীন্দ্রকাব্যে এটা একটা নূতন যুগ, একটা নূতন বাঁক বলা যায়। এই নূতন ভাবধারার প্রতীক কাব্য বলাকা। বলাকা-য় কবি আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে আবার এই পৃথিবীর ও মানবজীবনের দিকে ফিরে তাকালেন। এখন থেকে কবির মানবপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যা কবির শেষ জীবনের কাব্যে হয়েছে আরও বৈচিত্র্যময়। তবে মানসী থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত পৃথিবী ও মানবজীবনের রূপ ও সৌন্দর্য যেভাবে কবির চোখে ধরা দিয়েছিল বলাকা ও বলাকা-পরবর্তী যুগে সেই অনুভূতিতে মনন ও চিন্তা যুক্ত হয়েছে। তাই বলাকা-র কবিতাগুলিতে দার্শনিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। এই কাব্যে যৌবনের জয়গান ও গতিবেগের প্রশস্তিই মূল কথা। এখানে কবি নূতন ছন্দের পরিবর্তন করলেন, সেই ছন্দ যৌবনের ছন্দ। থামার অর্থই মৃত্যু আর চলাই জীবন, একথা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন। এই যৌবন-বন্দনা দেখা যায় শেষ পর্যায়ের পূরবী-র 'বিজয়ী' কবিতাটিতে। সৃষ্টিরহস্য ও ভগবানের সঙ্গে সহজ সম্পর্কের কবিতাও এই কাব্যে দেখা যায়।

বলাকা-র যুগে কবি অনুভব করেছেন ভগবান চিরপথিক, সৃষ্টির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি নিরন্তর অগ্রসর হচ্ছেন। মানবজীবনও চিরচলিষ্ণু। তাই জীবনে কিছুই স্থায়ী হয় না, সবই পলাতকা। পলাতকা কাব্যে এই ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। 'ভগবানের' সৃষ্টি ও ধ্বংসের আনন্দকে কবি শিশুর খেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানবজীবনের চলার ছন্দেও এই কথা ধ্বনিত হয়েছে। মানবও জীবনে বার বারই পরিচিত গণ্ডি অতিক্রম করে নূতনের দিকে ধাবিত হয়। শিশু ভোলানাথ-এ রবীন্দ্রনাথ এই কথাই ব্যক্ত করেছেন শিশু স্বভাবের বিশ্লেষণের মধ্যে। মানবজীবনের নব নব উজ্জীবন, উদ্দাম যৌবনের গতিবেগ কবি কামনা করেছেন পূরবী-র 'বিজয়ী' কবিতায়। মহুয়া-তেও কবি প্রেমের মধ্য দিয়ে আবার জীবনকে নূতনভাবে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। বনবাণী-র 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' অংশে কবি নটরাজের নৃত্যলীলার ছন্দে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। পরিশেষ-এর মধ্যেও কবি

এই চলার মহামন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন। পরিশেষে কবি আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে এক মহাজীবনের দিকে যাত্রা করেছেন। বলাকা থেকেই কবির মনে জগত-জীবনের চলমানতা সম্পর্কে যে একটি স্থির প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায় তা তাঁর পরবর্তী যুগের কাব্যগুলিকে প্রভাবিত করেছে; তবে এও সত্য যে রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম যুগ থেকেই আমরা অশান্ত কবিচিত্তের সাক্ষাৎ পাই, যা রূপ থেকে রূপান্তরে, ভাব থেকে ভাবান্তরে সার্থকতা খুঁজে ফিরেছে, তাই বার বারই রবীন্দ্রকাব্যে আবির্ভাব হয়েছে নূতন নূতন পর্ব। বলাকা থেকেই আমরা এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যা পরবর্তী কাব্যগুলিতে অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে আরও পরিণত আকার ধারণ করেছে। সৃষ্টিরহস্যের উপলব্ধি, মানবের অন্তর্নিহিত সত্তার অনুভব, আত্ম-বিশ্লেষণ, দেশ-কালব্যাপী অখণ্ড শক্তি রূপে এবং মানবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে ঈশ্বরকে অনুভব, বাল্য কৈশোর এবং যৌবন-স্মৃতি পর্যালোচনা এবং মৃত্যুর আবির্ভাব ও মৃত্যুর স্বরূপ-সম্পর্কিত ধারণা এই যুগে কবিমনকে অধিকার, করেছিল। বলাকা-পরবর্তী কাব্য, বিশেষতঃ পরিশেষ, বীথিকা ইত্যাদির মধ্যেও এই চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যায়ের কাব্যে এই ভাবনাগুলিই নূতন আঙ্গিকে এবং নূতন রীতিতে রূপায়িত হয়েছে। বলাকা থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যরচনারীতি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন শেষ পর্যায়ের কাব্যে তাই-ই চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এখানে কবির নব নব রচনারীতির উদ্ভাবন লক্ষ্য করব। কাব্যের গঠন নিয়ে কবির এই সচেতনতা বিশেষ করে বলাকা পর্বের দান। এই পর্বে কবির দৃষ্টি অনেক বাস্তবমুখী হয়েছে যার ফলে পলাতকা-র মত মানবজীবনের হাসি-কান্না এবং দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের জোয়ার-ভাটায় আন্দোলিত কাব্য রচিত হয়েছে। এই ধরনের কবিতাগুলি সরল অনাড়ম্বর, স্বচ্ছ ও স্বাধীন। এই সংসারের বিচিত্র লীলার মধ্যে এবং প্রকৃতির রূপ-রসকে কবির আবার নিবিড়ভাবে উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগল। এই ইচ্ছাই পূরবী ও অন্যান্য কাব্যের কবিতাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। জীবন ও পৃথিবীর সকল বস্তুই কবির বিস্ময় উদ্রেক করেছে—

কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।

—চৈতালি, 'দুর্লভ জন্ম'

এই জীবন ও পৃথিবীর প্রতি মমতা তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলিতে অপূর্ব

ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্যায়কে রবীন্দ্রকাব্যের ৬ষ্ঠ পর্যায় অর্থাৎ শেষ পর্যায় বলা হয়েছে। এই পর্বের ব্যাপ্তি ১৯২৫ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত। এই পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের চিন্তাধারা সংহত হয়েছে। তাঁর কাব্য-প্রবাহে প্রত্যেকটি পর্বের সঙ্গে পরবর্তী পর্বের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন। আলোচ্য সময়ের মধ্যে বাইশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, পরিশেষ, পুনশ্চ, বিচিত্রিতা, বীথিকা, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী, খাপছাড়া, প্রান্তিক, সেঁজুতি, প্রহাসিনী, আকাশ-প্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, ছড়া এবং শেষ লেখা। এই কয়খানি বইয়ের কবিতাগুলির মধ্যে বিচিত্র চিন্তা ও বিষয়-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু এবং রীতির দিক থেকে পুনরাবৃত্তিও দুর্লক্ষ্য নয়। এই পর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য থাকলেও চিন্তাধারায় কতকগুলি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তাই কাব্যগুলিকে একটি পর্যায়ে সন্নিবেশিত করে একযোগে আলোচনা করা সমীচীন। সেইজন্য সব কয়েকটি কাব্যকেই শেষ পর্যায়ের কাব্য বলা হয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যায়ের শুরু কোন্‌খানে এ নিয়ে মতবিরোধের অবকাশ আছে। কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যের অন্তিম পর্যায় বলতে প্রান্তিক থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত বলেছেন।[১] শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়ে প্রান্তিক থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত কাব্যকে সন্নিবেশ করেছেন।[২] আবার কোন কোন সমালোচক দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চেয়েছেন যে পরিশেষ থেকেই শেষ পর্যায়ের সূচনা বলা উচিত। পূরবীতে আসন্ন বিদায়ের বিষণ্ণ সুর শোনা গেলেও, মৃত্যুভাবনার পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি সত্ত্বেও এখানে শেষ পর্যায়ের সূচনা হল বলা যাবে না, কারণ এখানে যৌবন-ভাবনার উজ্জীবন ও স্মৃতিই বড় হয়ে উঠেছে। "তাই পূরবী থেকে রবীন্দ্রকাব্যে গোধূলি পর্যায় শুরু হয়েছে বলা সংগত ও সমীচীন হবে না,······গোধূলি পর্যায়ের শেষ যেমন শেষ লেখা গ্রন্থে—তেমনি সেই পর্বের শুরু পরিশেষে।"[৩] অনেক বিদগ্ধজন আবার অন্য রকম মত পোষণ করে থাকেন। ড. হরপ্রসাদ মিত্রের মতে পূরবীতেই রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্বের সূচনা।[৪] ড.

১. শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য (১৩৬৮), পৃ. ২

২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ. ৮৪

৩. শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু, রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায় (১৩৭৯), পৃ. ১১-১২

৪. ড. হরপ্রসাদ মিত্র, রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ (১৩৭০), পৃ. ৩২০

অরুণকুমার বসুও পূরবী থেকে জন্মদিনে পর্যন্ত একটি পর্যায় বলেছেন এবং এই পর্যায়টিই শেষ পর্যায়। —"১৩৩২এ পূরবী থেকে ১৩৪৮-এর জন্মদিনে পর্যন্ত পর্বকে বলা যায় উদ্‌যাপন পর্ব।"[১]

উপরোক্ত মতামতগুলিতে দেখা যায় কোন কোন সমালোচক শেষ পর্যায়ের সূচনাকে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের একেবারে অন্তিম পর্বে স্থাপন করতে চান। কোন কবির কাব্যে পর্ব-বিভাগ সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কবির কাব্যপ্রবাহ অখণ্ড। কাল অনুসারে বা কাব্যের নাম অনুসারে পর্যায়-বিভাগ সঙ্গত হয় না, কবিভাবনা ও আঙ্গিকের পরিবর্তনের দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। পূরবী থেকে কবির প্রবণতা একটি পরিবর্তনের পথে চলেছিল এবং সেই সঙ্গে কাব্যের আঙ্গিকের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল নূতনত্ব। তাই ভাব ও ভাষা, উভয় দিক থেকে বিচার করে পূরবী-কেই শেষ পর্যায়ের প্রথম কাব্য বলে উল্লেখ করলে অসঙ্গত হবে না। শুধু মাত্র মৃত্যুচিন্তার পুনঃ পুনঃ উপস্থিতির জন্য পূরবী-কে শেষ পর্যায়ে স্থাপন করা হয় নি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায় মৃত্যুচিন্তার উপস্থিতি রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বগুলিতে বিরল নয় এবং মৃত্যুকে কাব্যে রূপদান করা রোমান্টিক কবিদের একটি বিশেষ প্রবণতা। এদিক দিয়ে বিচার করলে পূরবীর মৃত্যু-ভাবনার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পূর্ব পূর্ব পর্বগুলির মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে পূরবীর মৃত্যুচিন্তার একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ বর্তমান। পূরবী থেকেই কবি নিজের জীবনে মৃত্যুর ক্রমাগ্রসরমান পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। এখানেই কবি অনুভব করেছেন এই পৃথিবী তাঁকে ত্যাগ করে যেতে হবে, তাই জগত ও জীবনের প্রতি তাঁর আসক্তি আরও নিবিড় হয়েছে। অনুরাগের বর্ণক্ষেপে তাঁর কাব্য ব্যথারঙীন হয়ে উঠেছে। এবং তাঁর কাব্যে অনিবার্যভাবেই স্মৃতিচারণা যুক্ত হয়ে গেছে। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে কবির কাব্যে আবির্ভূত হয়েছে নূতন অনুবাদ, নূতন ভাষা এবং অনবদ্য চিত্রকল্প। সোনার তরী, চিত্রা বা কল্পনার যুগের স্মৃতিচারণার সঙ্গে পূরবীর স্মৃতিচারণার পার্থক্য আছে। পূর্ব পর্বের স্মৃতি-রোমন্থনের মূলে রোমান্টিক অতৃপ্তি এবং অতীত যুগের প্রেম-সৌন্দর্যের জন্য মুগ্ধ কল্পনা। কিন্তু পূরবীর স্মৃতি-চর্বণায় মননের স্পর্শ লেগেছে; এই স্মৃতি মূলতঃ সুদূর-অতীত যুগের স্মৃতি নয়, কবির ফেলে-আসা অতীত জীবনের স্মৃতি। এই বিষণ্ণ গোধূলি-

১. ড. অরুণকুমার বসু, রবীন্দ্র বিচিন্তা (১৩৭৫), পৃ. ১

আলোয় যৌবন-মধ্যাহ্নের স্মৃতি রোমন্থনে একটা অনাসক্ত সম্ভোগের ইচ্ছা। কারণ কবি স্পষ্টতঃই অনুভব করেছেন—"মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি।"[১] পূরবী-তে যেহেতু কবি তাঁর যৌবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যময় দিনগুলিকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন এবং 'বিজয়ী' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় যৌবন-বন্দনা করেছেন, সেইহেতু অনেকে পূরবী কাব্যকে তাঁর অতীত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি বলে মনে করেছেন। কিন্তু অতীতের সৌন্দর্যময় দিনগুলির অনুধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে যে শেষের সুরটি তাঁর চিত্তবীণায় ঝংকার তুলেছে, এই তীক্ষ্ণ ও তীব্র বেদনার সূচনা সম্ভবতঃ পূরবী-তেই। এর পূর্বে আর কবি কখনও এমনভাবে নিজের ব্যথাদীর্ণ অন্তরকে প্রকাশ করেন নি। 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটির উল্লেখ করলে এই ধারণা স্পষ্ট হবে—

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
... ...
এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?

—পূরবী, 'লীলাসঙ্গিনী'

পূরবী-র পরবর্তী কাব্য মহুয়া। প্রেমানুরাগের উচ্ছল লীলাই এই কাব্যের উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গাম্ভীর্য ও বিষণ্ণতা এই কাব্যে অনুপস্থিত। এই কাব্য পাঠে কবির মনে নূতন করে বসন্তের আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই এই কাব্যকে শেষ পর্যায়ের কাব্য বলাতে আপত্তি হতে পারে এবং বলা যেতে পারে যেহেতু [illegible]

১. পূরবী, 'যাত্রা'

পূরবী-র পরবর্তী সেইহেতু পূরবী থেকে শেষ পর্যায়ের শুরু, এই ধারণাও অসঙ্গত। এই আপত্তির উত্তরে প্রথমতঃ বলা যায় কোন কবির কাব্যপ্রবাহকে আক্ষরিক অর্থে পর্বে বিভক্ত করা যায় না। এক পর্বের মধ্যে অন্য পর্বের প্রবণতা মিশে থাকতে পারে। তাই শেষ পর্যায়ের কাব্যে যে পূর্ব পর্যায়ের কাব্যকৃতির কিছু নিদর্শন থেকে যাবে এটা অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, মহুয়া সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়, এটা ফরমায়েশী রচনা। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং অপূর্বকুমার চন্দ প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে কবি বিবাহে উপহার দেবার জন্য তাঁর সমগ্র কাব্য থেকে কবিতা নির্বাচন করে একটি সংকলন প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুত হন। এই সংকলনকালে কবি প্রেমের আবেগ অনুভব করে প্রৌঢ় প্রহরে আবার প্রেমের কবিতা লিখেছেন যার সঙ্গে কবির অতীত প্রেম-কবিতার একটি মৌলিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তা হল দেহ-মনের আকাঙ্ক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেম। তবে মহুয়ার প্রেমানুভূতি সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা-র প্রেম থেকে পৃথক, এখানে প্রেমের তত্ত্ব ও দর্শন রূপায়িত হয়েছে। এই প্রেম বিশুদ্ধ জাগতিক প্রেম এবং তা রবীন্দ্রোচিত চিত্ত সংযম ও দেহাতিক্রান্ত মনন-কল্পনা-সঞ্জাত। এবং তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন যে মহুয়ার কবিতাগুলি আকস্মিক। যদিও আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এই কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল কাব্যপ্রবাহের মিল দুর্লক্ষ্য নয় তবু কোন একটি আকস্মিক সৃষ্টির দ্বারা মূল কাব্যপ্রবাহের প্রবণতার বিচার হতে পারে না। তাই মহুয়ার অন্তর্ভুক্তির জন্য শেষ পর্যায়ের শুরু পূরবী থেকে নয় একথা বলা সঙ্গত নয়। কবির একেবারে শেষ পর্যায়েও লঘু কবিতা লক্ষ্য করা যায় যা তাঁর মূল কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। তাই পূরবী থেকে শেষ পর্যায়ের শুরু বলতে কোন বাধা নেই।

পরিশেষে, পূরবী থেকে শেষ পর্যায়ের আরম্ভ হয়েছে একথা বলার আরও কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যায়। শেষ পর্যায়ের কাব্যের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য যেমন স্মৃতিচারণা, মর্ত্যপ্রীতি, মৃত্যুচিন্তা এবং সর্বোপরি একটি বিষাদময় গাম্ভীর্য—এর প্রত্যেকটি পূরবী-তে লক্ষ্য করা যায়। এবং স্মৃতিচারণা ইত্যাদি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সূচনা এখানে বলা যেতে পারে। পূরবী-র পূর্ববর্তী পর্বগুলিতে যে স্মৃতিচারণা লক্ষ্য করা যায় তা অতীত যুগ, অতীত সৌন্দর্য এবং অতীত ভারতবর্ষের স্মৃতি; কিন্তু পূরবী থেকেই কবি নিজের অতীত জীবনের স্মৃতিকে কাব্যে রূপায়িত করেছেন। মৃত্যুচিন্তা সম্পর্কেও একই কথা।

বলা চলে। পূরবীর পূর্ববর্তী যুগে অন্যান্য রোমান্টিক কবিদের মত মৃত্যু সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের একটি রোমান্টিক রহস্যময় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। মৃত্যুকে তিনি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলে প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পূরবী থেকেই আমরা দেখতে পাই নিজ জীবনে কবি মৃত্যুর ক্রমাগ্রসরমান পদধ্বনি শুনেছেন। জগত ও জীবনের নশ্বরতা অনুভব করে কবি পৃথিবীকে আরও গভীরভাবে ভালবেসেছেন।

বনবাণী-র উদ্ভিদ-জগতের প্রশস্তি, নিসর্গপ্রেম ও বিশ্বানুভূতির মধ্যে কবির শেষ পর্যায়ের দার্শনিক চিন্তাই ব্যক্ত হয়েছে।

পূরবী, মহুয়া, বনবাণীর মধ্যে শেষ পর্যায়ের সূচনা ও উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যায়ের মৌলিক চিন্তাগুলির পরিচয় পূরবী-তেই ফুটে উঠেছে। পরিশেষ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত কাব্যধারার মধ্যে শেষ পর্যায়ের পরিণত ও সংহত রূপ লক্ষ্য করা যায়।

শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি বাস্তব। জীবনের অন্যান্য পর্বে কবির চিন্তা আদর্শলোক ও সৌন্দর্যলোকবিহারী হলেও তাঁর চিন্তা কখনো পৃথিবী ও মানবকে ত্যাগ করে নি। শেষ পর্যায়ে এসে এই চিন্তা আরও সমৃদ্ধতর ও বিচিত্রতর হয়েছে।

শেষ পর্যায়ের কাব্যের বিচারে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলি যা সমগ্র দেশ ও বিশেষভাবে কবির মনকে প্রভাবিত করেছে তার পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ তাঁর চিন্তাধারায় ছাপ রেখে গেছে। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি ও মানবতার অপচয় কবির কাছে আরও প্রকট হয়ে ওঠে রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা দর্শনের পর। শেষ পর্যায়ের কাব্যে কবির মানবকে কেন্দ্র করে যে চিন্তা তা এই ঘটনার দ্বারা কিয়দংশে প্রভাবিত। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং শাসকশ্রেণীর অত্যাচার এবং অবিচারে কবি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। দেশের অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেরও কয়েকটি ঘটনায় কবি মর্মাহত হন। ১৯৩৬ এ ফ্যাসিস্ট ইতালির আবিসিনিয়া গ্রাস, এবং জাপানের চীন আক্রমণে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনের পট পরিবর্তিত হল। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানবতার অপমানে কবিচিত্ত বেদনাপ্লুত হয়ে পড়ে।

কবির ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যৌবন-অতিক্রান্ত

কবি নিজ জীবনে মৃত্যুর আগমনকে উপলব্ধি করছেন। ১৩৬৭ সালের নিদারুণ ব্যাধিতে কবি স্বচ্ছ-শুভ্র চৈতন্য, শৌর্য ও সংহতি লাভ করেছেন। 'সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে' যেমন নিজের জীবনকে অনুভব করেছেন, তেমনি ধনসঞ্চয়-সর্বস্ব, মানবতা-ধ্বংসকারী উৎপীড়ক সভ্যতার সমাপ্তির অবশ্যম্ভাবিতা অনুভব করে নূতন সমাজে চিরন্তন মানবতার প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গোধূলি-পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কয়েকটি ভাবপ্রবাহের পরিচয় পাই। কবির আত্মবিশ্লেষণ, পূর্বজীবনের স্মৃতি, মানবজীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় দার্শনিকতা, প্রকৃতি ও মানবপ্রেম সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী অখণ্ড মানবতা ও নিত্যতার উপলব্ধি। এই চিন্তাধারা রবীন্দ্রকাব্যে আকস্মিক কিছু নয়, তবে শেষ বয়সে এসে এগুলি আরও প্রত্যয়নিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ হয়েছে। এই চিন্তাগুলির কোনটিই কবির জীবন-বিবিক্ত কিছু নয়। এই অর্থে কবি শেষ যুগে অনেক বেশি আধুনিক। রোমান্টিক কবিরা সাধারণতঃ হন আত্মকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথও স্বভাবতই এর ব্যতিক্রম নন। তবে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ যুগের রোমান্টিকতা হল বাস্তবজীবন ও যুগের প্রবণতাকে গ্রহণ করে তাকে নিত্যতার রসলোকে উত্তীর্ণ করা। সানাই-এর 'অনসূয়া' কবিতায় বলেছেন—

কাঁঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।
... .. .
এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক—
আমি সেই পথের পথিক
যে-পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে-পথের অলক্ষ্য আকাশে।

এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে,
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে-বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার।

ভাব ও বাস্তবের এই মিল-বন্ধন রবীন্দ্রকাব্যে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। কবিজীবনের শেষ অধ্যায়ে জীবনের সত্যরূপ এবং মৃত্যু ও মানব-সম্পর্কীয় আধ্যাত্মিক দার্শনিকতা দেখা যায়, অন্যদিকে সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা এবং এর জন্য হতাশা, বেদনাও লক্ষ্য করা যায়। কবি এই যুগে আশ্চর্যভাবে যুগ-সচেতন। তাই রচিত হয়েছে পরিশেষে-এর 'প্রশ্ন' এবং প্রান্তিক-এর ১৮ সংখ্যক কবিতার মত কবিতা।

শেষ পর্যায়ের কবিতায় প্রকৃতি বা বিশ্ব-নিসর্গের সঙ্গে মানব-সত্তার যে চিরকালীন সম্পর্ক তা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে। এই যুগের প্রকৃতি-চিন্তায় পূর্ব যুগের চিন্তার অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ব-নিসর্গের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বলে উপলব্ধি করেছেন এবং শেষ জীবনে কবি প্রকৃতির সান্নিধ্যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। কবির বিশ্বাস, জীবন-গোধূলিতে সঞ্চিত মলিনতা, আবিলতা এবং অশান্তি থেকে প্রকৃতিই পারে কবিকে মুক্তি দিতে। মনে করেছেন, অনাদি প্রাণপ্রবাহ প্রকৃতি ও মানব উভয়ের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। তাই নিসর্গ ও মানবের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এই শেষ যুগে কবির এই নিসর্গ-চর্যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে উপলব্ধি হয়েছে।

কয়েকটি কবিতায় কবি তাঁর নিজের জীবন পর্যালোচনা করেছেন। নিজের সাহিত্য-কীর্তি এবং সাধারণভাবে কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে নানা চিন্তা ও মতামত এই অধ্যায়ের কবিতার আলোচ্য বিষয় হয়েছে।

এই যুগে কবির বিষয় চেতনা বহুবিস্তৃত হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ এমন কি কীটপতঙ্গের জীবনও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। তুচ্ছ প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তাতে প্রত্যক্ষতার সঙ্গে কবির কল্পনা যুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের গদ্য-কবিতাগুলি এর আশ্চর্য নিদর্শন।

শেষ পর্যায়ের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর রচনাভঙ্গী; আবেগ এখানে অনেক সংযত। এখানে সর্বত্রই একটা দৃঢ় সংহত রূপ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ের কাব্যে কবি নিয়মিত তাল-লয়ে-বাঁধা মিলহীন ছন্দ প্রবর্তন করলেন, এবং অনেক কবিতায় গদ্যভঙ্গী গ্রহণ করলেন। মিলযুক্ত ছন্দ-অলংকারের বন্ধন কবির স্বাধীন কল্পনার বাধাস্বরূপ হতে পারে, পদ্যের ছন্দ নটীর শিক্ষিত পদক্ষেপ—এই পর্যায়ে এই উপলব্ধি তাঁর স্পষ্ট। তিনি মনে করেছেন জীবনের সব অবস্থার এবং মানস-কল্পনার কাব্যরূপ-দান গদ্যছন্দে সম্ভব। এই যুগের কাব্যে তিনি যুক্তাক্ষরের

ইচ্ছামত গ্রহণ ও বর্জন এবং চলতি ভাষার ব্যবহার দ্বারা কাব্যের প্রকাশ-ক্ষমতাকে বহুগুণ বর্ধিত করেছেন। কতগুলি কাব্যে তিনি ছন্দে অন্ত্যমিল বজায় রেখেছেন, আবার কোন কোন স্থানে অন্ত্যমিলহীন অসম পঙক্তির ব্যবহার করেছেন। এই যুগের কাব্যে ছন্দের ঝংকার স্পষ্ট অনুভূত হয়; কিন্তু ছন্দের বন্ধন দৃষ্ট হয় না। উপমা এবং চিত্রকল্পগুলিকে (ইমেজ) তুচ্ছ বাস্তব থেকে আহরণ করা হয়েছে। উপমা প্রয়োগের বিশিষ্টতা এই যুগের কাব্যাঙ্গিকের একটি বিশেষ লক্ষণ।

এখানে ভাষা অধিকাংশ স্থানে অলংকার-বর্জিত তীব্র সংবেদনশীল। ছন্দ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলা যায়। এখানে ছন্দ মাত্রার উপর বা পঙক্তির উপর নির্ভর করে না, ভাবের উপর নির্ভর করে। শেষ পর্যায়ের কাব্য রূপ-সচেতন এবং কবিকর্ম রূপদক্ষ। এখানকার ছন্দে কোনরূপ ললিত ভঙ্গী নেই, যদিও তাকে কঠোর বলা যাবে না। এর মধ্যে চাপল্য বা ক্ষিপ্রতা নেই, আছে ভাষাকে সংহত করার গভীর ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতায় সেই ব্যক্তিনিষ্ঠ ভঙ্গী বিদ্যমান, যাকে লিভিস্ (Leavius) বলেছেন 'অনামা থাকবার গুণ'। এই সময়ের কবিতাগুলিতে মিলগুলির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত চমক আছে। মিল যদি খুব প্রত্যাশিত হয় তাহলে কাব্যের আবেদন গভীর হয় না। শেষ পর্যায়ের কাব্যের আঙ্গিক সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এই কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

উপরোক্ত আলোচনা এবং পর্ব-বিভাগ থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ের কাব্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তবে চিন্তাধারার দিক থেকে অভিনব কিছু এখানে নেই; যা আছে তা হল কবির পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা এবং মননজাত ফসল। জগত ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির কাব্যেও পরিবর্তন এসেছে। রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কবির বিভিন্ন মানসিকতার পরিচয় আছে। তবে শেষ পর্যায়ের কাব্যের বৈচিত্র্য এবং মনন-কল্পনা সত্যিই বিস্ময়কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শেষ পর্যায়ের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

অগ্রসরমান জীবনশেষের সময়কালে রবীন্দ্রকাব্য নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কবি-জীবনের নানা পর্বে নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত। যদিও কোন পর্বের সঙ্গে অন্য পর্বের আমূল পার্থক্য থাকে না। তাঁর কাব্যে সর্বত্রই প্রকৃতি-প্রীতি, সমাজের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ-বোধ, প্রেম-চেতনার উদ্বোধন এবং সমগ্র বিশ্বের উদার পটভূমিকায় মানবের অভিষেক লক্ষণীয়। শেষ জীবনে তিনি পৃথিবীর নানা দেশ পর্যটন করে এসেছেন। নিজের কাব্যপ্রবণতার সঙ্গে সমকালীন যুগচেতনার সংঘাত অনুভব করেও মৌল বিশ্বাসগুলিতে আস্থা স্থির রেখেছেন। তাই এই সময়ে তাঁর কাব্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও শাশ্বত সুরটি অনুভব করতে পাঠকের ভুল হয় না। সমকালীন নানা ঘটনার তরঙ্গে তাঁর কাব্যতরণী দোলায়িত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে যাত্রা করেছে স্মৃতির পথরেখা ধরে। পূরবী কাব্য থেকেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রকাব্যে শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি শুনি। পরবর্তী কাব্যগুলিতে দিবাবসানের অন্ধকার আরও নিবিড় হয়ে আসে। যৌবনের সিংহদ্বার অতিক্রম করে তিনি প্রৌঢ়ত্বের প্রাসাদে •প্রবেশ করছেন, প্রতি পদক্ষেপে শুনছেন মৃত্যুর আহ্বান। ফলে এই নশ্বর পৃথিবীকে নূতন করে সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টি-রহস্যের গভীরে প্রবেশের উৎসাহ এই শেষ পর্বের কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রকাব্যে এক স্বপ্নলোক ও সৌন্দর্যলোকে অভিসার; কিন্তু শেষ পর্বে কবি কল্পলোকের মায়ামোহ পরিত্যাগ করে নেমে এলেন প্রতিদিনের সমস্যা-জর্জরিত, ধূলিময় পৃথিবীর মাঝখানে। তাই আজ আর শ্রমিক, কর্মী সাধারণ মানুষ, এমন কি গ্রামের কুকুরটিরও তাঁর কাব্যে প্রবেশের কোন বাধাই রইল না। কিন্তু কবি এখানে ঐ সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পথে বহুকালের বাধা অতিক্রম করতে পারছেন না; তাই কবিকণ্ঠ অপূর্ণতার বেদনায় ক্লিষ্ট। শেষ যুগে তাঁর কাব্য-ভাষায়ও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। গদ্য-ছন্দ-ময়, দৃঢ়সংবদ্ধ, সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ অর্থবাহী বাণীভঙ্গীই তিনি তাঁর কবিতার বাহন নির্বাচন করেছেন। পৃথিবীর নানা

দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শক্তি-মদমত্ততা ও সমরায়োজন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বেদনা বোধ করেছেন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে তাঁর মনকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছে স্বদেশে বিদেশীর কুশাসন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে যুবশক্তির অপচয়। ইহকালের মত্ততার সঙ্গে চিরকালের গভীর সুরটির অন্বয়-সাধনের প্রয়াস তাঁর কাব্যগুলির ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে। আলোচ্য পর্বে সংঘাতময় বর্তমানের অশান্তিতে মন যখন বিচলিত তখনই তিনি যাত্রা করেছেন মানসলোকের সেই সুদূর অতীতে ফেলে-আসা বন্দরের দিকে। যেখানে বহু সুখে, বহু দুঃখে এককালে তিনি কাব্য-তরণী ভিড়িয়েছিলেন। যে প্রেম এককালে ছিল প্রত্যক্ষগোচর, আযত্তের মধ্যে, আজ তাকে নূতন করে রাঙিয়ে তুললেন স্মৃতির রাগে। কিন্তু সমস্তের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে এক গভীর অনাসক্তি। এই অনাসক্তিকে অবশ্যই আমরা প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করব না। কারণ এই অনাসক্তি আসার গভীর আকর্ষণজনিত। রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রহরের কাব্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। সেগুলি পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য।

মর্ত্যজীবনের প্রতি অপরিমেয় আসক্তি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি সাধারণ লক্ষণ। জীবনে যতই সায়াহ্নের ছায়া গাঢ়তর হচ্ছে ততই গভীর আবেগে তিনি এই মর্ত্যপৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে চাইছেন। এই যুগের যাবতীয় রচনাতেই সুতীব্র জীবনানুরাগ ও মৃত্তিকাচেতনা লক্ষ্য করা যায়। পূরবী থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত সমস্ত কাব্যেই মর্ত্যপ্রীতি ও জীবনাসক্তি নব নব রূপে স্পন্দিত।

সোনার তরী, চিত্রা র যুগের বিশ্বচেতনা যেন আরও সহজ সরল হয়ে এই যুগের মৃত্তিকা-চেতনায় রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় মৃণ্ময়ী পৃথিবী চিন্ময়ী জননী রূপে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন সেই সোনার তরী র যুগ থেকেই। এই সময় কবি অনুভব করেছেন যে আদিম যুগে কোন এক সময় তিনি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেন। তাই তৃণের শিহরণ, পুষ্প-বিকাশের আনন্দ এবং সমুদ্রের কল্লোল তার কাছে অতি-পরিচিত বলে মনে হয়। রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের অপূর্ব ভাষ্য পাই 'ছিন্নপত্রে'। কবি এক স্থানে বলেছেন— 'এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর

আত্মীয়তা আছে নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়।'

সোনার তরী-র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবি সমুদ্রকে আদি জননী বলে সম্বোধন করেছেন। সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের যে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ তা অপূর্ব দার্শনিকতায় মণ্ডিত হয়ে এই কবিতাটিতে রূপ লাভ করেছে—

> .... মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
> নাড়ীতে যে-রক্ত বহে, সেও যেন ঐ ভাষা জানে,
> আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
> যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
> অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
> ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
> মুদ্রিত হইয়া গেছে।

শেষ পর্যায়ের প্রথম কাব্য পূরবী-তে এসে আমরা এই ধারণারই প্রকাশ দেখি 'সমুদ্র' কবিতায়। অজ্ঞাত অস্ফুট যা সমুদ্রগর্ভে লীন হয়ে আছে তাই-ই সমুদ্রের কলরোলের মধ্যে প্রকাশের যন্ত্রণা ব্যক্ত করছে।

> হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
> রাত্রিবেলা; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
> স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা;
> যুগযুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
> তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
> প্রকাশ সন্ধান করে।

জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা দেখি সোনার তরী-র অপর একটি কবিতা 'বসুন্ধরা'য়। এখানে তিনি সহজ সুখে পৃথিবীর মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিচ্ছেন। এই মৃন্ময়ী মাতা বসুন্ধরার কোলে ফিরে যাবার আকূতি দেখি শেষ পর্যায়ের প্রবেশক কাব্য পূরবী-র 'মাটির ডাক' কবিতায়। কবি পৃথিবীর সঙ্গে ছিন্ন-নাড়ীর যোগ অনুভব করছেন এবং পৃথিবীর কানায় কানায় পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য-দর্শনে শিহরিত হয়ে উঠছেন। কবিতাটিতে কবিপ্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে—

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তি-সুখে,

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ.

জীবনের অপরাহ্ণবেলায় পৃথিবীর সমস্তকেই বলছেন 'ভালো'। যারা কবির 'সাঁঝ-সকালের গানের দীপে' শিখা সংযোগ করেছে তাদের প্রত্যেকের অমৃত-ময় পরশ অনুভব করেছেন। জীবন-সাগরে ডুব দিয়ে ছোটো ছোটো সুখদুঃখ আহরণকে তিনি পরম লাভ বলেই গণ্য করছেন।—

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—,
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো"।

—পূরবী, 'পূরবী'

পূরবী কাব্যেই 'লিপি' কবিতাটি মর্তানুরাগের এক উজ্জ্বল নিদর্শন, পূর্ব আকাশের সূর্যোদয় কবিকে শিশুকাল থেকে আকর্ষণ করছে। আজও এই অপরাহ্ণবেলায় সমুদ্রের উপর একটি প্রভাতের আগমনী-ঘোষণা কবির চোখের সম্মুখে পৃথিবীর এক নূতনতর রূপ মেলে ধরেছে। কবি তাঁর পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী গ্রন্থে লিখেছেন—"এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে।..... সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে?

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে।' এইটিই 'লিপি' কবিতার জন্মসূত্র।

'প্রভাত' কবিতাটিতে মর্ত্যজীবনের প্রতি অনুরক্তির সঙ্গে কবির চিরকালের সুদূরের আকাঙ্ক্ষা অন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এই স্বচ্ছ উদার গগন
বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ শব্দহীন সুর।
আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর।

কবি মর্ত্যপ্রীতির এক চরম ব্যাখ্যা দান করেছেন 'কঙ্কাল' কবিতায়। রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে তিনি অরূপরতন তুলে এনেছেন। পৃথিবীর নশ্বরতার উপর উড্ডীন করেছেন শাশ্বত আনন্দ ও সৌন্দর্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী। মৃত্যুতে যে শুধুমাত্র শূন্যতার উপহাস একথা কবি বিশ্বাস করেন না। কবির যা সত্য-পরিচয় তা মাংসের মানদণ্ডে পরিমাপযোগ্য নয়। তাই তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা—

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান।
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

এই জগতের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য এবং পশুতার ঊর্ধ্বে এক পরম কল্যাণময় ও আনন্দময়ের অবস্থিতি কবির গীতাঞ্জলি পর্বের অনেক কবিতায় ছড়িয়ে আছে।

কবির প্রতি দিবসের গানের অঞ্জলি-সমর্পণ প্রাণের জাহ্নবী-জলধারায়। তা যদি কালের অমোঘ স্পর্শে লুপ্ত হয়ে যায়, কবির দুঃখ নেই। তাঁর আনন্দ এই অপূর্ব পৃথিবীকে প্রতিদিনের অর্ঘ্যদানে। এরই স্বীকৃতি 'প্রাণগঙ্গা' কবিতায়—

এই নীলাম্বরতলে তৃণরোমাঞ্চিত ধরণীতে,
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি অবসান
ধন্য হয়ে ভেসে যাক গান।

পরিশেষ কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রণাম'-এ কবির মর্তপ্রীতি নূতনতর-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যাত্রার প্রাক্‌কালে যে বিচিত্রের নর্মবাঁশি কবি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সমগ্র জীবনব্যাপী সেই বাঁশরীতে কবি সুর সাধনা করেছেন। দিনান্তে মানবের মন্দিরে সেই সুরের অর্ঘ্য নিবেদন করছেন—

এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে, একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

'আছি' কবিতায় কবি বৈশাখের তপ্ত বাতাসের মাতামাতি লক্ষ্য করেছেন কলাগাছের দীর্ঘ পাতায়, বেলফুলের ম্লান গন্ধে, অশথপাতার নাচনে এবং বটগাছের সবুজ ছায়ায় ঘুঘু পাখীর নিদ্রাভঙ্গে। বাতাসে যেমন সহজ প্রাণের আবেগের কাঁপন তেমনি কবির বুকেও কাঁপন জাগছে ছন্দে। তিনি অনুভব করছেন—

না থাক খ্যাতি না থাক্ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার,—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।

'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে কবির মানবজন্ম পরিগ্রহের সার্থকতা এবং সেই সঙ্গে পৃথিবী-প্রীতির কথাই উচ্চারিত হয়েছে। পশ্চিম-পথশেষে এসে কবি তাঁর ভালবাসার পরিমাপ করছেন। জীবনের বেদনার পাত্রগুলি কখন অলক্ষ্যে পূর্ণ হয়েছে অমৃতে। বহুপরিচিত এই পৃথিবীর রহস্য যেন কবি নিত্য নূতনভাবে অনুভব করছেন। দুর্লভ এই মানবজন্মের অধিকারী হয়ে তিনি চরিতার্থ—

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।

প্রান্তিক রচনাকালে কবির মনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। কারণ গুরুতর পীড়াভোগ। মৃত্যুদূতের আবির্ভাবে এবং জীবনাবসানের ইঙ্গিতে কবির মর্ত্য-মমতার রূপটি প্রান্তিক এর কয়েকটি কবিতার মধ্যে ফুটে উঠতে দেখি। লুপ্তিগুহা থেকে মুক্তি লাভ করে কবির চৈতন্য শুভ্র-আলোকে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের বিভ্রম ঘুচে কবির দৃষ্টি আগের মতই আসক্তিময় ও অনুরাগে নিবিড়। জীবনের তুচ্ছতার আবরণ সরে গিয়ে মর্ত্যের প্রান্তপথ যেন হয়ে ওঠে দীপ্তি-সমুজ্জ্বল। সহজের মধ্যে সহজে ফিরে এসে কবির মন যেন মুক্তি লাভ করেন। কৃচ্ছ্রসাধনায় মুক্তি আসে না, মুক্তি নেই বৈরাগ্যেও। বিশ্ব-সংসারের মধ্যে মনটাকে মেলে ধরাতেই চরিতার্থতা—

তাই সর্ব দেহমন প্রাণ
সূক্ষ্ম হয়ে প্রসারিল আজি ঐ নিঃশব্দ প্রান্তরে,
ছায়ারৌদ্রে হেথাহোথা, যেথায় রোমন্থনরত ধেনু
আলস্যে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিরস সম্ভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে।

—প্রান্তিক, ৬ সংখ্যক কবিতা

৪ সংখ্যক কবিতায় কবি সৃষ্টির আদিম যুগের প্রকাশের সেই আনন্দকে হারানো এবং সত্যের অবলুপ্তির ব্যথায় কাতর। আবার ৬ সংখ্যক কবিতায় দেখি অন্তিম যাত্রার আগে কবি প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও, পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।

এ জীবনকে অস্বীকার করে যে বৈরাগ্যসাধন তাকে কবি অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর মনে করেছেন। তা ব্যাধিস্বরূপ। জীবনের সার্থকতার চিন্তায় কবির মন চলে যায় সুদূর সেই মোহময় অতীতে যখন—

কালের অঞ্জলি হতে ভ্রষ্ট কত অব্যক্ত মাধুরী
রসে পূর্ণ করিয়াছে থরে থরে মনের বাতাস।

—প্রান্তিক, ৭ সংখ্যক কবিতা

অথবা যেঁ অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের কম্পমান হাত থেকে বরমাল্য কণ্ঠে ওঠে নি তার স্মৃতি আজও অমলিন, যে জীবন কল্পনায় বাস্তবে, সত্যে, ছলনায়, জয় পরাজয়ে রহস্যময়, যে জীবন 'অস্তিত্বের সারথি' হয়ে বহু সংগ্রামে উত্তীর্ণ করেছে, কবি বিশ্বাস করেন সেই জীবনই আজ এই গোধূলিতে মৃত্যুসংগ্রাম-শেষে নবতর বিজয়-যাত্রায় অবতীর্ণ করাবে। আবার ১৭ সংখ্যক কবিতায় কবি এই মর্ত্য-পৃথিবীর অশেষ দাক্ষিণ্য স্বীকার করে এই জন্মের অধিদেবতাকে বন্দনা করছেন—

সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

সেঁজুতি-র অধিকাংশ কবিতাই জীবন-সন্ধ্যাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুভাবনায়

বিষণ্ণ। প্রথম কবিতা 'জন্মদিন'-এ জীবনসমীক্ষা-শেষে কবি মর্ত্যপৃথিবীর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন—অকুণ্ঠ দাবীও জানাতে ভোলেন নি—

তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী-
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান।

কবিতাটি আদ্যোপান্ত মর্ত্য-জীবনাসক্তিতে করুণ। শেষ চারটি পঙক্তিতেও আমরা দেখি সেই কারুণ্যমণ্ডিত আত্ম-প্রকাশ। বিরহস্মৃতির অভিমান নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন, কিন্তু রেখে যাবেন 'খেয়াতরীহারা এপারের ভালবাসা'।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে সম্বোধন করে পত্র কবিতাকারে লেখা 'পত্রোত্তর' কবিতাটিও মর্ত্যপ্রীতির আবেগে কম্পিত।—

জীবনেরে যাহা জেনেছি অনেক তাই;
সীমা থাকে থাক্, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে।

কবিতাটিতে মাটির প্রতি অনুরাগ, বিশ্ব-নিসর্গের স্বর ও সৌন্দর্যের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বসৌন্দর্যে নিরন্তর অবগাহনেই নিজের জীবনের সার্থকতা লাভ করেছেন কবি।

কবি অনুভব করছেন এ জীবনের সমাপ্তিতে সব চাওয়া-পাওয়া, সব ক্ষয়-ক্ষতি, সব প্রবঞ্চনা-নিষ্ফলতার অবসান হবে। সব নিঃশেষিত হলেও প্রকৃতির অকৃপণ দান, নীল আকাশের অসীম বিস্তৃতি দেহ-মনে যে অনাদিকালের মায়া সৃষ্টি করেছিল সে তো মিথ্যা হবার নয়! 'অমর্ত্য' কবিতায় অরূপানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যজীবনের শিহরণ এক ধারায় মিশেছে। মৃন্ময় পৃথিবীর জীবন যে কবির আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাও ব্যক্ত হয়েছে সাবলীলভাবে। কবির অনুভূতি মর্ত্যসীমা ছাড়িয়ে অরূপলোকের সন্ধান পেয়েছে, তবু সেই অরূপধ্যানের মধ্যে মিশে আছে এই বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তৃণস্পর্শ-বায়ু, প্রান্তর, মৃত্তিকা ও জীবলোকের দান—

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।—
ঐখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস।

'স্মরণ' কবিতাটিতে মৃত্যুভাবনার সমান্তরালে চলেছে মর্ত্যজীবনের

মাধুরীধ্যান। প্রকৃতির উদার পটভূমিকায় প্রকৃতির কোলে যদি সেই অনাগত দিনে কবির নাম স্মরণ করা হয় সেই যথেষ্ট, সভা আহ্বানের কিবা প্রয়োজন ?—

কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা,—এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

'ঘরছাড়া' কবিতায় দেখি পরিচিত পৃথিবীর কাল উত্তীর্ণ। নূতন পথে যাত্রা শুরুর ইঙ্গিত। এ কবিতার প্রতিটি ছত্র দীর্ঘশ্বাসে কম্পিত, বেদনায় আতুর। 'নিয়তির অমোঘ নির্দেশে পরিচিতের আবেষ্টনী ছাড়িয়ে যেতে হবে অজানার উদ্দেশ্যে, কিন্তু যাবার বেলায় মন উতলা, কারণ—

যেতে যেতে পথপাশে
পানাপুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহুদিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।

এই কাব্যগ্রন্থে 'জন্মদিন' নামে আর একটি কবিতা আছে। কবিতাটির সুর মধুর এবং রচনারীতি কিছু তরল। জীবনের উষালগ্নে কিভাবে বিশ্ব-নিসর্গের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় তারই একটা মনোজ্ঞ বিবরণ এই কবিতাটিতে। নিসর্গের বিভিন্ন সম্পদ তাঁর জীবনের পাত্রটিকে সুধায় ভরে দিয়েছে, তাই তিনি রেখে যাচ্ছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম—

সেই-যে ভালো-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে,
না যদি রয় নাই রহিল নাম,—
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।

'নবজাতক' কাব্যটি কবির জীবনের এক পরিবর্তিত ঋতুর ফসল। কাব্যটি সমাজ-চেতনা, মানব-চেতনা এবং ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ। বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় মানবতার অপমান দেখে কবি শিউরে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর মনের শাশ্বত বিশ্বাস থেকে ভ্রষ্ট হন নি, তাই এই নূতন ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে কবির সেই চিরকালীন পৃথিবী-প্রীতির রূপটি অপ্রকাশিত নয়।

'উদ্‌বোধন' কবিতায় কবির বক্তব্য হল সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতির রাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করত। বর্তমানে মানুষের কাছে সেই শান্তির বাণী অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাই নবযুগে নবীন কবিকে আহ্বান জানান হচ্ছে যিনি এই অশান্ত বিপর্যস্ত পৃথিবীতে জড়তা মোচন করে আনবেন সৌন্দর্য ও শান্তি। তাঁর স্থান হবে কবির আজন্ম-প্রিয় সেই পৃথিবীর প্রাঙ্গণে—বিশ্বজনের মর্মে—

জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে,
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহো আপনার স্থান,—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।

শেষ জীবনের সমস্ত কবিতাতেই বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে। জীবনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার শেষে কবি আর একবার ফিরে তাকিয়েছেন সেই চিরপরিচিত পৃথিবীর দিকে যে পৃথিবী ঋতু-সম্ভার নিয়ে তাঁর যৌবনদিনকে ভরে দিয়েছিল আনন্দের পরিপূর্ণতায়। আজ গোধূলির শেষ আলোতে দেখে নিতে চান প্রকৃতির সেই আশ্চর্য সুন্দর রূপকে—

আজি এ আঁখির শেষদৃষ্টির দিনে
ফাগুনবেলার ফুলের খেলার
দানগুলি লব চিনে।
দেখা দিয়েছিল মুখর প্রহরে
দিনের দুয়ার খুলি,
তাদের আভায় আজি মিলে যায়
রাঙা গোধূলির শেষ তুলিকায়
ক্ষণিকের রূপ-রচনলীলায়
সন্ধ্যার রঙগুলি।

—নবজাতক, 'শেষদৃষ্টি'

আমৃত্যু-রচিত প্রত্যেকটি কাব্যে নানা আঙ্গিকে, নানা অনুষঙ্গে সেই চিরন্তন মর্ত্যপ্রীতির কথাই ব্যক্ত করেছেন। রোগাক্রান্ত কবির জীবনে মৃত্যুর হিমশীতল আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির সূক্ষ্ম তারগুলিতে মীড় তুলেছে

সেই পুরোনো জগতের প্রতি আসক্তির করুণ মিনতি। প্রান্তিক-এ কবি একবার তাঁর মৃত্যুস্নানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দান করেছিলেন। সেই মৃত্যুস্নান কবিকে এক নূতন জীবনের মধ্যে উপনীত করেছিল। কবি এক অপূর্ব সমন্বয়-বোধের সমগ্রতায় পুরাতন জীবনের ভাবকল্পনার সঙ্গে নূতন জীবনের একটি যোগ স্থাপন করেন। এই অবস্থায় কবি পুনরায় মৃত্যুর মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। এ তাঁর আর এক জন্মলাভ। মৃত্যুর ছায়া যত নিকটতর হয়েছে ততই কবি পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্যকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। তাই তাঁর একেবারে অন্তিম কাব্যগুলিতে সমগ্র মানব-সংসার এক অপূর্ব মহিমায় আশ্রয় লাভ করেছে। এই বিচিত্র চলমান প্রাণধারার মধ্যে নিজের অস্তিত্বের ঘোষণাটুকুই কবির কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এই সময় কবির চৈতন্যলোকে আনন্দানুভূতির প্রকাশ অভূতপূর্ব। এই আনন্দময় অনুভূতি যেন উপনিষদের ঋষিদের উপলব্ধির সমতুল্য। এই আনন্দঘন ধ্যান-দৃষ্টিই সমগ্র বিশ্বসংসারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবনদৃশ্যের উপর প্রসারিত হয়ে আছে।

জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা রোগশয্যায় কাব্যে রূপায়িত। এই সময় কবির নবচেতনা জয়লাভ করে এবং 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি'র ধ্যানে তা মুক্তি লাভ করে। প্রত্যাশিত মৃত্যুর উপলব্ধির মধ্যে কবি নূতন উৎসাহে প্রাণের জয় ঘোষণা করেছেন। শারীরিক যন্ত্রণা তাঁর কাব্যকে স্পর্শ করে নি। সমস্ত যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে তিনি প্রকৃতির কল্যাণময় স্পর্শ অনুভব করেছেন—

> অবসন্ন আলোকের
> শরতের সায়াহ্নপ্রতিমা—
> সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা
> স্তব্ধতার হৃদয়গহনে।
> প্রতিক্ষণে নিশ্বসিত নিঃশব্দ শুশ্রূষা।
> আঁধারের গুহা দিয়ে
> আসে তার জাগরণ পথে
> হতাশ্বাস রজনীর মন্থর প্রহরগুলি
> প্রভাতের শুকতারা-পানে
> পূজাগন্ধী বাতাসের
> হিমস্পর্শ লয়ে।

সায়াহ্নের ম্লানদীপ্তি
সে করুণ ছবি
ধরিল কল্যাণরূপ
আজি প্রাতে অরুণকিরণে ;
দেখিলাম, ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি
শেফালিকুসুমরুচি আলোর থালায়।

—রোগশয্যায়, ১৬ সংখ্যক কবিতা

অন্তিম যাত্রার প্রাক্-কালে কবি নিরাসক্ত মনে কীর্তির মোহ ত্যাগ করেছেন। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন যে কীর্তি স্থায়ী হয় না; প্রকৃতির বিধানে নির্ধারিত সময়ে তার স্থান হয় কালসিন্ধু-জলতলে। কবি অনুভব করেছেন মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হলে তাঁকে কীর্তি স্থাপন করলেই হবে না, তাঁকে যাত্রা করতে হবে অস্তিত্বের ধারায়, যা প্রাণের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করে। এই প্রাণ ভরে উঠেছে বিশ্বের নিত্যসুধায়। পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তের ভালবাসা সে সঞ্চয় করেছে। তাই কবির বিশ্বাস তিনি এ সংসার ত্যাগ করে গেলেও প্রাণের নিত্যধারায় তাঁর স্থান অটুট থাকবে আর এই হবে মৃত্যুকে উত্তরণের একমাত্র পথ—

এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুকে করিবে অস্বীকার।

—রোগশয্যায়, ২৬ সংখ্যক কবিতা

কবি পৃথিবীকে ভালবাসেন তাই এই জগতে তাঁর অস্তিত্বের মূল্যও তাঁর কাছে অপরিসীম—

প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ;
আমি বেঁচে আছি, তারই অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;

—রোগশয্যায়, ২৭ সংখ্যক কবিতা

রোগাক্রান্ত কবি যতবার মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গন গ্রহণ করেছেন ততবারই

মর্ত্ত-মমতায় তাঁর কণ্ঠ নিবিড় হয়ে এসেছে। আবার আরোগ্যের প্রসন্ন প্রাতে কবি পৃথিবীর মধুময় স্পর্শ অনুভব করেছেন। যে কবি আপন ধৈর্য বীর্য এবং বিশ্বাসে মৃত্যুর আবরণ উন্মোচনে সাহসী তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

—আরোগ্য, ১ সংখ্যক কবিতা

এই মহামন্ত্র উচ্চারণে তিনি বৈদিক ঋষিদের সমগোত্র। রোগমুক্ত মনের নির্জন অবকাশে পৃথিবীর ঋণ স্মরণ করে মন কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছে। মানুষ ও মাটি, আকাশ ও পৃথিবী, রূপ ও অরূপ সব যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে একটি অপূর্ব মাল্য রচনা করছে তাঁর মনে। মর্ত্য-মানবের প্রীতির স্পর্শ অমৃতের অর্ঘ বহন করে এনেছে। জীবনের শেষ যাত্রায় এই তাঁর পরম পুরস্কার—

সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

—আরোগ্য, ২ সংখ্যক কবিতা

অন্তিম লগ্নে কবি অনাসক্ত ভালবাসায় পৃথিবীকে আবদ্ধ করেছেন নিবিড়তর আলিঙ্গনে। জীবনযাত্রার প্রান্তে যা ছিল প্রত্যক্ষের অনতিগোচর, শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনির সুরে সেই সকল চিত্রের মিছিল এগিয়ে আসছে তাঁর জীবন-আঙিনায়। এই জীবন থেকে বিদায় নেবার চিন্তায় তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই চিন্তার প্রতিফলন আরোগ্য-এর ৪ সংখ্যক কবিতায়।

জীবনের ঐশ্বর্যের দিন বিগতপ্রায়, 'ফসলহীন শূন্য মাঠে' যেমন তুচ্ছ গুল্ম জন্মায়, কবির শূন্য-প্রায় মনে তেমনি বৃদ্ধ বয়সের অলস চিন্তার খেলা চলে। জীবনের সুখের দিন যে যৌবন, সেই যৌবন তাঁর গত হয়েছে। জীবন এখন রসহীন শুষ্ক, কিন্তু কবি অনুভব করেছেন জীবনে হয়ত সবই শেষ হয়ে যায় কিন্তু আজীবন যে শ্যামল মাটির স্নেহ-সান্নিধ্য লাভ করেছেন, সে বন্ধন ক্ষয় হবার নয়। তাই তিনি পরম আশ্বাস লাভ করেছেন এই চিন্তায়—

জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয়নি ফাঁকি ;
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি।

—আরোগ্য, ১৮ সংখ্যক কবিতা

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে কবি যে কাব্য রচনা করেছেন তার নাম জন্মদিনে। এই কাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনিকে স্পষ্টতর করেছে। কিন্তু জীবনাবসানের মুহূর্তটিকে কোন বিকৃতি স্পর্শ করতে পারে নি, তা ভরে উঠেছে জীবনের রস-সুধায়।—

জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

—জন্মদিনে, ২৬ সংখ্যক কবিতা

এই কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতাটি আত্মবিশ্লেষণের আলোকে এ জগতের প্রীতি ও আন্তরিকতায়, সততা এবং সরলতায় সমৃদ্ধ একটি সমীক্ষা। এই সমীক্ষায় কবি-মনটিও আমাদের কাছে একান্ত স্পষ্টরূপে ধরা দিচ্ছে। জীবন তাঁকে পরম প্রাপ্তির আশ্বাস এনে দিয়েছে ; তিনিও জীবনের ঋণ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেন—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—

জীবনের সুদূর পথ-পরিক্রমায় আজ তিনি অজানার দূতের আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন। মনে বাজছে বিদায়ের রাগিণী। কবির যাত্রা এবার অরূপ-লোকে যেখানে মহামৌনের গভীরে হারিয়ে যায় জগতের সকল সংশয়, তর্ক, খ্যাতি এবং সর্বোপরি অহং-চেতনা। কবি সৃষ্টিরহস্যের গভীরে ডুব দিয়ে আপন স্বরূপ অনুভব করেছেন। নিজেকে তিনি চিনতে পারছেন অসীম পথের পান্থরূপে। মর্ত্য-পরিক্রমায় এসে তিনি ক্ষণকালের রত্নরাজির দিকে তাকিয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে মর্ত্যপৃথিবীর দানের কথা স্বীকার করেছেন—

সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।

—জন্মদিনে, ১২ সংখ্যক কবিতা

এই কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতাই মরণের ছায়ায়, অনন্তের পটভূমিকায় জীবনবন্দনা। জীবন সম্বন্ধে এই অনুভূতির বলিষ্ঠ পরিচয় শেষ পর্যায়ের কবিতায় এক ভিন্নতর স্বাদ নিয়ে আসে।

সর্বশেষ কাব্য শেষলেখা-র কবিতাগুলিতে আমরা সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করি তা হল মন্ত্রবৎ সংহতি। জীবনের চরমতম উপলব্ধি-গুলিকে স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় আত্মার আলোয় করে তুলেছেন স্পষ্ট, সরল, সংহত ও কঠিন। এই অলংকারহীন ঋজু সত্যময় উপলব্ধির চরমতম মুহূর্তে কবিপ্রাণের মর্ত্যপ্রেম এক অপূর্ব সরল ভঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে। কবি স্পষ্টরূপে অনুভব করেছেন এ জগৎ মিথ্যা নয় এবং এমন কোন শক্তি নেই যা এই জগতের মাধুরী গ্রাস করতে পারে। এই সত্যটুকু তিনি অন্তরে একান্তরূপে বিশ্বাস করেন, তাই আজও নিসর্গ এবং মানব তাঁকে সমানভাবেই সুধারস বিতরণ করে।

এই জীবনকে তিনি অতি পবিত্র বলে মনে করেন। অজ্ঞেয় রহস্যলোক থেকে অলক্ষিত পথে প্রকাশিত এই জীবন। অন্তিম লগ্ন যখন ঘনিয়ে আসে তখন মহাকালের বাহুতে সবই হয় মসীলিপ্ত, কিন্তু এমনও কিছু বাকি রয়ে যায় যা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতিতে গিয়ে মেশে না—

> প্রত্যহের সব ভালোবাসা
> তারি আদি সোনার কাঠিতে
> উঠেছে জাগিয়া;
> প্রিয়ারে বেসেছি ভালো,
> বেসেছি ফুলের মঞ্জরিকে
> করেছে সে অন্তরতম
> পরশ করেছে যারে।

—শেষলেখা, ৭ সংখ্যক কবিতা

বিবাগী কবিচিত্তকে কোন বন্ধনই বেঁধে রাখতে পারে না। অসীম বৈরাগ্যে দিক্‌বিহীন পথে ছুটে চলে। আজীবনের সাধনার প্রতিও তিনি মোহশূন্য। তবু তিনি অনুভব করছেন যে এই মধুময় পৃথিবীর ধূলির গড়া মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ হবার নয়। মহামরণ-সঙ্গমে এ জীবন তখনই সার্থকতার তীর্থে পৌঁছবে যখন কবির ললাটে নেমে আসবে মর্ত্যপৃথিবীর আশীর্বাদ।

আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

—শেষলেখা, ১০ সংখ্যক কবিতা

দুই

মর্ত্ত্যজীবনের প্রতি প্রীতি ও আকাঙ্ক্ষা পক্ষান্তরে এই মানবজীবনের প্রতি আসক্তিরই দ্যোতক। এই মর্ত্ত্যজীবন ও মানবজীবন অনিবার্যভাবেই কবিকে আগ্রহী করে তুলেছে এই বসুন্ধরার শ্যামল মৃত্তিকার প্রতি। তাই শেষ পর্যায়ের কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল মৃত্তিকাসক্তি। মৃত্তিকাকে এখানে কোন রূপক অর্থে গ্রহণ করা হয় নি। মৃত্তিকা বলতে আমরা জননী বসুন্ধরার শ্যামলিম রূপকে বুঝি না। মৃত্তিকা তার স্বরূপেই অর্থাৎ ধূসর ধূলিময়তা নিয়েই কবির মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। তাঁর শেষ পর্বের অধিকাংশ কাব্যেই আমরা কবির মৃত্তিকার প্রতি আকর্ষণের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করি।

পূরবী-র 'মাটির ডাক' কবিতায় কবি জন্মদাত্রী মৃত্তিকা জননীর কোলে আবার ফিরে আসার ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন। কবি এতদিন 'নানা মতে নানান হাটে' পথে পথে হারানো মাকে খুঁজে ফিরছিলেন। এতদিন পরে আবার উপলব্ধি করলেন—

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন;

পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের 'সান্ত্বনা' কবিতায় বোবা মাটির সমগ্র বিশ্বের দুঃখ নিঃশব্দে বহনের সহিষ্ণুতায় কবি বিস্মিত হয়েছেন—

ওরে বোবা মাটি,
বক্ষ তোর যায় না তো ফাটি
বহিয়া বিশ্বের বোঝা দুঃখবেদনার
বক্ষে আপনার
বহু যুগ ধরে।

বিশ্বনিসর্গ সমগ্র বিশ্বের সংগ্রাম-কোলাহলের উপর স্তব্ধতার প্রলেপ দিয়ে মানুষের দুঃখকে সহনীয় করে। নিজে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হয়ে নীরবে মনুষ্য জীবনে সান্ত্বনার বাণী বহন করে আনে। কবি মৃত্তিকার এই রূপে শ্রদ্ধায় অবনত হচ্ছেন—

> বোবামাটি, বোবা তরুদল,
> ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল,
> স্তব্ধতায় মিলাইছ প্রতি মুহূর্তেই,—
> নির্বাক সান্ত্বনা সেই
> তোমাদের শান্তরূপে দেখিলাম,
> করিনু প্রণাম।

—পরিশেষ, 'সান্ত্বনা'

বিশ্ব-নিসর্গপ্রবাহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রবাহের যোগ বহুকালের ; এই শেষ পর্বে এসে নিসর্গ-প্রবাহ ও প্রাণ-প্রবাহের মিলন এক নূতন পথে অগ্রসর হয়েছে। আকণ্ঠ নিসর্গরস পানের সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্ত এক পরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে এসে পৌচেছে। শেষ সপ্তক-এর চার সংখ্যক কবিতাতে আয়ুর অপরাহ্ণবেলায় আত্মসম্ভোগ ও নিসর্গ-সম্ভোগের নিরিখে তাঁর মৃত্তিকাসক্তিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে—

> আপনাকে মিলিয়ে নেব
> শস্যশেষ প্রান্তরের
> সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যে অনেক স্থানে আমরা দেখব এই মৃত্তিকাসক্তির পথ ধরে 'শ্যামল' বা 'শ্যামলী' এই বিশেষণটি বার বার ফিরে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে কবির মৃত্তিকাচেতনা তাঁর অতীত প্রেম-স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এমনই একটি শেষ সপ্তক-এর ত্রিশ সংখ্যক কবিতাটি। এখানে কবির স্মৃতিতে ধরা দিয়েছে তাঁর প্রথম জীবনের প্রেমিকা, যে একান্তভাবেই বাংলাদেশের শ্যামলমাটির শ্যামলা মেয়ে—

> কঁচি শ্যামল তার রঙটি ;
> গলায় সরু সোনার হারগাছি,
> শরতের মেঘে লেগেছে
> ক্ষীণ রোদের রেখা।

শেষ সপ্তক-এর চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবির মৃত্তিকাসক্তির পরিচয় অপূর্ব সুন্দর ও কোমল মমতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি কবির জীবন-সায়াহ্নের মৃত্তিকাসক্তির প্রতীক।

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;

কবিতাটি কবির মাটির ঘর 'শ্যামলী'-কে উপলক্ষ করে লেখা। এই মৃৎকুটির নির্মাণ ও তাতে বসবাস করার সংকল্পের ভিতর কবির একটি সূক্ষ্ম গভীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ইচ্ছা তাঁর 'শেষবেলা'র মাটির ঘরের নাম দেবেন শ্যামলী, কারণ বাংলাদেশের মাটির রঙ স্নিগ্ধ শ্যামল। আর কবি যে বাংলাদেশের মেয়েকে ভালবেসেছেন, কারণ সেই মেয়ের চোখে আছে 'এই মাটির শ্যামল অঞ্জন, কচি ধানের চিকন আভা', এই মাটি কবিকে চিরদিন ডেকে ফিরেছে ভাঙনলাগা পদ্মার পাড়ে, সর্ষে-তিসির ক্ষেতে, আর পুকুরপাড়ে। শেষ জীবনে কবি আবার নূতন করে মাটির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন—

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষবেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে,
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

—শেষ সপ্তক, ৪৪ সংখ্যক কবিতা

'বীথিকা'য় কবি তাঁর মনন-কল্পনার দিক থেকে গভীর গম্ভীর এবং জীবন-জিজ্ঞাসায় উদ্বেলিত। ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবন এখানে একাকার হয়ে গেছে। এই কাব্যটিতে কবির দার্শনিক জিজ্ঞাসা সংহত হয়েছে। তবু এখানেও

কবির মৃত্তিকাসক্তি আমরা অনুভব করতে পারি। 'মাটি' কবিতাটি কবির মৃত্তিকাচেতনার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়। মাটির বুকে জীবনের কত ওঠা-পড়া। কিন্তু জীবননাট্যের অভিনয়-শেষে নশ্বর জীবনের হয়ত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মাটি সে তো চিরন্তন—

হায় আমি,
হায়রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া,—উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই রবে লীন
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তারপরে!—
এই ধূলি রবে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল-তরে।

'গরবিনী' কবিতায় কবি মর্ত্যধূলিরস্প র্শ বাঁচিয়ে-চলা জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছেন। যে জীবনে মাটির স্পর্শ নেই সেই জীবন বহুমূল্য যবনিকার অন্তরালে রাখা কৃপণের কক্ষের ছবির মত; কবি সেই জীবনকে অভিনন্দিত করেছেন যে জীবনে ধরাতলের নির্বিচার স্পর্শ রয়েছে। তাই তিনি স্বীয় জীবন সম্বন্ধে বলছেন—

আমি সাধারণ।
তরুর মতন আমি, নদীর মতন।
মাটির বুকের কাছে থাকি;
আলোরে ললাটে লই ডাকি,
যে-আলোক উচ্চনীচ ইতরের,
বাহিরের ভিতরের।

পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কিছুটা অন্য ধরনের। এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"এই কবিতাগুলি যেন বিরাট গম্ভীর চিন্তারণ্যের মহাটবীগুলির প্রসারিত শাখা-প্রশাখার মর্মরধ্বনি, মানবমনের গভীর দ্বন্দ্ব-সমস্যার গম্ভীর কলকল্লোল।"[১] রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের প্রায় প্রতিটি কাব্যেই এইরূপ মনন কল্পনার সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তবু পত্রপুট-এর 'পৃথিবী' (৩ সংখ্যক) কবিতাটি একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে। এই কবিতায় কবির মৃত্তিকাসক্তি একটি বিশেষ ভঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে। "মৃত্যুর অনিবার্যতায় শিউরে উঠে নির্মম উদাসীন পৃথিবীর কাছে মৃৎকাতরতার এই

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬৯), পৃ. ২১১

প্রণতি রেখে যাওয়া শেষ পর্বের কবিতায় কদাচ চোখে পড়ে।”[১] পৃথিবীর বিচিত্র লীলার কথা কবি অভিনব কাব্যাঙ্গিকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। ধরিত্রীর দুই বিপরীত স্বভাব ‘ললিত’ ও ‘কঠোর’ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সৃষ্টি এবং ধ্বংস দুয়ের প্রতিই পৃথিবী সমান উদাসীন। সর্বপরিচয়-গ্রাসী পৃথিবীর ধূলার মধ্যে তাঁর জীবনের শেষ পরিণাম কয়েক মুষ্টি ধূলিকে মিশিয়ে দিতে চান। আজ অন্তিম যাত্রার প্রাক্কালে তিনি মোহগ্রস্ত নন—শুধু এই ‘জীবপালিনী’ ধরিত্রীর স্বীকৃতিটুকুর প্রত্যাশী—

তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।
হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

শ্যামলী কাব্যগ্রন্থখানি কবির শেষ বেলাকার ঘর (শেষ সপ্তক ৪৫) এরই স্মারকলিপি। এই কাব্যের নামকরণের মাধ্যমে আমরা সূক্ষ্মতর শ্যামলিম চেতনারই রূপ প্রত্যক্ষ করি। শ্যামলী শুধুমাত্র বাংলাদেশের শ্যামল মাটি বা কবি-কল্পিত মৃৎকুটিরকেই বোঝায় নি। কবির কাব্যে শ্যামলী মূর্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের শ্যামলা মেয়ের কল্পনায়, তাই এখানে মৃত্তিকা-চেতনার সঙ্গে কবির প্রেমস্মৃতি একাসনে বসেছে। শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের ‘উৎসর্গ’ কবিতায় কবি বলেছেন—

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন,
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব-প্রণতি-ভরা
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

মাটির ঘর ‘শ্যামলীর’ উপর আর একটি কবিতা আছে—শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা—নাম ‘শ্যামলী’। এই কবিতাটিতে সৌন্দর্য ও কোমলতা একই

১. ড. অরুণকুমার বসু, রবীন্দ্র-বিচিন্তা (১৩৭৫), পৃ. ২২১

সঙ্গে মিশেছে। এখানে জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার সঙ্গে শ্যামল মাটি তথা শ্যামলা মেয়ের প্রতি প্রেম প্রতি ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে। জীবনের যাওয়া-আসাকে কবি সহজ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন। কবির মাটির বাসার মত জীবনেরও কোন স্থায়িত্ব নেই—

বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে—
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়।

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে
এক শাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।

সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় ঘনায়মান জীবনসন্ধ্যার ইঙ্গিত। জীবন-সায়াহ্নে বিগত দিনের হিসাব করার স্পৃহা ও মৃত্যুর পদধ্বনি উপলব্ধি সেঁজুতি-র প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই দেখা যায়। প্রথম কবিতা 'জন্মদিনে'র মধ্যে দেখি আত্মসমীক্ষণরত কবিকে যিনি উৎসব মুহূর্তে অন্তিম যাত্রার ইঙ্গিত পাচ্ছেন এবং জীবনের ঋণ একে একে স্বীকার করছেন এবং মাটির কাছে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করছেন। তাঁর একান্ত প্রার্থনা আসক্তি যেন তাঁর মহাজীবনের প্রবেশ পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি পৃথিবীর দানকে অস্বীকার করতে পারছেন না, কারণ পৃথিবীর ধূলিতেই অসীমের আস্বাদ পেয়েছেন—

আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান।

এই কাব্যগ্রন্থে 'জন্মদিন'-এর উপর আর একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটির চালটা একটু হাল্‌কা। কিন্তু এ কবিতা মধুরতা ও স্মৃতিরাগে রঞ্জিত। বিশ্ব-নিসর্গের উপলব্ধির সঙ্গে সমস্ত খ্যাতি-কীর্তির বোঝা নামিয়ে মাটির ঋণ-স্বীকার কবিতাটিতে—

সেই-যে ভালো-লাগাটি তার থাক সে রেখে গিছে,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে,
না যদি রয় নাই রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।

জীবনের অন্তিম কাব্য-পরিমণ্ডলের আরোগ্য কাব্যেও সেই আক্ষরিক অর্থে মৃত্তিকাসক্তির প্রকাশ আরও গভীর ও আরও ব্যঞ্জনাবাহী। কবি অনুভব করছেন জীবনের যা কিছু অপূর্ণতা, যা কিছু মিথ্যা সমস্তই নতি স্বীকার করে পৃথিবীর স্নেহের কাছে। পৃথিবীর ধূলিতেই তিনি অনন্ত সত্যকে অনুভব করেছেন—

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দ রূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

তিন

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যে কবির আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বার বারই আসে আত্মসমীক্ষা। জন্মদিনগুলি নব নব চেতনার দ্বার উন্মোচন করে। জন্মদিনগুলি কবির বিগত দিনের স্মৃতিকে জাগরিত করে কবিকে স্বীয় কবিধর্মের পর্যালোচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এই স্মৃতিচারণায় বিশ্ববীক্ষা ও আত্মসমীক্ষা অঙ্গীভূত। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে নানাভাবে কবির জীবনাদর্শ রূপায়িত হয়েছে। শেষ পর্বে কবির জন্মদিনের অবকাশে নূতন করে আত্মপ্রকাশ।

পরিশেষ-এর 'জন্মদিন' কবিতায় কবি এই আত্মস্বরূপের উদ্‌ঘাটন করেছেন। ইতিমধ্যে কবির সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত। তাঁর স্বদেশবাসী মহা-সমারোহে তাঁর সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব পালনের বিরাট আয়োজনে তৎপর। সেই কথাই স্মরণ করে এই আত্মবিশ্লেষণী তত্ত্বমূলক কবিতাটি রচিত হয়। "পরিশেষ আত্মবিশ্লেষণের আত্মপরিচয়ের কাব্য"[১]— সমালোচকের এই অভিমত একান্ত সত্য। কারণ কাব্যটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলেছে আত্মসমীক্ষা, বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা তিনি পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি কবিতাতে সন্নিবেশিত করেছেন। পৃথিবীর ভালবাসায় আবার নূতন করে

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬২), পৃ. ১৮৬

উজ্জীবিত হয়ে কবি দেহে-মনে নব প্রেরণা অনুভব করেছেন। জীবনের পথ-যাত্রায় তিনি রুদ্রের আরাধনা করেছেন ; আজ বিদায়-লগ্নে প্রসন্ন মনে পৃথিবী-র সহজ অকৃপণ আনন্দকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল—

এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা'।

—'জন্মদিন'

পরিশেষ-এর 'পান্থ' কবিতাটিও কবির জন্মদিনের পূর্বাহ্নে রচিত। এখানেও কবি বিশ্বপ্রবাহে মিশে যেতে চান। কারণ কবি তাঁর জীবনের চরিতার্থতা লাভ করেছেন পৃথিবীর স্নেহে। জন্মদিনের অবকাশে কবির আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে এই ধরণীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের স্বরূপ। তিনি এই পৃথিবীর অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন। "এখানে তাঁর পৃথ্বীপ্রীতি ও মুক্তিচেতনা একই দেহে লীন হয়ে গেছে।"[১]

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।

আর একটি জন্মদিন-সংক্রান্ত কবিতা হল 'অপূর্ণ'। এই কবিতাটি জন্মদিনে লেখা নয়। এটি নভেম্বর মাসে রচিত, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে তাঁর স্বদেশবাসীর কবির সপ্ততিতম জন্মদিন পালনের উৎসব-আয়োজন প্রত্যক্ষ করে কবি এই কবিতা রচনা করেন।[২] এখানে কবি তাঁর অন্তর্নিহিত সত্তাটিকে তুলে ধরেছেন যা সত্য, মিথ্যা, আশা, অভিলাষ, সংশয়, তর্কে কণ্টকিত। কত সার্থক সাধনা, কত ব্যর্থ

১. ড. অরুণকুমার বসু, রবীন্দ্র-বিচিন্তা (১৩৭৫), পৃ. ২৯৫
২. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, ৩য় খণ্ড (১৩৬৮), পৃ. ৪১৫

আত্মবিড়ম্বনা সবই বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি নিয়ে কবির সমক্ষে উপস্থিত। কবির জিজ্ঞাসা, জন্ম ও মৃত্যু দিনের মধ্যে যে কয়টি দিন সৃষ্টির আনন্দে ভরে ওঠে, সত্তা যখন নিখিলের কাছে নিজ পরিচয় জ্ঞাপনে আগ্রহী হয়, সেই সবই কি লয়প্রাপ্ত হয় জীবন-অবসানে? কবির বিশ্বাস, জীবনের এই মুক্তির আনন্দ মিথ্যা হতে পারে না। এই কবিতাটিতে জন্মলগ্নের উপস্থিতি অনিবার্য-ভাবে কবিকে মৃত্যু-মুহূর্তের কথা স্মরণ করায়। কবিতাটি আত্মসমীক্ষামূলক। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষ-এর 'বর্ষশেষ' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। বৎসরের বিদায়ের ক্ষণে কবিতাটি রচিত হলেও আসলে এটি কবির জীবনপ্রান্তের উপলব্ধি। কবি অনুভব করছেন—'আয়ুর পশ্চিমপথশেষে / ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।' তাই বিশ্বদেবতার সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া চুকিয়ে নেবার প্রয়াস। কবিতাটি তাঁর মর্ত্যপ্রীতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। জীবনে বারংবার বেদনার পাত্র তাঁর কাছে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছে। এই জীবনেই তাঁর ভূমার উপলব্ধি ঘটেছে বারংবার। এই কবিতায় আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় কবি পূর্ণের আশীর্বাদ অনুভব করেছেন—

এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে।

পরিশেষ-এর 'দিনাবসান' কবিতাটি কবির পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মদিবস উপলক্ষে রচিত। এখানেও জন্মদিনের উৎসবমুহূর্তে কবির মনে পড়েছে যখন তিনি মর্ত্যকায়া পরিত্যাগ করবেন তখনও হয়ত তাঁকে স্মরণ করে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। তিনি অনুরোধ করছেন যেন সভাগৃহে সমবেত হয়ে আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর স্মরণ-উৎসব উদ্‌যাপিত না হয়। তাঁকে স্মরণ করবার উপযুক্ত স্থান হল প্রকৃতির প্রাঙ্গণ। এই কবিতাটিতে আমরা কবির বিশ্বনিসর্গের সঙ্গে একাত্মতার ইঙ্গিত পাই। ভাব এবং বক্তব্যের দিক থেকে এই প্রসঙ্গে সেঁজুতি-র 'স্মরণ' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। এখানেও কবির আবেদন তাঁর স্মরণ-সভা যেন সভাগৃহে অনুষ্ঠিত না হয়ে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

শেষ সপ্তক-এর অনেকগুলি কবিতায়ও আমরা এই আত্মবিশ্লেষণ দেখি। এই কাব্যগ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতায় জীবনের প্রান্তে এসে স্মৃতির তুলি দিয়ে বিগত জীবনের চিত্রাঙ্কণ। জীবনের চলার পথে তিনি সুখ-দুঃখের মূল্যে পাথেয় সঞ্চয় করেছেন, পথের শেষে এসে সে সঞ্চয় সমস্তই মূল্যহীন বোধ হচ্ছে। জীবনকে তিনি ভালবেসেছিলেন সে তো মিথ্যা নয়। তাই অতীত প্রেমের

স্মৃতিও তাঁর মনে চকিত চমক সৃষ্টি করছে। তিনি কামনা করছেন তাঁর যাত্রা যেন আসক্তিহীন হয়—

পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।

জীবনের অল্প কয়েক দিনের আনন্দ তাঁকে বিশ্বব্যাপী নামহীন নিরহংকার মুক্তি এনে দেবে। এই আত্ম-বিশ্লেষণে স্ব-রূপের দুটি দিক তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। তাঁর একটি সত্তা পৃথিবীর সুখ-দুঃখ কামনা-বাসনার অধীন, অন্য সত্তাটি জড় দেহ-মন থেকে পৃথক লোকাতীত পরিবর্তনশীল ও নিরাসক্ত। ২২ সংখ্যক কবিতায় তাঁর এই উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

৪৩ সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর জন্মদিনে নিজের জীবনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এটি তাঁর শেষ জীবনের জন্মদিন-সংক্রান্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতাটি গদ্যছন্দে অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লিখিত। তাঁর বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা' গেঁথেছেন কবি। প্রেম-স্মৃতির অধ্যায়ের শেষে কবি তাঁর কাব্য-জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন ;—যে জীবন বিদ্বেষ, অনুরাগ, ঈর্ষা, মৈত্রী, সঙ্গীত ও পরুষ কোলাহলের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে। তিনি অনুভব করেছেন তাঁর প্রকাশে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। জন্মদিনের পুণ্য লগ্নে যে অনুরাগীরা তাঁর ব্যর্থতা ও চরিতার্থতার সংমিশ্রণে সৃষ্ট মূর্তিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন। নামহীন নির্জন নিভৃতে সকল পরিচয়ের অন্তরালে এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায় বিলীন হওয়ার অন্তিম বিষণ্ণ মিনতিতে কবিতাটি শেষ হয়েছে।

বীথিকা কাব্যে কবি আপন জন্মদিবস-উৎসব স্মরণ করে তাঁর কাব্য-জীবনের উপলব্ধির কথা পুনর্বার ব্যক্ত করেছেন 'নবপরিচয়' কবিতায়—

আনন্দিত মন আজি
কী সংগীতে উঠে বাজি
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ, সব ক্ষতি,
তুচ্ছ আজি হল অতি
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

সেঁজুতি কাব্যেও জন্মদিন-বিষয়ক কয়েকটি কবিতা আছে। এই সময় কবি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এক নূতন জীবন লাভ করেছেন, সেই মহাশূন্যের অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে পূর্ববর্তী প্রান্তিক কাব্যের প্রতিটি ছত্রে। কবির দৃষ্টি আজ সুদূরে প্রসারিত।

সেঁজুতির প্রথম কবিতা 'জন্মদিন' (১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখ কালিম্‌পঙে লেখা), এই পর্যায়ের একটি অন্যতম কবিতা, সপ্ত সপ্ততিতম জন্মদিবসের আত্মবিশ্লেষণ এই কবিতায়। জীবনমৃত্যুর সীমায় পৌছে কবি মহাজীবনের রহস্য সন্ধান করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন এই চিরচঞ্চল ধ্বংসশীল জগৎ থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন। তবু তিনি এই পৃথিবীর সঙ্গে গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু তাঁর এই বন্ধন নিরাসক্ত ও নির্মোহ। অনুভূতির গভীরতায়, সুস্পষ্ট জীবন ব্যাখ্যায়, অর্থঘন সংকেতে, সুচিন্তিত ও সুনির্বাচিত ছন্দ ও ধ্বনির মাধুর্যে কবিতাটি অনন্য। পৃথিবীর মায়া ও জীবনের আকর্ষণ মানুষের পথিকবেশী অন্তরাত্মাকে আবদ্ধ করতে পারে না, জীবনের আসক্তির ডালি ও অপবিত্র সঞ্চয় সে মৃৎপাত্রের মতো দূরে ফেলে দিয়ে যায়। তবুও তিনি মৃত্তিকার ঋণকে অস্বীকার করেন না; কারণ এই অনিত্যই তাঁকে নিত্যের সন্ধান দিয়েছে—

> সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
> ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
> সব ক্ষয়ক্ষতি-শেষে অবশিষ্ট রবে।

—সেঁজুতি, 'জন্মদিন'

প্রত্যক্ষতঃ জন্মদিন উপলক্ষে লেখা না হলেও সেঁজুতির আরও কয়েকটি কবিতায় অনুরূপ জন্মদিন-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলি কবির অন্তর্জীবনের চিত্রে সমৃদ্ধ।

'পত্রোত্তর' কবিতায় কবি অনন্তের বহিরঙ্গন দ্বারে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছেন তাঁর সাধনায় পরমের সুরে চরমের গীতিকলা ব্যক্ত হয় নি। তবু কখনও কখনও বসুন্ধরা মাটির বুকেই সুন্দরের চকিত আভাস দিয়েছেন। এই 'মর্ত্যের বুকে' 'আলোকধামের আভাস' 'অমৃত পাত্রে' ঢাকা আছে। তারি আহ্বানে কবির গানে জাগে বিস্মিত সুর। সে সুর বাধা-বন্ধন এড়িয়ে পরপারের আনন্দ বহন করে আনে। সংসারের নানা দুঃখদৈন্য, বিশৃঙ্খলা ও

পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝার মধ্যেও তিনি অনাদি 'শান্ত শিবের বাণী' শুনেছেন। সৃষ্টির আনন্দলীলায় অংশ গ্রহণ করে তিনি মৃত্যুর মধ্যে মুক্তির সন্ধান পাবেন—

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন-ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে ;

'যাবার মুখে' কবিতায় এই জীবনের যা-কিছু পুঞ্জিত আবর্জনা, বিফল স্বপ্ন, প্রবঞ্চনা ও নিষ্ফলতার সঞ্চয় দূর হয়ে যাক্ এই-ই কবির কামনা। তবু এই জীবনেই তিনি অসীমের ইশারা পেয়েছেন এবং অমরাবতীর নৃত্যনূপুরের ঝংকার শুনেছেন। এই পৃথিবীর সঙ্গে চিরন্তন সংযোগের কথাও উপলব্ধি করেছেন —

সকালবেলার প্রথম আলোয় বিকালবেলার ছায়ায়
দেহ প্রাণ মন ভরেছে সে কোন্ অনাদি কালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূরজনমের আদিপরিচয় এই ধরণীর সাথে।
অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীমকালের বুকে
নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।

'অমর্ত্য' কবিতায় কবি এই মর্ত্য-পৃথিবীর প্রতি আসক্তির এক অনবদ্য নিদর্শন দিয়েছেন, কোন মোক্ষধাম বা বৈকুণ্ঠধাম তাঁর কাম্য নয়। তিনি মাটির উপর বাসা বেঁধেছেন অস্থায়ীভাবে। নৃত্যপাগল নটরাজের তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। বস্তু-দেহের অতীত এক আনন্দময় সত্তাকে অনুভব করেছেন, যা সৌন্দর্যের আধার এবং সুদূরের ইঙ্গিতবাহী, এই সৌন্দর্যময় সত্তা মৃত্যুর পরেও কবির সঙ্গী হবে—

পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।

'পলায়নী' কবিতায় কবি সমগ্র সৃষ্টির চির ধাবমান রূপের উল্লেখ করেছেন। এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে অনায়াসে ভেসে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। চলতে চলতেই গ্রহণ করতে হবে, আবার

প্রয়োজনে ত্যাগ করা চাই। কারণ এই চলিষ্ণু সৃষ্টিতে নিরন্তর গ্রহণ-বর্জনের লীলা চলছে—

ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে
তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে,
যে সুর বাজিল মিলাতে মিলাতে
তাই কান দিয়ে শোনো।
এর বেশি যদি আরো কিছু চাও
দুঃখই তাহে মেলে।
যেটুকু পেয়েছ তাই যদি পাও
তাই নাও, দাও ফেলে।

'স্মরণ' কবিতায় কবি অনুরোধ করেছেন মৃত্যুর পর যাঁরা তাঁকে স্মরণ করবেন তাঁরা যেন উৎসবের সমারোহের মধ্যে কবির জীবনাদর্শকে বিকৃত না করেন। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে যেন কবির স্মৃতি আলোচনা করা হয়।

এই কাব্যে 'জন্মদিন' ('দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজার খানা চোখ'...) নামে আর একটি কবিতা আছে। এটি ১৩৩৪ সালের ২২শে বৈশাখ আলমোড়ায় লেখা। বিগত জীবনের স্মৃতি রূপায়িত হয়েছে কবিতাটিতে। কীর্তিখ্যাতির বরমাল্য আজ আর কবির কাম্য নয়। বিশ্ব নিসর্গের বাণী কিভাবে তাঁকে আকর্ষণ করেছে সেই কথা প্রকাশ করে, মাটির কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। ব্যক্তিগত নাম-যশ নয় শুধুমাত্র এই জন্মের ভালো লাগাটি বেঁচে থাক্, এই প্রার্থনা জানিয়ে তিনি মাটির উদ্দেশে বিস্মিত প্রণাম নিবেদন করেছেন।

'পরিচয়' কবিতায় কবি নূতন কালের উৎসুক পথিকদের দিকে চেয়ে নিজেকে দূরের যাত্রী, নিঃসম্পর্ক কবি বলে ভাবতে পারেন নি, শেষ প্রহরে ঘোষণা করেছেন—

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

জন্মদিন সম্পর্কে আর একটি কবিতা আছে নবজাতক-এ 'উদ্বোধন' নামে। কবিতাটি ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ সালে কালিম্পঙ-এ রচিত অর্থাৎ সেঁজুতির প্রথম কবিতা এবং এটি একই দিনে রচনা করা হয়। সেঁজুতির 'জন্মদিন'

নামক মহৎ কবিতায় কবি বিশ্ব-ইতিহাসের চিরন্তন বাণীকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'উদ্বোধন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মনন অন্যরূপ ধারণ করেছে। কবির রচনা প্রাণের আদিলীলা ও সৃষ্টির আদিম আনন্দের সঙ্গে জড়িত। সৃষ্টির আদিযুগে প্রকৃতি রাজ্যে ছিল শান্তি, আজ মানুষ সেই শান্তি-স্বর্গ থেকে নির্বাসিত। এখন কবিকে এখানে আহ্বান জানান হয়েছে যিনি বহু জনতার মাঝে একা। যিনি অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দের বাণী বহন করে আনবেন এবং যাঁর জীবনে নিখিল বিশ্বের আহ্বান সার্থক হয়ে উঠবে।

নবজাতক-এ জন্মদিন উপলক্ষে লেখা কবিতা আছে আরও দুটি—'প্রবাসী' (৯ই বৈশাখ ১৩৩৬) এবং 'জন্মদিন' (২৫শে বৈশাখ ১৩৪৬), দুটি কবিতারই রচনাস্থান পুরী।

১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে লাহোরে রবীন্দ্রানুরাগীদের উদ্যোগে কবির জন্মোৎসব পালনের আয়োজন হয়। উদ্যোক্তারা অমিয় চক্রবর্তীর মাধ্যমে কবির কাছে একটি নূতন কবিতার জন্য অনুরোধ জানালে কবি এই প্রবাসী কবিতাটি লিখে পাঠান। এটি ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়। কবিতাটি আত্মসমীক্ষামূলক না হলেও এতে নিজ কবিধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। এই সময়ে পাঞ্জাবে রাজনৈতিক জীবনে একটা দুর্যোগ চলছিল। হিন্দু-মুসলমান ও শিখদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার-ভোগ নিয়ে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। এতে কবি বেদনাহত হয়েছিলেন এবং 'প্রবাসী' কবিতাটিতে সেই বেদনার স্পর্শ আছে, প্রবাসীদের সম্বোধন করে কবি বলেছেন যে তিনি কবি, তিনি সেই বাণীর প্রত্যাশী—যা অন্তরের অন্তরতম ভালবাসার সুরকে বহন করে আনে। বিষয়ী সংসারী যারা, যারা আত্মহারা, যারা প্রীতি-ভালবাসার জগৎ থেকে নির্বাসিত, কবি তাদের উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণের কাছে চিরসুন্দর ও চির-মঙ্গলের বাণী পাঠাচ্ছেন। তিনি প্রার্থনা জানাচ্ছেন জড় অভ্যাসের ধূলি থেকে তাঁদের চিত্ত যেন মুক্তি পায়।

'জন্মদিন' কবিতায় কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পর্যালোচনা করেছেন। জন্মদিনের যশ-খ্যাতি স্তাবকতার দ্বারা আচ্ছন্ন কবি আপনার এই পরিচয়কে সত্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। বহির্জগতে কবির যে প্রকাশ তা তাঁর কবিসত্তার যথার্থ প্রকাশ নয়। তাঁর পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর যে বহির্জীবনকে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উজ্জ্বল করে তোলেন, তা যেন তাঁর অন্তরতম সত্তা থেকে বহুদূর। রূপকার যেন অন্তরালে তাঁকে বিচিত্র রূপে গঠন করে চলেছেন—

কাল সমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে, কেহ দেখে আর।

'জন্মদিন' কবির জীবিতকালে প্রকাশিত সবশেষ কবিতা গ্রন্থ। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব-দিবসে ১৩৪৮ সালের (১৯৪১) ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের সব কবিতাগুলি কবির জন্মদিবসে রচিত নয়, যদিও বসন্তোৎসবের সময় লিখিত তবু এগুলি যথাযথ জন্মদিনের কবিতা, জন্মদিন চেতনার সঙ্গে যুক্ত। এই সময় বারে বারেই দেখা গিয়েছে জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কবির আত্মসমীক্ষা। এই জন্মদিন-চেতনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "নিজ জন্মদিবসের কথা কেন আজ স্মরণে আসিতেছে বলিতে পারি না, হয়তো মনে মনে আশঙ্কা ছিল জন্মদিন ফিরিয়া নাও আসিতে পারে।" তাই প্রত্যেকটি কবিতাই মৃত্যু-চেতনার প্রসন্ন গাম্ভীর্যে মহান হয়ে উঠেছে।

জন্মদিন-সংক্রান্ত কবিতাগুলিকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে ১, ২, ৩, ৪, ২৬, ২৮ সংখ্যক কবিতাগুলি, এগুলির রচনাকাল—২০, ২১, ২২ এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১; রচনাস্থান 'উদয়ন'। রচনাকালের দিক থেকে এগুলি জন্মদিবসের রচনা নয়, তবু কবিতাগুলির মূল ভাব জন্মদিন-কেন্দ্রিক। সমগ্র জন্মদিনে কাব্যটির উপর আছে মহাদূরত্ব বা মৃত্যুর অনুভব। তাই জন্মদিনের উৎসব-মুহূর্তেও কবি আপন অন্তরতম সত্তাকে দূরের পথিক বলে বর্ণনা করেছেন—

আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা জ্যোতির্বাষ্প মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।

আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাঁহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।

—জন্মদিনে, ১ সংখ্যক কবিতা

২ সংখ্যক কবিতায় জন্মদিনের অনুভূতিকে ঘিরে আত্ম-রহস্যানুভূতির গভীর ব্যঞ্জনা। সৃষ্টির আদি থেকে কবি জীবনে বহু জন্মদিনকে ধারণ করে আছেন, নিজের মধ্যে বিচিত্র রূপের সমাবেশ দেখেছেন—

চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম
এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন আবরণ
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব,
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে॥

৩ সংখ্যক কবিতায় জন্মবাসরের অভিনন্দনে বার বারই কবির চিত্ত ভরে উঠেছে। বিদেশের অচেনা পরিবেশে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়েছে। মানবাত্মার নিত্যতার উপলব্ধি ঘটেছে। দেশ-কালের-ছদ্মবেশ খসে গেলে মানুষ এক এবং অখণ্ড বলেই প্রতিভাত হয়—

জন্মবাসরের ঘটে—
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থ বারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।

অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' বলে।
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন্ পরের ছদ্মবেশ;
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ;
অভাবিত পরিচয়ে।

৪ সংখ্যক কবিতাটি করুণ। ১৯৪১ সালের বসন্ত-উৎসব সমাগত, শারীরিক অসুস্থতার জন্য কবি এই উৎসবে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে অক্ষম। তাই বসন্তের আহ্বানকে স্বীকার না করতে পারার অক্ষমতাজনিত বেদনা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতাটিতে—

আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
এ বৎসর বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহ স্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।

পূর্বে কখনও জন্মদিন ও বসন্তের আমন্ত্রণ তাঁর কাছ থেকে ফিরে যায় নি। আসন্ন বিরহ-ব্যথা তাঁর মনে জেগে উঠছে, তবে কবির সেই ব্যথা-অনুভবে কাতরতা নেই, আছে মহান গাম্ভীর্য।

কবি সুন্দরের উপাসক, মৃত্যুতে তিনি সেই সৌন্দর্যকেই অনুভব করতে চেয়েছেন। ২৬ সংখ্যক কবিতায় কবি অপূর্ব সুন্দরভাবে নিজের জীবনের অবসানের কল্পনা করেছেন। মৃত্যুর বিকৃতি যেন মৃত্যু-মুহূর্তকে স্পর্শ না করে, জীবনের শেষ মুহূর্ত যেন অসুন্দরের আঘাতে আহত না হয়—

জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

২৮ সংখ্যক কবিতায় কবি নানা অভিজ্ঞতা-পুষ্ট নিজ জীবনের পর্যালোচনা করেছেন। বারে বারেই তিনি অজানার অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। জন্মদিনের উৎসবের আনন্দ বারংবার পূর্ণ করেছে তাঁর জীবনের ডালি—

অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি।

এই সময় জীবন-অবসানের লগ্নটি নিকটে অনুভব করে কবি পূর্বতন জন্মদিনের

উৎসবগুলির স্মৃতিকে স্মরণ করে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। উপরোক্ত কবিতাগুলি তারই পরিচয়বাহী।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিতে প্রত্যক্ষ জন্মদিবসের উৎসবের কথা। ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ১১ সংখ্যক কবিতা এই পর্যায়ে পড়ে। এগুলির রচনাকাল ১৩৪৭ সালের বৈশাখ; রচনাস্থান মংপু।

৫নং কবিতাটিতে মৃত্যুর মহা-আবির্ভাবের প্রতীক্ষা। মনন, আবেগ, কল্পনা, বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ে এবং বক্তব্যের মহিমায় কবিতাটি অসাধারণ। এটি বিশ্ববীক্ষার একটি চরম নিদর্শন। সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি আপন সত্তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেছেন। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর বর্তমান জীবন-লাভ এবং এই জীবনও আবার অজানা রহস্যময় লোকের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই কবিতাটিতে বহুদিন পূর্বে রচিত সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতার সুর শোনা যায়।—

> সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন,
> আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
> ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
> কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য প্রদক্ষিণ—
> সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশিবর্ষ আগে,
> চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

মংপুতে থাকাকালীন বুদ্ধের নেপালী ভক্তবৃন্দ কবিকে তাঁর জন্মদিনে প্রণাম করতে আসেন। তাঁরা কবির কল্যাণে বুদ্ধের কল্যাণমন্ত্র উচ্চারণ করেন। ৬ সংখ্যক কবিতায় এই ঘটনাটির কথা বলেছেন। কবিতাটি শেষ হয়েছে মহামানবের বন্দনায়—

> তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
> প্রবেশি মানবলোকে আশিবর্ষ আগে
> এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

৭ সংখ্যক কবিতাতে তিনি পাহাড়িয়া জাতিদের কাছ থেকে জন্মদিনের অভিনন্দন লাভকে দুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন।

৮ সংখ্যক কবিতাতে কবি সম্ভবতঃ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদের

উল্লেখ করেছেন।[১] জন্মদিনের উৎসব-মুহূর্তে মৃত্যুর আবির্ভাব কবির মনে এক বিচিত্র মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। সায়াহ্নবেলার অস্তসূর্য যেমন আসন্ন রাত্রির আগমনকে উজ্জ্বল করে তেমনি কবির জীবন-সায়াহ্নে মৃত্যুর আবির্ভাব তাঁর জীবনকে নূতন অর্থ দেয়। জীবন-মৃত্যুর মোহানায় তিনি জন্ম মৃত্যুকে একই সত্যের আধারে উপলব্ধি করেছেন—

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন যাহে জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে ;
সে মহিমা উদ্‌বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

১১ সংখ্যক কবিতায় তিনি সত্তার আবির্ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কালের প্রবল আবর্তের মধ্যে কিরূপে এবং কোথা থেকে কবি-সত্তা রূপ পরিগ্রহ করেছে—সে এক অনন্ত বিস্ময়। নববিকাশ এবং বিনাশের মধ্যে অনন্ত বার বার আত্মপ্রকাশ করে। জন্মের মধ্য দিয়েই তার অন্তসীমায় আবির্ভাব।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি কবির গত জন্মোৎসবে লিখিত। জীবন-গোধূলিতে কবি তাঁর জন্মদিবসের উৎসবকে শুধুমাত্র একজন বিখ্যাত লোকের জন্মদিন বলে মনে করেন নি। নিজ জীবনে প্রকৃতি এবং নিত্য-মানবের বাণীর অনুরণন উপলব্ধি করেছেন। শেষ মুহূর্তের আত্ম-সমীক্ষণে কবি-দৃষ্টিতে নূতন-ভাবে ধরা পড়েছে তাঁর মর্ত্যপ্রীতি, জীবনপ্রীতি, মানবতা এবং দার্শনিকতা। বিগত জীবনের স্মৃতির ছায়ায় তিনি ভবিষ্যৎ জীবনকে আহ্বান করেছেন। উপলব্ধির গভীরতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁর এই জন্মদিন-চেতনাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করেছে।

চার

শেষ পর্যায়ের কবিতায় আধুনিক ও ভাবী কাল সম্পর্কে সচেতনতা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে দেশের সমাজ মানসে যে পরিবর্তন এসেছিল, অনিবার্যভাবে সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা যেতে লাগল, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে নবযুগ ও নবভাবধারার আগমন ঘোষিত হল। এই পত্রিকাগুলি হচ্ছে—কল্লোল (১৯২৩), সংহতি (১৯২৩), উত্তরা (১৯২৫), প্রগতি (১৯২৬),

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ৪র্থ খণ্ড (১৩৭১), পৃ ২৩৪

কালিকলম (১৯২৬), লেখা (১৯২৭) ইত্যাদি। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে বাংলাদেশে তরুণদল তাঁদের মতামত প্রকাশ করলেন এবং বিদ্রোহের ধ্বজা ওড়ালেন। এঁরা পুরাতনের দাবিকে সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য করলেন। পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার তপ্ত হাওয়া তীব্রভাবে সাহিত্যকে স্পর্শ করল। বাস্তবতার নামে সাহিত্যে দারিদ্র্য ও যৌনক্ষুধার নগ্নমূর্তি প্রকাশিত হতে লাগল।

সাহিত্যের এই নূতন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন দলভুক্ত করা হল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নবীনদের পুঞ্জীভূত অভিযোগ এই সাহিত্যান্দোলনকে বহুলাংশে পুষ্ট করেছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী-চরিত্র অতি-মাত্রায় শুচি এবং যেহেতু তিনি দরিদ্র-বংশোদ্ভূত নন, তাঁর দারিদ্র্য সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মুখ্য অভিযোগ ছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যে দারিদ্র্য ও পঙ্কিলতা যথাযথভাবে সম্মান পায় নি বলে তরুণ সাহিত্যিকগণ এই দুটি দিক দিয়ে সাহিত্যে নবত্ব আনতে প্রয়াসী হলেন। রবীন্দ্রনাথও অনিবার্য-ভাবে এই সাহিত্য-আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়লেন। একটি প্রবন্ধে তিনি দেশের তৎকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন—"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ"।[১]

শেষ পর্যায়ের কবিতাতেও এই নবযুগ ও নব-সাহিত্যাদর্শকে কবি বিশ্লেষণ করেছেন। সর্বত্রই আমরা তাঁর দৃষ্টির আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আজন্ম-আচরিত সৌন্দর্যবোধের সহাবস্থান লক্ষ্য করব।

পূরবী কাব্যে কাল-সম্পর্কিত যে দুটি কবিতা আছে সে দুটিতে এ পর্যায়ের আধুনিকতার চেতনা এবং যুগধর্মের সমালোচনা লক্ষ্য করা যায় না। বহু পূর্বে যৌবনে কবি অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যে সৌন্দর্য-মাধুর্যের সম্পর্কের কল্পনা করেছিলেন তারই নবরূপায়ণ এই কবিতাগুলি। চিত্রায় '১৪০০ সাল' কবিতায় তিনি বলেছিলেন—

১ সাহিত্যের পথে, 'সাহিত্যধর্ম' (বিশ্বভারতী-১৯৬১), পৃ. ৮২

আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে !
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—

আজি হতে শত-বর্ষ পরে ॥

পূরবীর 'ভাবীকাল' কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন যে দূর ভাবী শতাব্দীর এক সপ্তদশী সুন্দরী কবির কাব্য পাঠ করছে। পরবর্তী শতাব্দীতে স্মরণীয় থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তবু তিনি কল্পনায় সেই সুন্দরীর মনোভাব উপলব্ধি করেছেন—

হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"

'অতীত কাল' কবিতায় কবি বলেছেন, অতীতের বাণী যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করে ভবিষ্যৎকে অনুপ্রাণিত করে—

যুগান্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে।
যেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে,—
মিলনের রাতে।

বর্তমান আলোচনার সঙ্গে এই দুটি কবিতার যোগাযোগ নেই, কিন্তু সাহিত্যের স্থায়িত্ব ও নিত্যতার ধারণাটি অস্পষ্ট নয়।

পরিশেষ কাব্য থেকেই প্রৌঢ় কবি তাঁর স্বরচিত সাহিত্য ও বর্তমান সাহিত্যের আদর্শের মধ্যে প্রভেদ অনুভব করেছেন; তাই পরিশেষের আত্ম-বিশ্লেষণের অন্যতম বিষয়বস্তু হয়েছে তাঁর সাহিত্য-রীতির বিশ্লেষণ। যুগধর্মের পরিবর্তন হয়েছে, কবির সকল রচনা সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মনোমত

হচ্ছিল না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-প্রমুখদের মতে রবীন্দ্রনাথ পথ রুদ্ধ করে বসে আছেন। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ পরিশেষ কাব্যের 'লেখা' কবিতাটি লেখেন—

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হোক লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি।...
কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে
যায় প্রতিমার দিন।

নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে কবির এই উপলব্ধি। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় কবি একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি গান আকারে গীতবিতানে সংকলিত হয়েছে— "পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে।"[১] এই কবিতাটির মধ্যেও কবির তৎকালীন মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্য রচনা-কালে কবির সমসাময়িক সাহিত্য-আন্দোলন এবং নূতন মনোভাবের প্রসার সমাজে দেখা দিয়েছিল। এই সময় কবির চিত্ত নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত এবং দোলাচল। কখনও তাঁর মনে হয়েছে—সত্যিই তাঁর কাল অবসিতপ্রায় আবার কখনও তিনি তৎকালীন সাহিত্যিকদের উগ্র আধুনিক মনোভাবের উপর সাহিত্যের নিত্য আদর্শকে স্থান দিয়েছেন।

'নূতন শ্রোতা' কবিতায় কবি বলেছেন তাঁর খেলার আসর যখন শেষ হতে চলেছে—তখন তাঁর নাতি নূতন কালের প্রতীক, তার খেলা জমে উঠেছে। প্রকৃতির নিয়মেই পুরাতন নবীনকে স্থান ছেড়ে দেয়। কবিও এর জন্য প্রস্তুত—

১ গীতবিতান, অখণ্ড (১৯৬৯) পৃ. ৩০২

আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায় পাড়ি
তার মেলাতে পৌঁছবে তার গাড়ি,
আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।

এই কবিতাটিতে নবযুগের সাহিত্য-চেতনা ও পুরাতনের সঙ্গে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব উপস্থিত।

এই কবিতা রচনার প্রায় মাস দুয়েক আগে কবি 'নতুন কাল' শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতায়ও তিনি অতীত অপেক্ষা বর্তমানকে গৌরবান্বিত করেন।

'আগন্তুক' গদ্যছন্দে রচিত কবিতা। পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট-শ্যামলী পর্বে কবি যে রীতির ছন্দ-সাধনা করবেন তারই আভাস আছে আগন্তুক কবিতায়। কবি অনুভব করেছেন তাঁর যুগ শেষ হয়েছে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গীরা কোথায় চলে গিয়েছে। সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রেম, প্রাণের সমস্ত উপকরণই নিঃশেষ করে দিয়েছেন। তাই আজ সপ্তোত্তরোত্তীর্ণ কবি নবীনদের সম্বোধন করে বলছেন যে নবীনদের কালে তিনি যেন প্রবাসী। তাঁর কালের সঙ্গে একালের যেন নানা প্রভেদ। একালের আধুনিকতার সঙ্গে সেকালের আদর্শের মিল নেই। তবু কবি তাঁর যা কিছু সমস্তই নূতন কালকে দান করতে চান, নাই বা হল তা একালের পরিমাপে। তাতে কবির লজ্জা নেই—

যা আমার লাভক্ষতি হতে বড়ো,
যা আমার সুখ দুঃখ হতে বেশি—
তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে যাই
স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে।

পরিশেষ-এর এই ভাবধারা পুনশ্চ-এর মধ্যেও প্রবাহিত হয়ে গেছে। কবি তাঁর রচনারীতিতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নূতন কালের দাবিকে স্বীকার করে নিচ্ছেন; পুনশ্চ কাব্যের রচনারীতি যেমন অভিনব, তাঁর বক্তব্যও এখানে তেমনি নূতন পথ ধরেছে। এখানে তিনি গদ্যকাব্য সৃষ্টি

করলেন। পদ্যের অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধনকে ভাঙলেন। গদ্যের অসংকোচ রীতিতে কাব্যের অধিকারকে বাড়িয়ে দিলেন। বিষয়ের দিক দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষ এবং জীবজগৎকে সহানুভূতির সঙ্গে কাব্যে স্থান দিলেন।

পুনশ্চ গ্রন্থের প্রথম কবিতা হল 'কোপাই'। এই কবিতায় পদ্মার ও কবির জীবনে পদ্মার প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। কবিতাটির শেষের দিকে কোপাই-এর সঙ্গে জনজীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা বলেছেন। কবিও তাঁর কাব্যে বাস্তবজীবনের ছবি আঁকবেন এবং জনসাধারণের সুখ-দুঃখের কথা বললেন কারণ—

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

কবির এই বাস্তবতা নূতন কালের প্রেরণা-প্রসূত। জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার ইচ্ছা কবির শেষ জীবনের কাব্যের একটা মূল সুর।

'নাটক' কবিতায় কবি বলেছেন, এক যুগের ভালোটা অন্যযুগে হয়ত ভালোর মর্যাদা পাবে না। তবু কবি সাময়িক ভালো এটুকু জেনেই খুশী।

কত লিখেছি কতদিন,
মনে মনে বলেছি 'খুব ভালো'।
আজ পরম শত্রুর নামে
পারতেম যদি সেগুলো চালাতে
খুশি হতেম তবে।

যদিও কবিতাটি নাটক নিয়ে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু শেষ হয়েছে কাব্য এবং গদ্যভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে। সাহিত্যের আদি যুগে ছিল পদ্য, কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে এল গদ্য। সুশ্রী-কুশ্রী ভালো-মন্দ সমস্তই গদ্যে স্থান পায় কারণ—

এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে—
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

এই গদ্যরীতির হয়ে মত প্রকাশের মধ্য দিয়েই কবি কাব্যরীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'নূতন কাল' কবিতাটিতে কবি কালের প্রেক্ষাপটে আপন সৃষ্টির প্রতি পাঠকের আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি লক্ষ্য করেছেন পাঠক-সম্প্রদায় তাঁর প্রাচীন ভাবধারার কবিতাগুলির প্রতি অধিক আগ্রহী। কালের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কাব্য-সত্য চিরন্তন। কবি বলেছেন যে, তিনি যে রীতিতে কাব্য রচনা করতেন সেই পুরাতনের কাল বুঝি অবসিত-প্রায়। কাল যখন নিজের চিহ্ন রাখে না মানুষই বা কেন স্মৃতির ভারে ক্লিষ্ট হবে। দেনা-পাওনা কালের হাতে চুকিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। পরিবর্তনই তো জীবনের লক্ষণ। কবি তাই নূতন কালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতনের কাছে বিদায় নিয়ে নূতনকে গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন। নূতন কালের দাবীতেই তাঁর নূতন রীতিতে কাব্য-রচনা। এই যুগের কাব্যে তাই নূতন বিন্যাস, নূতন বিষয় এবং নূতন জীবন-দর্শন। শেষ জীবনে কবির যেন নূতন করে পালা আরম্ভ—

> দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
> তোমারি মুখ চেয়ে,
> ভালোবাসার দোহাই মেনে।
> আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
> তোমাদের বাণীর অলংকারে,
>
> —পুনশ্চ, 'নূতন কাল'

কবি যদিও অনুভব করেছেন তাঁর পুরানো কালের কবিতাগুলিই পাঠকের কাছে অধিক প্রিয়, তবুও তিনি নূতন যুগের আগমনকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। বর্তমান জীবনধারার বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন—

> যেখানেও পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
> আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
> যেখানে আজ আছে কাল নেই।

এই নূতন কাব্যরীতি, যেমন একধারে কবির অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার ফল তেমনি আবার নবীন কালের দ্বারা প্ররোচিত বলা যায়।

শেষ সপ্তক-এর কয়েকটি কবিতায় কবি তাঁর এই গদ্যরীতিতে কাব্য-রচনার বিশ্লেষণ করেছেন। জনসাধারণের কাছে তাঁর কবিতাকে সহজ সরলভাবে উপস্থিত করার জন্য তিনি তাঁর অভ্যস্ত কাব্যরীতিকে পরিত্যাগ করে গদ্যছন্দকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। শেষ সপ্তক-এর বিশ সংখ্যক কবিতায় এই ভাব দেখতে পাই। খোলা আকাশের নিচে রাঙামাটির পথের ধারে কাব্যসভায় শ্রোতার অনুরোধে তিনি কাব্যপাঠ করতে সহসা সংকোচ বোধ করেছেন। কারণ এই কবিতাগুলি স্পর্শকাতর সযত্ন-রচিত এবং ছন্দের অন্তঃপুরে আবদ্ধ। তাই পথের ধারের সভায় এদের মানায় না। আজ জনসাধারণ কবির কাছে সময়োচিত কাব্যের প্রত্যাশী, তাই আর কবির কাব্যপাঠ করা হল না—

> ওরা বললে, 'কোথা যাও কবি' ?
> আমি বললেম,—
> 'যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
> নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।'

কবি যে গদ্যরীতির কাব্য-রচনার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করছেন এখানে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

২৪ সংখ্যক কবিতায় তিনি গদ্যকবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে আলোচনা করেছেন। ফুল, ফুলবাগান এবং ফুলের টব ইত্যাদিকে তিনি কবিতার উপমান রূপে ব্যবহার করেছেন। কবি আজ তাঁর কবিতাকে কোন বন্ধনে বাঁধবেন না, স্বাভাবিক সৌন্দর্যেই ওদের উপস্থিত করবেন। ফুলকে তোড়ায়, জরির ঝালরে বাঁধলে সুন্দর দেখায় সত্য, কিন্তু বাগানের গাছের অসজ্জিত অবস্থায় ফুলগুলি কি সুন্দর নয় ? স্বাভাবিক পরিবেশে কাব্যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই তো গদ্যকাব্যের কাজ। কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ অলংকার ইত্যাদির প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু স্বাভাবিক অসজ্জিত কথার মধ্যেও যে সৌন্দর্য আনা যায় গদ্যকাব্য তারই পরিচয়বাহী।

'পঁচিশ' সংখ্যক কবিতার বক্তব্যও একই। কবি ছন্দে-গাঁথা মিলবদ্ধ কবিতাকে টবে-পোঁতা গাছের ফুলের সঙ্গে এবং গদ্যকবিতাকে যত্র-তত্র অবিন্যস্ত ফুটে-থাকা ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফুল সব অবস্থাতেই সুন্দর কিন্তু টবের বাইরের ফোটা ফুলের স্বাধীনতা মনকে অধিক আকর্ষণ করে ; তেমনি

মিলবদ্ধ কবিতা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা। কবি এদের সঙ্গে 'মোগল বাদশার জেনানা'র তুলনা করেছেন। বাগানের বাইরের গাছগুলি আপন মুক্তির মধ্যেই সৌন্দর্যকে ধরে রাখে, ওরা সহজ, ওরা আচার-মুক্ত, কিন্তু অসংযম ওদের মধ্যে নেই। এই উদাহরণকে কবি গ্রহণ করে তাঁর কাব্যরীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন রূপকের মাধ্যমে—

আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত ;
বললেম, 'টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে ;
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে।'

শেষ সপ্তক-এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ বীথিকা সমিল ছন্দে রচিত। এর অব্যবহিত পরবর্তী কাব্য পত্রপুট গদ্যছন্দে লেখা। তবে পত্রপুট-এর কবিতাগুলির মধ্যে কাব্যরীতির ইঙ্গিত বা তাঁর কালচেতনার কোন পরিচয় কবি দেন নি।

শ্যামলী-তেও আধুনিক কাল ও গদ্যছন্দের প্রবর্তন সম্বন্ধে কোন কথা শোনা যায় না। যদিও শ্যামলী কাব্যটি গদ্যছন্দে লেখা।

এরপর সেঁজুতি-র মধ্যে নূতন কাল-সম্পর্কিত চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'পরিচয়' কবিতায় কবি নূতন কালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন। কবির তরী যখন বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে নদীর ঘাটে এসে লেগেছিল তখন লোকের কাছে তিনি কোন পরিচয় দেন নি। কিন্তু জীবনের ভাঁটার বেলায় শেষ বিদায়ের মুহূর্তে নতুন যুগের তরুণ-তরুণীদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এই ভাবে—

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

'নতুন কাল' কবিতায় মানুষের জীবনযাত্রার ছন্দটি কখনও পরিবর্তিত হয় না, যদিচ কালের পরিবর্তন ঘটে, এইরকম মত তিনি প্রকাশ করেছেন। এখানে কবি মানুষের মৌলিক বিশ্বাস এবং মানবচেতনার নিত্যতাকে স্বীকার করছেন,

ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।
... ...
তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আকাশপ্রদীপ-এর কয়েকটি কবিতার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাব্যটির উৎসর্গ-পত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্রে কবি বলেছেন, "আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।" এখানে তিনি স্পষ্টতঃই তাঁর সঙ্গে আধুনিক কালের যোগাযোগের কথা ব্যক্ত করেছেন।

'সময়হারা' কবিতায় কবি বর্তমানে বসে অতীতের স্বপ্ন দেখেছেন। এখানেই কবি একটু অস্বস্তি বোধ করেছেন—

পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

কবির কাল অতিক্রান্ত। তিনি মনে করছেন তাঁর সৃষ্টি হাল আমলের ছাড়পত্র পায় নি। তাই তিনি স্মৃতিতে অতীতকে অনুভব করছেন। এই অতীত-চারণার সঙ্গে কোন কালের কোন বিরোধ থাকতে পারে না, তবে কবি অতি আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুভব করে যেন কিছুটা সঙ্কুচিত হচ্ছেন, এবং আধুনিক কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

'ময়ূরের দৃষ্টি' কবিতার উপজীব্য একটি নিছক ব্যক্তিগত ঘটনা। কবি ময়ূরের উদাসীন দৃষ্টি দেখে আহত হয়েছেন, কারণ সে 'কিছুমাত্র খেয়াল করে না আমার খাতা-লেখায়' ; কবি ওর দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন নিজের সাহিত্য-রচনাকে দেখলেন সেই উদাসীন দৃষ্টি ছড়িয়ে আছে সমস্ত নীল আকাশে, সর্ব চরাচরে—

ভাবলুম, মাহেন্দজারোতে—
এই রকম চৈত্র-শেষের অকেজো সকালে
কবি লিখেছিল কবিতা,
বিশ্বপ্রকৃতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি।

কিন্তু, ময়ূর আজও আছে প্রাণের দেনা-পাওনায়,
কাঁচা আম ঝুলে পড়েছে ডালে।
নীল আকাশ থেকে শুরু করে সবুজ পৃথিবী পর্যন্ত
কোথাও ওদের দাম যাতে না কমে।
আর, মাহেন্দজারোর কবিকে গ্রাহ্যই করলে না
পথের ধারের তৃণ, আঁধার রাত্রের জোনাকি।

চেতনাকে মেলে দিয়ে প্রকৃতির ধ্যানের মধ্য থেকে বৃহৎ বৈরাগ্যকে আপন মনে টেনে নিয়ে দেখলেন নিজের কবিতার অক্ষরগুলোকে; তারা যেন মহাকালের দেওয়ালিতে পোকার ঝাঁকের মত। 'ভাবলুম, আজ যদি ছিঁড়ে ফেলি পাতাগুলো তাহলে পশুদিনের অন্ত্যসৎকার এগিয়ে রাখব মাত্র।' কিন্তু এই ঔদাসীন্য ও আত্মনিগ্রহ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হল না। 'নাতনি'র আগমনে সে 'বিরাট কালের' বৈরাগ্য ক্ষণিকের কাছে হার মানল। সুরসিকা নাতনির মতে কবির কণ্ঠে 'গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের'। এই কবিতার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে কবির মনে,—তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব। তবে কবি খুব হালকাভাবে, ব্যক্তিগত ঘটনার মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্বের অবসান করেছেন; এবং সহজ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

নবজাতক কাব্যে এসে কবি আপন কাব্যের পরিবর্তনের রূপ স্পষ্ট অনুভব করেছেন। নবজাতক নামকরণের মধ্য দিয়েই নবযুগ-চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর কাব্যে বারে বারে 'ঋতু পরিবর্তন' ঘটেছে। কাব্যের এই পরিবর্তন সম্বন্ধে কবি সব সময় সচেতন থাকেন না। তবু পাঠকের কাছে এই পরিবর্তন ধরা পড়ে, যেহেতু এই যুগের কাব্য 'বসন্তের ফসল' নয়—'প্রৌঢ় ঋতুর ফসল'। তাই বাইরের পারিপাট্য অপেক্ষা অন্তরের 'মননজাত অভিজ্ঞতা'ই এর প্রেরণা, আপন কাল ও আপন সৃষ্টি সম্পর্কে মমতা থাকা সত্ত্বেও কবি নূতনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

তীক্ষ্ণতর সমাজচেতনা নবজাতক কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর। বর্তমানের ধনতান্ত্রিক মদগর্বী সভ্যতা যে মানবতাকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছে এই চেতনা কবির পূর্ববর্তী কাব্যের মধ্যেও দেখা গেছে। তবে নবজাতক-এ এই ঐতিহাসিক সচেতনতা আরও তীব্র হয়েছে। পরস্বলোভী, মনুষ্যত্ব-পীড়ক সভ্যতার প্রতি কবি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ

করেছেন। তিনি আশা করেছেন পৃথিবীর মানুষের এই দুর্দিনের অবসান হবে। অমঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নবযুগের আদর্শ ও আলোক বহন করে মহামানবের আবির্ভাব হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই মানুষের দুঃখ-দুর্গতি দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার এবং লোভ ও স্বার্থের নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ কবির চিত্তে ছায়াপাত করেছে। এই কাব্যে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যেখানে কবি তাঁর সৌন্দর্য-সাধনা ত্যাগ করে, জীবনের কঠোর দিকটির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। বিদগ্ধ সমালোচকের মতে—"আসলে নবজাতকের প্রায় সব কবিতাই সমাজ-সতর্ক, পরিবেশ-সচেতন, কালমনস্ক।"[১]

'এপারে-ওপারে' কবিতাটিকে একটি আধুনিক কবিতা বলা যায়। কবিতাটিতে কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার শিল্পকর্মের সমালোচনা এবং সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে আপন জীবনকে মিশ্রিত করার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠেছে। কবি সাধারণ কতকগুলি খণ্ড বাস্তব দৃশ্যের মধ্যে গভীর সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। রাস্তার ওপারের কর্মব্যস্ত মানুষের কোলাহলমুখর জীবনকে কবি আগ্রহ ও সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন—

রাস্তার ওপারে
বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেষি সারে সারে।

... ...

'আনন্দবাজার' হতে সংবাদ-উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে।
সিনেমা-নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে
রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে,

... ...

ফেরিওয়ালাদের সাথে হুঁকো-হাতে দর কষাকষি।

... ...

শিশু কাঁদে মেঝে মাথা হানি,
সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র 'ধমকানি'।

১. ড. অরুণকুমার বসু, রবীন্দ্রবিচিন্তা (১৩৭৫), পৃ. ৩২৭

আর রাস্তার এপারে কবি নিজের কথা বলেছেন—

রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,
সারাদিন চলেছে সন্ধান
দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।

ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে

তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণে-ক্ষণে
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গা স্রোতে।

কবিতাটিতে কবির অকপট স্বীকারোক্তি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগের যে অভাব রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছে তার পরিচয় 'পুনশ্চ'-র সময় থেকেই পাওয়া যায়। এই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা তাঁর কাব্যে বার বারই উচ্চারিত হয়েছে। জীবনের ছোটখাট তথ্যের মধ্য দিয়ে তিনি তত্ত্বকে খুঁজতে চেয়েছেন। তাঁর এই তুচ্ছ বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপনের প্রয়াসের আন্তরিকতা সন্দেহের অতীত। এই জনজীবনের নানা রূপ নানা শব্দ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে না, তবু এই ধ্বংসশীল বাস্তবতার মধ্যেই সনাতন বেঁচে থাকে। এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-সচেতনতার অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়।

'রোমান্টিক' কবিতাটিও কবির অকপট স্বীকারোক্তি। এখানে কবি নবযুগের প্রেরণায় নূতন কাব্য রচনা ও ভাবধারার পরিবর্তনের চেষ্টাকে পরিহার করে সনাতন আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও বিশ্বাসের কথা বললেন। তিনি রোমান্টিক কবি একথা স্বীকার করে নিয়েছেন, তবে বাস্তবকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করতে পারেন নি। শেষ পর্যায়ের কাব্যে তিনি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাঁর অধিকতর আগ্রহ এবং বাস্তব লোকায়ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। উগ্র বাস্তবের নির্লজ্জ প্রকাশকেই তিনি সাহিত্য বলতে পারেন নি। তাঁর নিজস্ব রীতিতে অর্থাৎ চেতনার ব্যাপ্তি ও সূক্ষ্ম অনুভবের মধ্য দিয়ে তিনি বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন। কবি নিজেই জানেন তাঁর সৃষ্টি আক্ষরিক অর্থে বাস্তব নয়, তার 'অনেকটা মায়া, অনেকটা ছায়া'—

যে-কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
... ...
আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক ?'
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোমান্টিক ?'

কল্পলোকচারী হয়েও বাস্তবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবীন্দ্র-অনুভূতির জগৎকে সাম্প্রতিক সাহিত্য-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত হবে না। কারণ রবীন্দ্র-মানস সাময়িকতার তাগিদে কখনই চিরন্তন আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারে না। কবির জীবনে ও কর্মজগতে এসেছে বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ। তবে তিনি এই বাস্তবকে তাঁর কবিমন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন; তাঁর বস্তুচর্চা শুধুমাত্র মৌখিক সহানুভূতিতেই সীমাবদ্ধ হয় নি; তিনি সুন্দরের সঙ্গে পরুষের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন—

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেখাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।

দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ' ;
সৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে।

প্রতিদিনের তুচ্ছতাকে গ্রহণ করেও কবি তাকে চিরসুন্দরের লীলাভূমিতে উন্নীত করেছেন। এই মনোভাবের পরিচয় আমরা সানাই কাব্যেও পাই। এই কাব্যে স্বচ্ছন্দ সুর ও সহজ কল্পনা গোধূলি বেলার রবীন্দ্রকাব্য-আকাশকে অপরূপ স্বপ্নমায়ায় মণ্ডিত করেছে। বহুকাল বিস্মৃত সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেমের যুগটি যেন বিদায় বেলার বেদনা নিয়ে ফিরে এসেছে। এই সময়ে সমসাময়িক কাব্যান্দোলন আরও পরিপুষ্টি লাভ করেছে ; রবীন্দ্র-বরণ এবং রবীন্দ্র-বিরোধ সমভাবেই চলেছে।

বাস্তবতার নামে জীবনের কুশ্রীতা ও সৌন্দর্যের নামে আদর্শহীন দেহাত্মবাদকে কবি সমর্থন করতে পারেন নি। এখানেই ছিল তাঁর সঙ্গে সমকালীন তরুণ বাস্তববাদী লেখকদের পার্থক্য। জীবনের কুৎসিত পরিবেশ, খণ্ডতা এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়েই চিরসুন্দর এবং অখণ্ডকে উপলব্ধি করতে হবে। তাই কুৎসিত কঠিন পরিবেশের মধ্যে বাস করেও কবি তাঁর গানের সত্যতা খুঁজেছেন সেই 'অনন্ত গোধূলি লগ্নে' যেখানে 'তীরে তমালের ছায়া' নিয়ে চিরসুন্দর, চির-বাঞ্ছিতের দিকে বয়ে চলে 'ধলেশ্বরী'।[১] এই বিশ্বাসেরই অন্তিম স্বীকৃতি বহন করছে সানাই কাব্য। সমসাময়িক যুগের অবক্ষয়, নৈরাশ্য, পীড়ন এবং মৃত্যুর মিছিলকেই কবি কাব্যের একমাত্র বিষয় করেন নি। কাব্যরূপের মধ্যে প্রাকৃত শব্দ বসিয়ে বাস্তবকে অবিকৃতভাবে উপস্থিত করাকেও তিনি আধুনিকতার একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করতে পারেন নি। তথাপি বলা যায় কবির মানসজগতে যে পরিবর্তন হয়েছে, সেকথা অনস্বীকার্য। তাই পুরানো দিনের ভাবকল্পনা ও আবেশ অবিকৃতভাবে তিনি এই গোধূলি-পর্যায়ে উপস্থিত করতে পারেন নি। নূতন দিনের স্পর্শ

১ বাঁশি কবিতা, পুনশ্চ

ও নবচেতনার প্রভাবকে তিনি এড়াতে পারেন নি। তাই কাব্যের স্বপ্নময় পরিবেশে বার বারই বাস্তবের আহ্বান উপস্থিত হয়। এখানেই তাঁর পূর্ব পর্যায়ের কবিতার সঙ্গে শেষ পর্যায়ের কবিতার একটি মৌলিক পার্থক্য।

পূর্ণতার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের প্রেয়; জীবনের ছন্দভাঙ্গা অসঙ্গতিই শেষ কথা নয়, তাই সম্মুখের দৃশ্যমান বস্তুজীবনের অপূর্ণতার মধ্য দিয়েই পূর্ণতার ইঙ্গিত পান কবি। 'সানাই' কবিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথাই বলেছেন। একদিকে—

ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধে
মিশাইছে বিষ।

কিন্তু এরই মধ্যে—

সমস্ত এ ছন্দভাঙ্গা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
... ...
মনে ভাবি, এই সুর প্রত্যহের অবরোধ' পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই—
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রি দিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

'সানাই' যেন নৈরাশ্যপীড়িত উদ্‌ভ্রান্ত বর্তমান থেকে উদ্‌বর্তনের কাব্য। তবু কোন কোন কবিতায় কবির স্বপ্নলোক বাস্তবের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এই রকমই একটি কবিতা 'অপঘাত'—

নববিবাহিত একজনা,
শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।

আশে-পাশে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া রয়েছে দলেদলে
বাঁকা চোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

'অনসূয়া' কবিতায় তাঁর বাস্তব চিত্রণ আরও নিখুঁত। বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই এই কবিতার উদ্দেশ্য নয়—বাস্তবের মধ্য দিয়ে কবির মন বাস্তবাতীতের দিকে চলে গেছে।—

কাঁঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পৈকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।

কবির এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর মনের প্রবণতা যে কোন্ দিকে তা বোঝা যায়। তাই যখন তিনি বলেন,—এ গলিতে বাস মোর। তবু আমি 'জন্ম রোমান্টিক'। তখন কোন আকস্মিক চমক লাগে না। এই গলির পথ বেয়েই কবি গিয়ে পৌঁছেছেন সেই মধ্যযুগীয় অনন্ত-যৌবনা রোমান্টিক নায়িকা অনসূয়ার কাছে। সেই মেয়ে বিংশ শতকের ছন্দোহারা কবিদের হাতে তৈরি ইকনমিক্‌স-পরীক্ষাবাহিনী নয়, সে—

এনে দেয় রোমাঞ্চ-হরষ
কোমল সে ধ্বনির পরশ।
সোহাগের নাম দেয় মাধবীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে।
এ মাধুরী যে দেখে গোপনে
ঈর্ষার বেদনা পায় মনে।

কিন্তু কবির এই স্বপ্নরাজ্যে অবস্থান স্থায়ী হয় নি, তাঁকে আবার বাস্তবের মধ্যে ফিরে আসতে হয়েছে—

স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর-বার যেতে হবে চলে
সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

সমকালীন যুগ এবং প্রৌঢ় কবির অভিজ্ঞতা বার বারই তাঁকে বাস্তব ও আদর্শের দ্বন্দ্বের সামনে উপস্থিত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যায়ের কাব্যে সব রকম পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি তাঁর আজীবনের মৌলিক বিশ্বাস ও ধারণাকে কখনও ত্যাগ করেন নি। তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই 'অনসূয়া' কবিতাটি।

এর পরের কাব্যগুলিতে কবির গভীর অস্ফুট অনুভূতির নিবিড় প্রকাশ। দেশ-কালধৃত ধারণা আর কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে না—এই কাব্য চারটিতে (রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা) একমাত্র চৈতন্যলোকের যোগই গভীরতর হয়েছে। 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি'র ধ্যানে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। তবু তিনি অতীত বর্তমান এবং মানবজীবন ও পৃথিবীকে তাঁর চিন্তাবহির্ভূত করেন নি। তাই এই যুগের কাব্যে বৃহত্তর অর্থে সমগ্র পৃথিবী ও মানবসংসার আশ্রয়লাভ করেছে। কবির চেতনার এই ব্যাপ্তির ফলেই তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নূতনত্ব দেখা দিয়েছে। জীবন-গোধূলির আত্মসমীক্ষা ও আত্ম-সমালোচনার সঙ্গে কবি যুক্ত করেছেন তাঁর আশা। এই আশা হল নূতন কালের নূতন কবিকে ঘিরে—

যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

জন্মদিনে, ১০ সংখ্যক কবিতা

এর পরেও রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট'কে চরম বলে মানেন নি। আশা করেছেন—'মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে' ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে, এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। মহামানবের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এখানেই তাঁর ইতিহাসবোধ ও কালচেতনার চরম এবং সমাপ্তি।

পাঁচ

সমকালীন পরিবেশ ও সাহিত্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়কে যেখান থেকে শুরু বলা যায় অর্থাৎ ১৯২০ সাল, তার আগে ও পরে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে দুর্যোগের ঘনঘটা চলছিল। ইংরেজের অত্যাচার এবং এর প্রতিবাদস্বরূপ দেশে কতকগুলি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল; যেমন, অসহযোগ ও আইন-অমান্য ইত্যাদি। এ ছাড়াও এই সময়ে দেশে সহিংস বিপ্লবীদের প্রভাবও দেখা যাচ্ছিল।

এই পরিবেশের প্রভাব অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের উপরও এসে পড়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথকে কোন প্রচলিত রীতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। রাজনীতি-বিচার ও মনুষ্যত্ব সম্পর্কে কবির একটি নিজস্ব ধারণা ছিল।

১৯ ৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ গানের মন্ত্রে সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। তারপর থেকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাজনৈতিক মতামতগুলি যতটা তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রেরণাজাত, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সার্বিক সত্যবোধের মূল্যায়নের প্রয়াস মাত্র। রাজনৈতিক দিক থেকে মানবতার মর্যাদাই রবীন্দ্রনাথের কাছে বড় হয়েছে। তাই বিপ্লববাদে তাঁর যেমন আস্থা ছিল না, তেমনি বিদেশী শাসকের বর্বর অত্যাচারকেও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এই উভয়ের প্রতিই তিনি তাঁর মতামত তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তাঁর কাম্য ছিল না, নৈতিক শক্তি এবং আত্মশক্তিকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তবে তাঁর কবিতায় সরাসরিভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলী, সমসাময়িক দেশাত্মবোধমূলক আন্দোলনের কথা উত্থাপন করেন নি।

প্রৌঢ় বয়সে তাঁকে অনেকবার নানা উপলক্ষে বিদেশে অবস্থান করতে হয়েছে। দেশের সংবাদ পেতেন পত্রের মাধ্যমে। ১৯২৫ সালে সুদূর আর্জেন্টিনায় বসে সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে এক পত্রে কবি জানতে পারলেন যে অর্ডিনান্স জারি করে বঙ্গীয় সরকার বহু যুবককে আটক করেছে। এই সময় বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বরাজ্য দলের প্রভাব বিদেশী সরকারকে নানাভাবে

বিব্রত করে তোলে। এঁদেরই বিরুদ্ধে দমননীতির প্রয়োগ কবিকে কতখানি দুঃখিত ও বিক্ষুব্ধ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পূরবী কাব্যের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত কবিতায় লেখা চিঠির মধ্যে—

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশ-পাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

... ...

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহায় তপস্যাতেই হোক বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

পূরবী-র পরবর্তী অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থে এই জাতীয় কিছু কিছু কবিতা আছে। সমসাময়িক ঘটনা, মানবতার অপমান বা নৈতিক অবনতিই কবিচিত্তে স্থৈর্যভঙ্গ করেছে, তারই পরিচয় এই কবিতাগুলি।

১৯২৬ সালের মার্চ মাস। কবি কলকাতাতে অবস্থান করছেন, অকস্মাৎ এই সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই মানুষ-বলি কবিকে স্বচক্ষে দেখতে হয়েছে। মর্মাহত কবি এই ঘটনা উপলক্ষে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি 'ধর্মমোহ' নামে পরিশেষ কাব্যে আছে—

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।

... ...

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

১৩৩৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ বক্‌সা দুর্গের রাজবন্দীরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। কবি তখন দার্জিলিং-এ ছিলেন—তাঁর কাছে একটি অভিনন্দন বাণী পাঠানো হলে তিনি 'বক্‌সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' কবিতাটি লিখে পাঠান। এই ক্ষুদ্রায়তন কবিতাটি ভাবের দিক থেকে সুন্দর। রাত্রি চিরদিনের মত সূর্যকে গ্রাস করতে পারে না, পাখীকে খাঁচায় আবদ্ধ করলে যেমন তার গান বন্ধ করা যায় না, তেমনি মানুষকে আবদ্ধ করলেও মানুষের মনকে বাঁধা যায় না। কারণ—

'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্ম বিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

'প্রশ্ন' কবিতাটির মধ্যে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ১৩৩৮ সালের ১৬ই আশ্বিন মেদিনীপুরের হিজলী জেলে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে জেল-কর্তৃপক্ষ সামান্য কারণে গুলি করে হত্যা করে। কবি এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার মনুমেণ্টের তলায় আহূত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং সুদীর্ঘ এক তীব্র ভাষণ দেন—'ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতন নীরব করে দিয়েছে।'

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হন। লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য তিনি ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে সেখানে যান ; তথায় ঐ বৈঠক ব্যর্থ হলে তিনি ২৮শে ডিসেম্বর দেশে ফিরলেন। এই সময় দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় সংকট দেখা দিল এবং সমস্ত দেশ যেন সেই আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ৪ঠা জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হন।

এই সময় কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর-পূর্তি উপলক্ষে কয়েকদিনব্যাপী দেশবাসী রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেন। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন গান্ধীজীর ক্ষমা ও অহিংসার আদর্শ এ দেশে মুক্তি আনবে। কিন্তু মানবতার এই অপমান এবং শাসকবর্গের এই অত্যাচার

রবীন্দ্রনাথের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই সময়েই তিনি 'প্রশ্ন' কবিতাটি লেখেন। ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে শান্তির দূত পাঠিয়েছেন, তাঁদের আদর্শ ক্ষমা এবং ভালোবাসা। আমাদের দেশে গান্ধীজীও সেই দূতের মহান আদর্শ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

কবির মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, এই মানবতার অপমানকারীকে কি ঈশ্বর ক্ষমা করেছেন?

'অগ্রদূত' কবিতাটির মধ্যে অনেকে সমসাময়িক ঘটনার ইঙ্গিত দেখেছেন। মহাত্মা গান্ধীর উপরোক্ত কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। তিনি কখনও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও অন্যায়-অবিচারের প্রতি সর্বদাই তাঁর লেখনীকে সজাগ রেখেছিলেন। দেশের আত্মশক্তির জাগরণই তাঁর কাম্য ছিল। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের মধ্যে তিনি সেই আত্মশক্তির উদ্বোধনই লক্ষ্য করেছেন। তাই মহাত্মার এই কারারোধের ঘটনায় তিনি সম্ভবতঃ পরাধীন ভারতবাসীর জীবনের অগ্রদূতরূপী গান্ধীজীকে স্মরণ করে এই কবিতা লেখেন—

নবজীবনের সংকটরূপে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।

'প্রণাম' কবিতাটিও কারারুদ্ধ গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করে লেখা বলে অনুমিত হয়ে থাকে। 'শান্ত' কবিতাটিও সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আস্বাদিত হতে পারে। সম্ভবতঃ এটি গান্ধীজীর বন্দীদশাকে স্মরণ করে লেখা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য—

"পরিশেষে তিনটি কবিতা—'অগ্রদূত', 'শান্ত' ও 'প্রণাম';—আমরা যদি বলি কারারুদ্ধ গান্ধীজীর স্মরণে রচিত তবে কি খুব কদর্থ হইবে? পাঠকগণকে এই পটভূমিতে কবিতা-ত্রয়কে পড়িতে অনুরোধ করিয়া রাখিলাম।"[১]

'অবাধ' কবিতার সঙ্গেও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যোগ আছে। মহাত্মা গান্ধীজীর এই কারাবরণের পর দ্বিতীয়বার আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। তৎকালীন তরুণদের যৌবনচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনাকে লক্ষ্য করে কবি এই 'অবাধ' কবিতাটি রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে বলাকা-র 'সবুজের অভিযান' কবিতাটির সঙ্গে উক্ত কবিতাটির বক্তব্যের দিক দিয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক বিধি-নিষেধ জড়তা ইত্যাদি তারুণ্যের প্রবাহকে রোধ করতে পারে না—

পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলে ঝংকারিয়া
অন্তরে প্রবল মুক্তি নিয়া।
আগামী কালের লাগি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়,
আগামী কালেরে করে জয়।

'স্পাই' কবিতাটি আখ্যানমূলক। সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক বিপ্লবী তরুণ আত্মদান করেন। অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন অকালে বিনষ্ট হয়। তারই কোন একটি কাহিনীকে স্মরণ করে এই কবিতাটি রচনা করেন। উক্ত কবিতায় সতীশ নামে একটি তরুণের দেশসেবার অপরাধে আলিপুর জেলে অনশনে প্রাণ উৎসর্গ করার কাহিনী গভীর মমতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন।

পত্রপুট-এর 'আফ্রিকা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য সৃষ্টি। ১৯৩৭ সালে মুসোলিনির ইতালী যখন আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করে তখনই এই কবিতাটি রচিত হয়। আফ্রিকা ছিল অশিক্ষিত অনগ্রসর দেশ, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে; এর মধ্যে আবিসিনিয়া ছিল স্বাধীন। ইতালী যখন এই দেশ আক্রমণ করে তখন আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তখনই এই কবিতাটি লেখেন। জানা যায় কবি অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে কবিতাটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশ স্থাপনের একান্ত

১. রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১৩৫২), পৃ. ৩১৯

বিরোধী ছিলেন, বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ জাতি আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে, সেখানকার মানুষকে অত্যাচার এবং অপমান করছে, এই চিন্তা কবির অসহ্য মনে হয়েছিল। মদগর্বী তথাকথিত সভ্য, অত্যাচারী উপনিবেশবাদীদের প্রতি কবির পুঞ্জীভূত ঘৃণা তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে॥

পৃথিবীর যেখানেই স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে এবং মানবতার অপমান ঘটেছে, সেই সমস্ত ঘটনাই কবিকে সমভাবে মর্মাহত করেছে। ১৭ সংখ্যক কবিতা রচনার নেপথ্যে একটি কাহিনী আছে। ১৯৩৭ সালে জাপান চীনদেশ আক্রমণ করে এবং চীনা শহর সাংহাই এবং নানকিং অধিকার করে। জাপানী বোমার আঘাতে বহু শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলা প্রাণ হারায়। ১৩৪৪ সালের ৭ই পৌষ-উৎসবের দিন কবির মনে এই দুঃখের কথাই উদিত হয়েছে এবং তাঁর ভাষণে চীনের প্রতি সমবেদনাই ধ্বনিত হয়েছে—"চীনের প্রতি (জাপানের) নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, কিন্তু আমাদের কী করবার আছে, আমরা কী করতে পারি ? ‥ ‥ এই দুঃখবোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি......আমাদের অস্ত্র নেই কিন্তু মন আছে।"[১]

এই সময় সংবাদপত্রের একটি সংবাদ পড়ে কবি বেদনাহত হয়ে পড়েন। চীনাদের উপর জয়ী হবার জন্য জাপানী সৈন্যদল বুদ্ধ-মন্দিরে বর প্রার্থনা করে। শান্তির দূত বুদ্ধের কাছে অশান্তির আগুন জ্বালাবার প্রার্থনা! এতখানি শঠতা রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেন নি, এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' নামে একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতাটিই পত্রপুট-এ 'সতেরো' সংখ্যক কবিতা হিসাবে সংকলিত হয়—

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড ১৩৭১), পৃ. ১১৪

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।

মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।

দেবতার নামে এই অন্যায়ের প্রতি কবি তীব্রভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন।

উপরিউক্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরো দুটি কবিতার উল্লেখ করা যায়; ১৯৩৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর লিখিত প্রান্তিক-এর ১৭ এবং ১৮ সংখ্যক কবিতা। এখানে কবিকণ্ঠ বিশ্বাসভঙ্গ ও সত্যের অপলাপে এবং মানবতার অপমান-জনিত বেদনায় কাতর, তবু কবির প্রকাশ-ভঙ্গী ঋষিসুলভ; ব্যক্তিগত অনুভূতিকে অপূর্ব সংযমে বেঁধে তিনি উচ্চারণ করলেন—

······ দেখিলাম এ কালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ,······

······ মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ-ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

—প্রান্তিক, ১৭ সংখ্যক কবিতা

ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি, মানুষের লোভ, অহংকার, নিষ্ঠুরতা, মনুষ্যত্বের অপমান কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। ফ্যাসিস্ট ইটালির আবিসিনিয়া

গ্রাস, ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংস, জাপানের চীন গ্রাস করার প্রয়াস, হিটলারের পররাজ্যের প্রতি লোভ দ্বিতীয় যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। এই অবস্থায় খ্রীষ্টের জন্মদিনে শান্তির জন্য মন্দিরে প্রার্থনাকে কবির পরিহাস বলে মনে হয়েছে—

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

—প্রান্তিক, ১৮ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। একদিকে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য অন্যদিকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া। তাই বার বারই তাঁর মানসিক প্রশান্তিকে বিদীর্ণ করে দিতে চেয়েছে তাঁর এই নবলব্ধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক চেতনা।

১৩৪৫ (১৯৩৮) সালের নববর্ষে কবির মন পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক বিপর্যয়ে ভারাক্রান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি এবং হিটলার ও মুসোলিনীর সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার চলছে তখন। ঐ দিন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লিখেছেন—"আমার জীবনের শেষপর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে। দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর এক দিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা।··· ···মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে"। (চিঠিপত্র, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২১৪-১৫)। এর কিছুদিন পরে কবি কলিম্পং যান। সেখানে জন্মদিন উপলক্ষে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সেঁজুতি কাব্যে ধৃত 'জন্মদিন' কবিতাটি রচনা করেন। এটি ঐদিন রেডিওর মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই কবিতাটির মধ্যে আন্তর্জাতিক অশান্তি ও মানবতার অপমানে কবির রুদ্ধবাক্ বেদনার প্রকাশ হয়েছে। অনাগত মহাযুদ্ধের পরিণাম কবির মানসপটে ফুটে উঠেছে—

শুনি তাই আজি—
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব······

বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

এই কাব্যের 'চলিত ছবি' কবিতাতে স্পেনের সমসাময়িক গৃহযুদ্ধের উল্লেখ আছে—

যুদ্ধ লাগল স্পেনে;
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।

নবজাতক-এর একাধিক কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে আধুনিক মদগর্বী সভ্যতায় মানুষের অপমান;—ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার বীভৎস রূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগমনের প্রস্তুতি, ধর্মের নামে নিরীহের উপর অত্যাচার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পৃথিবীর স্বাভাবিকতার ছন্দপতন ইত্যাদি।

বর্তমান পৃথিবীর সামাজিক সংকট ও বিপর্যয়ে শক্তিমানের দম্ভ কিভাবে দুর্বল ও অসহায়কে পীড়ন করছে কবি 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায় তারই বর্ণনা দিয়েছেন। কবির ধারণা, এই সভ্যতা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সেই ধ্বংসের মধ্যেই জন্ম নেবে নূতন সভ্যতা। এই বিশ্বাসের কথা নবজাতক-এর কবিতায় বার বারই ধ্বনিত হয়েছে। একদিকে অপচয় অন্যদিকে অভাব; একদিকে সঞ্চয় অন্যদিকে রিক্ততা। সমাজের এই রূপে কবি ক্ষুব্ধ। পৃথিবীব্যাপী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই কবিতাটি। কবি মানবতার পূজারী, পূর্ণের উপাসক। তাই তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস কল্যাণ-শক্তির উদ্বোধন একদিন হবেই এবং তখনই পৃথিবীতে শান্তি আসবে—

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি পত্রপুট-এর ১৭ সংখ্যক কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ। উভয় কবিতার ভাব এক; পার্থক্য শুধু বিন্যাসে। কবিতাটির ভূমিকা-স্বরূপ কবি বলেছেন—"জাপানের কোন কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"

কবির ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় 'হিন্দুস্থান' ও 'রাজপুতানা' কবিতা দুটিতে। 'হিন্দুস্থান' কবিতায় ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ইত্যাদি পট-পরিবর্তনের কাহিনী। কিন্তু কালক্রমে জয়ী, পরাজিত, পীড়ক, পীড়িত সবই ইতিহাসের গর্ভে লীন হবে এবং মহামৃত্যুর প্রাঙ্গণে কবরশয্যা রচনা করবে। ভারতের পশ্চিম দিগন্তের প্রতি আকর্ষণ কবির বহুকালের, কারণ—"ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে।" এই কবিতায় কবির ভারত-ইতিহাস পর্যালোচনা ও সমকালীন পরাধীন ভারতের ইতিহাসের পট-পরিবর্তনে সংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়েছেন—

ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের।

এই কবিতাটি প্রসঙ্গে ড. শিশিরকুমার ঘোষ বলেছেন—" 'আরো ছায়া'র উল্লেখে সমসাময়িকতার ইঙ্গিত ও কিঞ্চিৎ আতঙ্ক-সৃষ্টি সম্ভব হয়ে থাকলেও তাতে এ যুগবাসী কেউই উৎসাহিত বোধ করবেন বলে মনে হয় না।"[১] এখানে সমালোচক যথার্থই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইঙ্গিত করেছেন। তবে কবিতাটির আস্বাদ্যমানতা সম্বন্ধে যে কথাটি বলেছেন তা মতপার্থক্যের অপেক্ষা

১. শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্য (১৩৬৮), পৃ. ১৩৩

রাখে। কারণ সমালোচকের বিচারই কবিতার ক্ষেত্রে শেষ কথা হতে পারে না।

'রাজপুতানা' ইতিহাস-চেতনার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কবিতাটি রচনা-প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"নবজাতকের 'রাজপুতানা' কবিতাটি লেখার ইতিহাস অন্যরূপ। স্টেট্‌স্‌ম্যান হইতে প্রকাশিত 'সুন্দর ভারত' (Wonderful India) গ্রন্থে রাজপুতানার ছবি দেখিয়া মনে যে ধিক্কার লাগে তাহারই অভিঘাতে উহা লিখিত।"[১] একদিকে হৃতগৌরব রাজপুতানার প্রতি সমবেদনা, অন্যদিকে অতীত গৌরবের অসার স্মৃতি-রোমন্থনের প্রতি ধিক্কার এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজপুতানার দরিদ্র কৃষক-শ্রেণী, যারা এই স্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কর্মযোগের দ্বারা যুক্ত, তাদের অকপট জীবনের সঙ্গে টিটাগড়ের ধনস্ফীত বণিক-বৃত্তির দাম্ভিক শোষণের তুলনা করে মর্মান্তিক আহত হয়েছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গৌরব হারিয়ে রাজপুতানার এই বেঁচে থাকা কবির কাছে নিরর্থক—

তাই ভাবি হে রাজপুতানা,
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক ;
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে ॥

উক্ত কবিতা দুটি সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"কবিতা হিসাবে অধিকতর সমৃদ্ধ 'হিন্দুস্থান' কবিতাটি, কিন্তু 'রাজপুতানা'র ইতিহাস-চেতনা সমৃদ্ধতর"।[২] সমালোচকের এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য। তবে সমগ্র কবিতাটির মধ্যে বণিকবৃত্তি সম্বন্ধে একটি স্তবক একটু বেসুরো লাগে।

'পক্ষীমানব' কবিতাটি যন্ত্রসভ্যতার প্রতি কবির তির্যক বক্রোক্তি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রকৃতি-রাজ্যের শান্তিকে নষ্ট করেছে। বিমানের দ্বারা আকাশে-বাতাসে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে—

১. শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড (১৩৭১), পৃ. ১৯৫
২. ড. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬৯), পৃ. ২২৭

যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে—
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ—
কোথাও না বাধা মানে ;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।

রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে কোন কোন সমালোচক এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে বর্তমানে যেভাবে এরোপ্লেন মানুষের কল্যাণ-কর্মে নিযুক্ত আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে তেমন ছিল না। শুধু সংগ্রামের মাধ্যম হিসাবে এরোপ্লেন ব্যবহৃত হত।[১] সমালোচকের এই মত অতি যুক্তিযুক্ত, কারণ রবীন্দ্রনাথের মত এই রকম একটি প্রগতিশীল মন কখনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—যা দেশের কল্যাণ করে, তার বিরোধী হতে পারে না।

'আহ্বান' কবিতায়ও মহাযুদ্ধের ইঙ্গিত। পৃথিবীব্যাপী অশান্তি এবং ধ্বংসলীলার কথা কবির মনে হয়েছে। কবিতাটি কানাডার উদ্দেশ্যে লিখিত। সমস্যাক্লিষ্ট পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য তরুণ জাতিকে কবি আহ্বান করেছেন—

রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরাণ দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।

জন্মদিন-এর ১৬ সংখ্যক কবিতায় তিনি সমকালীন পৃথিবীর পালাবদলের সূচনা লক্ষ্য করেছেন। কবিতাটিতে সমগ্র বিশ্বে বিপর্যয়, যুদ্ধের আশঙ্কা, সভ্যতার সংকট এবং মানবজীবনে এদের প্রভাবের ফলে মৌল-নীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। অপব্যয়, অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, মৃত্যুর বিভীষিকা সবই কোন পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিত বলে কবির মনে হয়েছে—

শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে, কী রইবে।
পালিশ করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।

---

১. শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু, রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলিপর্যায় (১৩৮০), পৃ ১৪৮

২১ সংখ্যক কবিতায় পৃথিবীব্যাপী তাণ্ডবে কবির বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। তবে এই বেদনা ও নৈরাশ্যের মধ্যে আশ্চর্য মানববাদী পর্যালোচনা এবং আশ্বাসের বাণী কবিতাটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কবি কখনই বর্ত্তমানের সংকটকে শেষ বলে মনে করেন নি। তিনি সব ক্ষেত্রেই সনাতন ও মৌলিক বিশ্বাসগুলিকে সংকটের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এই কবিতাটিতেও কবির সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—

> এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
> বীভৎস তাণ্ডবে
> এ পাপযুগের অন্ত হবে,
> মানব তপস্বীবেশে
> চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
> নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
> স্থান লবে নিরাসক্ত মনে—
> আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
> ঘোষিছে কামান।

২২ সংখ্যক কবিতায় যে ক্ষমতাস্ফীত রাজ্য আপন সর্বনাশ আপনার মধ্যে ধারণ করে রাখে, মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলবর্তী অর্ধাশন, অনশন, ক্ষুধানলে জীর্ণ অসহায় যে রাজ্য, তার চিত্র কবি এঁকেছেন; এ যে ইংরেজ শোষিত ভারতবর্ষেরই চিত্র তাতে সন্দেহ নেই। তবে একই সঙ্গে কবির আশাও ধ্বনিত—

> সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
> হয় মহা দায়।
> এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
> ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,
> সমুচ্চ আকাশ হতে ধূলায় পড়িবে অঙ্গহীন
> আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিকতা এবং সামাজিকতা বিচার করলে একটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে, তা হল কবির দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা। সমাজ-সমস্যার আলোচনা এবং ঐতিহাসিকতার আলোচনা সবই কবির একটা নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক দিক থেকে। সমাজবিপ্লব অপেক্ষা আত্মিক-বিপ্লবই কবির অধিকতর কাম্য ছিল। তাই রবীন্দ্র-চিন্তা এবং -অনুভূতি কখনই আক্ষরিক অর্থে রাজনীতি বা সমাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে নি। শেষ পর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও বিব্রত, বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন; কিন্তু তাঁর এই উত্তেজনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। মানুষ এবং ভবিষ্যতের প্রতি গভীর বিশ্বাস তাঁর এই মানসিক অবস্থায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। তাই তাঁর এই অন্তিম পর্যায়ের কাব্যে উপস্থাপিত সংকট এবং সংকট-মোচন সবই একটা নৈতিক দিক থেকে বিচার্য।

ছয়

মানবকে রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড সত্যের অংশরূপে দেখেছেন। দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মানবের সত্য পরিচয় নয়, খণ্ড প্রকাশ মাত্র। স্বার্থ ও সংস্কারের বাইরে মানুষ যখন চিন্তায়, কর্মে ও প্রেমে পূর্ণতার সাধনা করে তখনই সে অসম্পূর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে যায়। কবির এই মানব-চেতনা শেষ-পর্যায়ের কাব্যে মানব-বন্দনায় পরিণত হয়েছে। কবি যে মানবের জয়গান করেছেন সেই মানব এই সাংসারিক মানুষের বৃহত্তর অংশ, যা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মানবজীবনের চরম পরিপূর্ণতার নির্দেশ দেয়। শেষ জীবনের কাব্যে কবি এই মানবতার চিরন্তন আদর্শে আস্থা প্রকাশ করেছেন।

নৈবেদ্য কাব্যের যুগ থেকে কবি যে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন সেই আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ত্যাগ করে নয়, মানুষের জীবনের মধ্য দিয়েই। তারপর কাব্য যত উত্তরমুখী হয়েছে ততই কবির এই মানবতা একটা ইতিহাস-বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তাই কবির দৃঢ়বিশ্বাস দেশ-কালধৃত খণ্ডতায় বদ্ধ মানুষের মধ্যেই মহামানবের আবির্ভাব হবে, যিনি সব বিপদ, অমঙ্গল ও অসম্মান থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন।

পরিশেষ-এর 'প্রণাম' কবিতায় দেখা যায় এই মানবের ভিতর দিয়ে একের চরণে প্রণাম নিবেদন। এখানে কবি তাঁর কাব্য-জীবনধারার একটি পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এখানে কবি যে মানবের কথা বলেছেন সেই মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের অনিত্য মানব, যার মধ্যে তিনি লোকাতীত মহত্ত্ব আরোপ করেছেন—

এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

'বর্ষশেষ' কবিতায় মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে কবি আপন জীবনের মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে অখণ্ড মানবতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে অমরতার উপলব্ধি করেছেন—

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণীর অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

'আহ্বান' কবিতার মধ্যে কবি জীবনদেবতাকে সম্বোধন করেছেন। কবি শেষ জীবনে উপলব্ধি করেছেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মনুষ্য-মহিমা বাস্তবক্ষেত্রে অপমানিত হচ্ছে। তাই কবির জীবনদেবতা যেন তাঁকে পীড়িত মনুষ্যত্বের উদ্ধারকার্যে লিপ্ত হতে বলছেন—

ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে.
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।

এই কাব্যের 'বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' এবং 'প্রশ্ন' কবিতা দুটিকে মানব-বন্দনামূলক বলা যায়। বক্সা দুর্গে রাজবন্দীরা কবির জন্মোৎসব পালন করে কবিকে অভিনন্দন-বাণী পাঠালে কবি মানবত্মার মুক্ত স্বরূপের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন। মানব 'অমৃতের পুত্র', তাই কোন বাহ্যিক বন্ধনে মানবাত্মাকে বাঁধা যায় না।

সমসাময়িক ঘটনায় উদ্বেলিত কবি-চিত্ত কোন কোন কবিতায় তাঁর মানবতার ধারণা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজ জাতির উপর প্রথমে কবি কিছুটা আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন তারা হয়ত

ভারতীয়দের মানবতার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু ক্রমেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়। ইংরেজের সাম্রাজ্যলোভী, মানবতা-ধ্বংসকারী, উৎপীড়ক রূপ কবির চোখে প্রতিভাত হল। নির্বিচার দমন-নীতির ফলে প্রেম, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ভারতে চরম অপমানের সম্মুখীন হল। মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার কবির কাছে মানবতার অসম্মান বলেই মনে হল। 'প্রশ্ন' কবিতায় বিধাতার কাছে তাঁর ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা, এই উৎপীড়ককে কি তিনি ক্ষমা করবেন—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

শেষ পর্যায়ের কবিতায় কবি নানা কবিতায় মানব-মহিমার কথা ঘোষণা করেছেন। 'জলপাত্র' কবিতাটিও এই জাতীয় ; জাতি, দেশাচার বা সমাজের বন্ধন মানবের অন্তর্নিহিত শুচিতাকে স্পর্শ করতে পারে না। কবিতাটি চণ্ডালিকার প্রাক্ রূপ—

সুন্দরের কোন জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।

ধর্মের নামে মানবাত্মার অপমান কবি সহ্য করতে পারেন নি। ধর্মরাজ বিধাতার কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন যে, ধর্মের নামে মূঢ়তা, বর্বরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা দূর করার জন্য—

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি,
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

'বুদ্ধ-জন্মোৎসব' ও 'প্রার্থনা' কবিতা-দুটি বুদ্ধদেব-স্মরণে রচিত। 'বুদ্ধ জন্মোৎসব'-এ মহামানব শান্তির দূত বুদ্ধদেবের কাছে হিংসায় উন্মত্ত দ্বন্দ্ব-সংকুল পৃথিবীর জন্য শান্তি ও করুণা প্রার্থনা করছেন।

'প্রার্থনা' কবিতাটি সমগ্র দেশব্যাপী ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বে মানবতার অপচয়ে কবির বেদনা দিয়ে শুরু। মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও লোভ অন্যের জীবনে

দুঃখ ডেকে আনে। স্পর্ধা ও অহংকার মনুষ্যত্বকে পীড়িত করে। এই সব প্রত্যক্ষ করে কবির মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর মনে পড়ে পৃথিবীর এই রকম অবস্থায়ই রাজকুমার বুদ্ধদেব সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে মানুষকে আত্মিক অপমান থেকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। বর্তমানের নিরাশ, ভরসাহীন, বিশ্বাসশূন্য জীবনে বুদ্ধদেবের করুণা বর্ষিত হোক্ এটাই কবির প্রার্থনা—

> ··· প্রমাদ-বিফল অহংকারে
> পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
> তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।

পরিশেষ-এর সমসাময়িক কাব্য পুনশ্চ-তেও কবির মানববন্দনামূলক কবিতা দেখা যায়। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনাকে কবি আশ্চর্য কাব্যরূপ দান করেছেন শেষ পর্যায়ের কাব্যে। এই কাব্যের একাধিক কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবনে কবি অসাধারণত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং মানবতার এক অপূর্ব রূপ প্রকাশ করেছেন। 'সহযাত্রী', 'ছেলেটা', 'শেষদান', 'বালক', 'কোমল গান্ধার', 'সাধারণ মেয়ে', 'বাঁশি', 'ভীরু', 'ঘরছাড়া', 'অপরাধী', 'অস্থানে' প্রভৃতি কবিতা এই জাতীয়। কবিতাগুলির আপাতলঘু ভঙ্গীর অন্তরালে মানুষ সম্বন্ধে কবির গভীর বিশ্বাস ও মমতার কথা ধ্বনিত হয়েছে।

আমাদের দেশের অস্পৃশ্যতার মনোভাবটি কবিকে পীড়িত করেছে। পুনশ্চ গ্রন্থ রচনাকালে দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। 'প্রথম পূজা', 'রংরেজিনী', 'শুচি', স্নান-সমাপন', 'প্রেমের সোনা', প্রভৃতি কবিতায় কবি মানবিকতার ভাবটি প্রকাশ করেন। কবিতাগুলি আখ্যানধর্মী। প্রত্যেকটি আখ্যানেরই মূলকথা আত্মা শুদ্ধ ও পবিত্র, কোন জাতি বা সমাজবিধি আত্মার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই পরম ভগবানের অধিষ্ঠান। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদের প্রাচীর গড়ে তুললে অন্তরাত্মা অশুচি হয়। 'শুচি' কবিতায় গুরু রামানন্দ মুসলমান জোলা কবীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েই জীবনে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন—

> রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম
> আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'

আবার কতকগুলি কবিতায় কবি বিপর্যস্ত মানবাত্মার উদ্ধারের কাহিনী বিবৃত করেছেন। 'শিশুতীর্থ', 'তীর্থযাত্রী', 'মানবপুত্র' প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। 'শিশুতীর্থ' একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপক কবিতা। মানুষ চিরকাল পরম আদর্শ লাভের পথে অভিযান করছে। সেই পরম আদর্শ হচ্ছে আত্মস্বরূপ এবং নিত্য-মানবকে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে শক্তির দম্ভ, হিংসা এবং অহংকার। অবশেষে মানুষ মনের মালিন্যকে দূর করে মানবের অন্তরস্থিত নিত্য মানবকে দর্শন করে।

'মানবপুত্র' কবিতায় মানবপুত্র বলতে কবি খ্রীষ্টকেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মানবের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। তাই মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি রূপেই তিনি খ্রীষ্টকে অনুভব করেছেন। ধর্মান্ধতা ও কলুষতা থেকে মানবকে রক্ষা করার জন্য যীশু প্রাণদান করেছিলেন। আজও তেমনি মানবতার নামে পাপ ও ব্যভিচার চলছে। কবি বার বারই তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে পতিত মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য কোন কল্যাণময় পুরুষের আবির্ভাব হবে, এই আশা প্রকাশ করেছেন। মানবাত্মাকে ধ্বংস ও কল্যাণকে ব্যাহত করার চেষ্টা বর্তমানেও ঘটছে—যেমন অতীতে মানব-প্রেমিক খ্রীষ্টকে বধ করা হয়েছিল।

পরিশেষ কাব্য থেকেই কবির মধ্যে মানব সম্বন্ধে এক নূতন চেতনা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কাব্যগুলিতে এই নবলব্ধ চেতনা নানা রূপে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি স্বচ্ছ প্রজ্ঞা-দৃষ্টি মেলে মানব-মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করেছেন। দেশ-কালে ব্যাপ্ত যে চিরন্তন মানব তাঁকেই কবি কাব্যের মধ্যে বন্দনা করেছেন। তাই তাঁর পূজা দেবলোক থেকে মানবলোকে প্রসারিত হয়েছে।

পত্রপুট-এর ছয় সংখ্যক কবিতাটিতে কবির মানবপ্রীতির স্বাক্ষর আছে। অবহেলিত সাধারণ মানুষের প্রতি মমতার পরিচয় রয়েছে কবিতাটিতে। অপমানিত মানবকে কাছে ডেকে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি—

> হে অতিথি বৎসল,
> পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
> আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
> সে পাক্ আপনাকে।

কবির এই যুগের মানববন্দনার সঙ্গে ঔপনিষদিক চেতনা যুক্ত হয়ে গেছে। 'দশ' সংখ্যক কবিতায় কবি আকাঙ্ক্ষা এবং বাসনার আড়ালে মানবাত্মার সত্য

পরিচয়কে অনুভব করতে চেয়েছেন। নৈবেদ্য কাব্যের যুগে কবি বেদমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুভব করেছেন যে মানুষ 'অমৃতের পুত্র'। পত্রপুট-এও কবি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় অন্ধকারের পার থেকে আদিত্যবর্ণ সূর্যের উদয়ের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার মহৎ স্বরূপকে অনুভব করেছেন। হিরণ্ময় আবরণে যেমন সূর্যের তেজ আবৃত হয়ে থাকে তেমনি রাগদ্বেষ, কামনা-বাসনা-সহ দেহ আত্মার শুদ্ধ মুক্ত রূপকে আবৃত করে রাখে। কবি সবিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ থেকে সত্যের মুখ যেন অনাবৃত হয়—

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎ স্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল-মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্যসাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রি-গিরিতটে—
বলেছে 'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র',
বলেছে 'দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব।'

—পত্রপুট, ৬ সংখ্যক কবিতা

'পত্রপুট'-এর ১২ সংখ্যক কবিতাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জীবন-সায়াহ্নে কবি অখণ্ড নিত্য মানবকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কবির এই মানব-বন্দনায় একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে, বৃহত্তর জীবনের আহ্বানকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি—

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

এই কবিতায় কবি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মানবের হৃদয়াসীন মহা-মানবকে প্রণাম জানিয়েছেন, যিনি মানবের কল্যাণকামী এবং মানব-ইতিহাসের স্রষ্টা—

শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

'পনেরো' সংখ্যক কবিতাটি কবির আত্ম-সমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ। কবি অকপটে ঘোষণা করেছেন তিনি মানবতার পূজারী। তিনি কোন দেবতাকে পূজা করেন নি। তিনি কোন গুরু-পুরোহিতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি। তিনি জাতিহীন, মন্ত্রহীন, ব্রাত্য। কবির সম্পর্ক ছিল তাঁদের সঙ্গে যাঁরা ইতিহাসের বীর, তপস্বী, যাঁরা মহাপুরুষ, মৃত্যুঞ্জয়, যাঁরা সত্যের সাধক, অমৃতের অধিকারী। মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়ে দেশ-বিদেশের সীমানা ছাড়িয়ে তাকে পেয়েছেন। তামসের পরপারে মহান মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন—

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে।
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

কবির এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত ও বহু-পূজিত মানবমহিমা বাস্তব সংসারে অস্বীকৃত, অপমানিত হয়েছে। তাই শেষ জীবনের কাব্যে মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে নৈরাশ্য ও বেদনা। এই কাব্যেরই 'ষোলো' সংখ্যক কবিতায় কবির সমাজ-চেতনার সঙ্গে মানব-চেতনার অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতির আফ্রিকার উপর বর্বর অত্যাচারের সুন্দর চিত্র এই কবিতাটি। কবির একটি চিরকালীন বিশ্বাস ছিল অত্যাচারের কাল একদিন শেষ হয়। তিনি যেন যুগ অবসানের ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাই মানবতার জন্য মানবের কাছে তাঁর প্রার্থনা—

এস যুগান্তরের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,

বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

চীনের সঙ্গে যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জাপানীরা সাফল্য কামনা করে বুদ্ধের মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিল। 'ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে'। রবীন্দ্রনাথ জাপানীদের ধর্মের নামে এই ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করেছেন 'সতেরো' সংখ্যক কবিতায়—

ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে
মিথ্যামন্ত্র দিতে,
যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে।
সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।
বেজে উঠছে তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠছে পৃথিবী।

শ্যামলী-র 'চিরযাত্রী' কবিতায় কবি মানব-সত্তার চির-পথিক রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। মানবাত্মা নূতনের মোহে পুরাতনের সব বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়ে। এই চলার সঙ্গে কবি আপন আত্মার যোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন—

সীমানা ভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত,
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
"পেরিয়ে চলো
পেরিয়ে চলো"।

মানুষের তীব্র অপমান এবং তার অন্তরস্থিত নিত্য-মানবের অপমানে কবির মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সেঁজুতি-র 'জন্মদিন' কবিতায় তিনি বলেছেন—

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,

নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

কবির দৃঢ়বিশ্বাস, অন্যায়, অত্যাচার, এবং নিপীড়নের অবসানে এক নবযুগের আবির্ভাব হবে। কারণ, ধ্বংসের মধ্য দিয়েই তো নূতন সৃষ্টি। নবজাতক গ্রন্থে এই ধারণার একাধিক কবিতা আছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায়—

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

কবি আশা করেন, এমন এক মহামানব জন্মগ্রহণ করবেন যিনি এই অসত্য, অন্যায় এবং অত্যাচারকে পরাজিত করে এই পঙ্কিল বিদ্বেষ-কলুষিত পৃথিবীতে এক শান্তিময় মিলন-তীর্থ রচনা করবেন, মানবাত্মা অপমান থেকে মুক্তি পেয়ে আবার নিত্য শুভ্র অম্লান জ্যোতি প্রকাশ করবে। পৃথিবীতে মানব-মহিমা আবার পূজিত হবে। 'নবজাতক' কবিতায় বলেছেন—

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
... ...
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী—
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি বা দিতেছে আনি।

'উদ্বোধন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সেই নবযুগের নবীন আগন্তুককে, নবযুগের কবিকে আপন চিত্ত উদ্বোধনের জন্য এবং নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি আনার জন্য আহ্বান করেছেন, এই নবীন কবির সঙ্গীতে পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা দূর হয়ে নির্মল আনন্দ জাগ্রত হবে—

জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে,
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহো আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান॥

নবজাতক-এর আর একটি মানব-বন্দনামূলক কবিতা 'জয়ধ্বনি', জীবনের শেষ লগ্নে তিনি অদৃষ্টের জয়ধ্বনি করেছেন। পরমলগ্নের আশীর্বাদ তিনি বার বারই জীবনে পেয়েছেন, কিন্তু বাস্তব জীবনের কুশ্রীতার সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়েছেন। মানুষের অসম্মান তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তবু মানব-মহিমাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। কবি আশাবাদী, তাই মানবতার লাঞ্ছনার মধ্যেও মানুষের আত্মিক মুক্তির আশা করেছেন—

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
... ...
যত-কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

মানুষের অপমান লক্ষ্য করতে করতে জীবনের শেষ পর্বে কবি সমাজের নিম্নস্তরের লোক—কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের প্রতি আগ্রহ অনুভব করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে বার বারই পট পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের জন-জীবনের কোন পরিবর্তন হয় নি। কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি যুগ-যুগান্তর ধরে কাজ করে যায়। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই জনজীবন-ধারার কোন পরিবর্তন নেই, সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর ওরা জীবনের স্পন্দন আনে। আরোগ্য-এর '১০' সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরুগুরু গর্জন—গুনগুন স্বর—
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।

দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

কবি শেষ জীবনে এই নিম্নস্তরের জন-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। তাঁর জীবনযাত্রা, তাঁর পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিগতভাবে জনতার সঙ্গে মেশার প্রতিকূল। এই জীবনের সঙ্গে তিনি জীবন যোগ করতে পারেন নি। তাই তাঁর কাব্যের অপূর্ণতা তাঁকে বেদনা দেয়। এই অবহেলিত ও নির্যাতিত মানবের অন্তরের চিরন্তন মহিমাকে তিনি তাঁর কাব্যে মর্যাদা দিতে পারেন নি বলে নিতান্ত দুঃখিত। তাই তিনি অনাগত যুগের কবিকে আহ্বান করছেন যিনি এই মানবের কথা সহানুভূতির সঙ্গে সাহিত্যে উপস্থাপিত করবেন।—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
... ...
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

—জন্মদিনে, ১০ সংখ্যক কবিতা।

জন্মদিনে কাব্যের 'সতেরো' সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, ইতিহাসের অতীত যুগে যখন খ্যাতি-কীর্তি ছিল মূল্যহীন তখন যাঁরা 'প্রাণযাত্রা-কল্লোলিত প্রান্তে মরণসংকুল পথে যাত্রা করেছেন, বিশ্ববাসীকে আত্মার অমৃত দান করার জন্য, তাঁদের অসমাপ্ত সাধনার প্রেরণাই চিরমানবকে মহাপ্রাণতায় উজ্জীবিত করেছে। কবি তাঁদের প্রণাম জানিয়েছেন।

'আঠারো' সংখ্যক কবিতায় কবি ভীরু দুঃখগ্রস্ত মানুষকে আহ্বান করেছেন। আত্মবিস্মৃতি থেকে মুক্তিলাভ করে তারা যেন চিরস্মরণীয় মৃত্যুঞ্জয়ী মানবের জীবন থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে—

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

কবির এই অন্তিম পর্যায়ের কাব্যে সমগ্র মানবসংসার আশ্রয় লাভ করেছে। মানব তাঁর দৃষ্টিতে মহৎ এবং বৃহৎ। তাই মানবের চিরন্তন মহিমার প্রতি তাঁর যেমন অবিচল বিশ্বাস, তেমনি মহামানবের আগমনের সম্ভাবনার প্রতিও তিনি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের কথা তিনি একেবারে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন। যে মানব চিরন্তন মানবতার আদর্শকে পরিপূর্ণ বিকাশ করতে পেরেছেন, দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে সর্ব মানবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এবং যিনি বিশ্বমানবকে বিশ্বপ্রেমে যুক্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন তিনিই মহামানব। এই মানবের আগমনেই প্রকৃত মুক্তি আসবে। পৃথিবীতে বিভেদ-বিচ্ছেদ দূরীভূত হবে। তবে রবীন্দ্রনাথের কাছে এই মুক্তি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক অর্থে মুক্তি নয়, এই মুক্তি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। কবির বিশ্বাস নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তিতেই দুঃখ-দুর্দশার অবসান সম্ভব। তাই জীবনের অন্তিম কাব্য শেষ লেখা-এর 'ছয়' সংখ্যক কবিতায় কবি সভ্যতার এই সংকট-মুহূর্তেও মানববন্দনা এবং মহামানবের আগমনের কথা উচ্চারণ করলেন—

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
... ...
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥

তৃতীয় অধ্যায়
স্মৃতিচারণা ও শেষপর্যায়

শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবণতা চোখে পড়ে, তা হল স্মৃতিচারণা। কবির মনের আকাশে অসংখ্য স্মৃতি-তারকা ফুটে উঠেছে, কবি প্রৌঢ় প্রহরে স্মরণের শিখা জ্বালিয়ে তাদের চিনে নিচ্ছেন। বিদায়ের ক্ষণ যত নিকটবর্তী হয়েছে ততই কবির মনে পুরাতন, ফেলে-আসা অতীতের নানা স্মৃতি ভীড় করে এসেছে। সমালোচকের মতে—"এ যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছে অতীত জীবনের স্মৃতিসমুদ্র-মন্থন। পূরবী ও তাহার পরবর্তী যুগকে তাই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের 'স্মরণের যুগ'ও বলা যাইতে পারে।"[1]

জীবনকে কবি গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। জীবন-সন্ধ্যায় কবি সেই ভালোবাসার ঋণকে স্বীকার করেছেন স্মৃতি-অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে। কবির এই স্মৃতি-রোমন্থন সাধারণতঃ দুভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে—(ক) নিজের বাল্য-কৈশোর-জীবনের স্মৃতি ও (খ) অতীত প্রেম-স্মৃতির রোমন্থনের মধ্য দিয়ে।

শেষ পর্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ পূরবী থেকেই অতীতের জন্য কবির অশ্রুমথিত দীর্ঘশ্বাস চোখে পড়ে। কবির শেষ পর্যায়ের স্মৃতিচারণার আলোচনায় অনেক সমালোচক বিভিন্ন কবিতার প্রেরণা হিসাবে অনেক অতীত স্মৃতির উল্লেখ করে থাকেন। তার সবগুলিই যে সঠিক অনুমান তা সব সময় বলা যায় না। এ বিষয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ থাকে। তবু আমরা বর্তমান আলোচনায় সাধ্যমত ইঙ্গিতগুলির উল্লেখ করব, যদিও সবগুলিই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য না-ও মনে হতে পারে।

১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পথে 'হারুনা মারু' জাহাজে নীরস সামুদ্রিক অবকাশে কবির মন পিছনে অতীত জীবনে ফেলে-আসা বন্দরের দিকে যাত্রা করেছে। এই অবসন্ন চিন্তার ফসল পূরবী কাব্য এবং পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি গদ্য গ্রন্থ। এই পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে পূরবীর কোন কোন কবিতার ব্যাখ্যা

১. শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৮), পৃ. ৫১৯

করেছেন কবি। পূরবী-র 'ক্ষণিকা' ও 'খেলা' কবিতা দুটিতে কবি কৈশোর, যৌবনের সাথী ও সঙ্গিনীর কথাই বলেছেন। কবিতা দুটির অন্তর্নিহিত ভাব 'যাত্রী'র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—'কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল।········ অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো প্রভাত না হতেই অস্ত গেল। মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়; তারাই চিরকালের।"[১] শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, উপরোক্ত 'ক্ষণিকা' কবিতাটি কবির প্রথম যৌবনের ক্ষণকালের সঙ্গিনী আনা তরখড়ের উদ্দেশ্যে কাব্য-তর্পণ।[২] প্রথমবার বিলেত যাত্রার পূর্বে কবি বোম্বাই-এর আত্মারাম পাণ্ডুরামের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। তখন তাঁর অবসরের সঙ্গিনী ছিলেন এই 'আনা'। কবির জীবনে এই ক্ষণিকার আবির্ভাব এবং প্রভাব কবি অপূর্বভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এই 'ক্ষণিকা' কবিতায়। কবি মনে করেছিলেন ক্ষণিকার এই ক্ষণকালীন আবির্ভাবের স্মৃতি তাঁর জীবন থেকে মুছে গিয়েছে; কিন্তু আজ এই জীবন-সায়াহ্নে অনুভব করছেন তার প্রভাব কবির সমগ্র চিত্ত এবং সৃষ্টিকে অধিকার করে আছে—

ভেবেছিনু গেছি ভুলে; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।

পূরবী-র 'কৃতজ্ঞ' কবিতাটিতে অনেকে কবিজায়ার বিরহ-স্মৃতি আবিষ্কার করেছেন। কবিতাটি ১৯২৪ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রপথে 'আণ্ডেস' জাহাজে রচিত। বাইশ বছর আগে এই নভেম্বরেই কবি-

১. যাত্রী. রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯ খণ্ড (বিশ্বভারতী ১৩৬৯), পৃ. ৩৯৮-৩৯৯
২. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২), পৃ. ১২৪

জায়ার মৃত্যু হয়। তাই কবিজায়ার বিরহ যে এই কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে, এই অনুমান একেবারে অসঙ্গত ঠেকে না। কবিতাটির প্রথমার্ধে প্রিয়তমাকে ভুলে থাকার জন্য আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রেয়সী বা কবিজায়ার দান সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। প্রিয়তমার আবির্ভাব তাঁর জীবনে যে আনন্দের সঞ্চার করেছিল তার স্মৃতি কবির অন্তরে আজও জাগরূক,—

…একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফ'লে
আজো নাই শেষ।………

…তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশ মণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।

কবি-জীবনে বিদায়ের বাঁশী বেজে উঠেছে। ধূসর গোধূলি-বেলায় স্মৃতির আলোয় আবার তিনি তাঁর মানসলক্ষ্মীকে নূতন করে অনুভব করেছেন—যে 'স্বপ্নের আলসে ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা।'

রজনীর অন্ধকারে প্রিয়জনের স্মৃতি তারকা হয়ে অতীতের আকাশে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। জীবনের অনেকদিন কেটে গিয়েছে আজ জীবনের উপান্ত প্রদেশে এসে অতীতের প্রিয়জনকে স্মরণ করেছেন—

ফিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই,
আমার তারা কই?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে,
সুর ঘুমাল নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা,
কোন্ আকাশে আমার আপন তারা?

—পূরবী. 'তারা' কবিতা

এই কবিতাগুলি ছাড়াও পূরবী-তে আরও বহু কবিতাতে অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। 'উৎসবের দিন', 'লীলাসঙ্গিনী', 'পূর্ণতা', 'আহ্বান',

'দোসর', 'কিশোর প্রেম', 'অপরিচিতা' প্রভৃতি কবির অতীত স্মৃতিমূলক কবিতা। এই যুগে কবির মনে কিশোর বয়সের প্রেমলীলার স্মৃতি নূতনভাবে জাগরূক হয়। কিশোর প্রেমের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে কবি-কিশোরের নবজন্ম হল। 'কিশোর প্রেম' কবিতায় কবি নবীন বয়সের প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা অনুভব করেছেন। সেই অতীত যুগের ছোট-খাট ঘটনা, অনেক প্রাপ্তি এবং অনেক ব্যর্থতা আজ কবির মনে বেদনা সঞ্চার করেছে—

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

'দোসর' কবিতাটিতে কবির জীবনে প্রিয়তমার স্থান এবং বিয়োগ-ব্যথা অপরূপ মাধুর্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পথে আণ্ডেস জাহাজে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যে কবি 'দোসর' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। 'দোসর' কবিতায় বলেছেন—

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,

এই প্রসঙ্গে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের যাত্রী, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ পঠনীয়—জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতায় ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[১] কবিতাটি তাঁর অতীত স্মৃতি-বেদনার স্বাক্ষর হয়ে রইল।

আর্জেন্টিনায় আসার পর কবি একটি মহীয়সী নারীর সংস্পর্শে আসেন। এই নারী কবির অসুস্থ দেহ ও মনের সেবা করে কবির মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করেন। এই ভিক্‌টোরিয়া ওকাম্পোকে উদ্দেশ্য করে কবি কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। এগুলি হল—'বিদেশী ফুল', 'অতিথি', 'অন্তর্হিতা', 'আশঙ্কা', 'শেষ বসন্ত', 'বিপাশা', 'চাবি', 'প্রভাতী', 'মধু', 'অদেখা', 'প্রবাহিনী',

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড (১৩৬৮), পৃ. ২০

'না পাওয়া' ও 'বনস্পতি'। কবি এই মহিলার নামকরণ করেছিলেন 'বিজয়া'। সমগ্র পূরবী কাব্যটি বিজয়াকে উৎসর্গ করেন। 'অতিথি' কবিতায় বলেছেন—

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে, ...

এই 'বিজয়া'র স্মৃতি কবির মনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাগরূক ছিল। অন্তিম কাব্য শেষ লেখা-র মধ্যেও বিজয়ার স্মৃতি বিরাজ করছে।

কবির স্মৃতি-বাতায়নে শুধুমাত্র অতীত প্রেম বা যৌবন-স্মৃতিই নয়, বাল্য-কৈশোরের দিনগুলিও ছায়া ফেলে যায়। পরিশেষ কাব্যে এই দুই ধরনের স্মৃতিচিত্রণ দেখতে পাই।

'বিচিত্রা' কবিতায় কবি পূরবী যুগের লীলা-সঙ্গিনীর স্মৃতিকে রোমন্থন করেছেন। কবি তাঁর জীবন-পথ পরিক্রমায় জীবনদেবতা তথা লীলা-সঙ্গিনীর প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। বিস্মরণের গোধূলি-আলোয় কবি এই বিচিত্রা-রূপিণী লীলা-সঙ্গিনীর স্মৃতি চারণ করেছেন—

বুকের শিরা ছিন্ন করে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে ;
কখনো পূজা শোভন শতদলে,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।

'বালক' কবিতাটিতে আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় কবির যেন নূতনভাবে বাল্যকালকে উপলব্ধির প্রেরণা জেগেছে। এই কবিতাটির মধ্যে পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরির 'গা-খোলা' বালকের স্মৃতি লক্ষ্য করা যায়। সত্তর বছরে পা দিয়ে কবি মনের জানালা দিয়ে অতীতের দিকে তাকিয়েছেন। বালকের সরল মন যেমন বাল্যকালে সবকিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ করত, তেমনি কবির মনও নগ্ন-আবরণ বালকের মতন। বয়সের ভারে শ্রান্ত কবি পৃথিবীকে দুচোখ দিয়ে ছুঁয়ে দেখছেন।—

তেমনি আবার বালক দিনের মতো
চোখ মেলে মোর সুদূর-পানে বিনা কাজে প্রহর হল গত।

'আরেক দিন' কবিতাটিতে কবি একটি অতীত বেদনাকে রূপদান করেছেন। পঁচিশ বছর আগে তাঁর জীবন সাংসারিক কর্মচক্রে বাঁধা ছিল। তাঁকে পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ আয়ুর সীমান্তে এসে কবি উপলব্ধি করলেন যে জগৎ ও জীবনে তাঁর প্রয়োজন অবসিত-প্রায়। এই ফুরিয়ে যাওয়ার বেদনাই প্রচ্ছন্নভাবে এই কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে—

শুনতে পেলেম পিছন দিকে,
করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে,
"মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি।"
ইতিহাসের বাকীটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশ বছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকর-ঢালা পথের 'পরে ডাক-পিয়নের পদধ্বনির সুরে।

'তে হি নো দিবসাঃ' কবিতাতেও কবির স্মৃতি-রোমন্থন। জাহাজে বসে সাগরের জলের লীলা দেখতে দেখতে কবির যৌবন-দিনের বিভিন্ন লীলার কথা মনে পড়েছে। কবি তাই স্মৃতি-বেদনায় কাতর—

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীন্,—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে
রূপহারানো রাধাশ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে,
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেলবেলা
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হাওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলোছায়ার ভেলা।

'রাজপুত্র' কবিতাতে কবির মন অতীত স্বপ্নলোকবাসী। তিনি অতীত যুগের বিস্মৃত যৌবন-বাণীকে অনুভব করেছেন। মনের জড়তা ও শৈথিল্য-নাশকারী রূপে তাঁর জীবনে যৌবনের উন্মাদনা জাগছে। নিজের যৌবন সম্পর্কে এখানে কবির একটি নূতন দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে।

'সাথি' কবিতায় বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের নিঃসঙ্গ আসর যারা নিকট-সান্নিধ্যে ভরিয়ে দিয়েছিল, সেই ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় প্রকৃতিকে কবি দিনশেষে

আবার স্মরণ করেছেন। কবিতার প্রারম্ভে বাল্যকালের যে চিত্র এঁকেছেন কবি, তা শিশুমনের প্রকৃতি-সম্ভোগের ইতিহাস। এই চিত্রের সঙ্গে তাঁর বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী, যা তিনি ছেলেবেলা ও জীবনস্মৃতি-তে লিপিবদ্ধ করেছেন তার অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। তারপর তাঁর যৌবন-দিনের কথা বলেছেন—

তারপরে একদিন যখন আমার
বয়স পঁচিশ হবে,
বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে
ওই জানালায়
বিজনে কেটেছে বেলা।

যৌবনের বিষণ্ণ বেদনার-দিনে কবি এই প্রকৃতির কাছেই সান্ত্বনা পেয়েছেন, বিচ্ছেদে মিলনে তারাই তাঁর যৌবনের বয়স্য ছিল। কবি তাঁর তরুণ বয়সে যে বেদনার কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে কবির জীবনের একটি বাস্তব ঘটনার যোগ অনুমান করা খুব অসঙ্গত হবে না। কবির চব্বিশ বছর বয়সের সময় তাঁর বৌঠাকুরাণী অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করেন। এই মহিলা কবির মাতৃহীন এবং সঙ্গীহীন জীবনের অনেক-খানি অধিকার করেছিলেন। এই মন্তব্যের স্বীকৃতি মেলে কবির নিজের কথায়—"আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।"[১]

তারপর অনেকগুলি বছর অতিবাহিত হয়েছে। কবির জীবনে সঙ্গী যাঁরা ছিলেন সবাই অন্তরালে চলে গেছেন। কবি এই বিষণ্ণ প্রৌঢ় প্রহরে সেই প্রকৃতির সান্নিধ্যের মধ্যেই শান্তি এবং সান্ত্বনা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতায় স্মৃতিচারণার আলোচনায় এই কবিতাটির বিশেষ মূল্য আছে।

পুনশ্চ রবীন্দ্রনাথের নূতন স্বাদের নূতন আঙ্গিকের কাব্য। এখানে তিনি গদ্যের আলাপচারিতার ভঙ্গীতে কবিতাগুলি রচনা করেন। এই কাব্যেরও স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচিত্রণ চোখে পড়ে। 'ফাঁক' কবিতাটি স্মরণমূলক, সমগ্র জীবনের কাজের মধ্যে স্বেচ্ছায় অবকাশ খুঁজে নেওয়াকে কবি ফাঁক বলে

১. জীবনস্মৃতি (১৯৬২), পৃ. ১৪৩-১৪৪

অভিহিত করেছেন। শৈশব জীবনে কঠোর নিয়মানুগত্যের মধ্যেও কবি কখনও কখনও ফাঁক পেয়েছেন। কবি আজ প্রৌঢ় বয়সে সেই কথা মনে করছেন—

বয়স যখন অল্প ছিল
কর্ত্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।

কবির আরো মনে হয়েছে অতীতকালের সেই ছেলের কথা, যে ইস্কুল পালিয়ে হাঁসের বাচ্চা নিয়ে খেলা করেছে। নূতন বধূকে চিঠি লেখার কথাও মনে হয়েছে। কবির বৃদ্ধ বয়সের ফাঁক এই সব স্মৃতি-রোমন্থনে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

'স্মৃতি' কবিতাটির নামের মধ্য দিয়েই কবিতাটির মূল সুরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবিতাটি নিদাঘতপ্ত পশ্চিমের একটি শহরের স্মৃতিচিত্র। এখানে কবির প্রথম যৌবনে এক পরবাসী বিদেশী মেয়ে কবিকে কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল, তিনি সেই স্মৃতি স্মরণ করেছেন। বিদেশী কবির কবিতায় তাঁর 'প্রথম যৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে আপন ভাষা' একথা মনে পড়ে গিয়েছে।

'বালক' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি, একটি মাতৃহারা বালকের কাহিনী কবি গভীর মমতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। বালকের দৌরাত্ম্যের চিত্র কবি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেও প্রকাশ করেছেন। মাতৃহারা বালকের কথায় কবি নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ করেছেন। জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলায় ভৃত্যতন্ত্র-শাসিত গৃহে বন্দী যে অসহায় বালকের চিত্র এঁকেছেন, এখানে যেন আবার সেই কথাই তিনি বললেন। শিশু গ্রন্থের 'পুরানো বট' কবিতার স্মৃতিও এই কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাইরের প্রকৃতি বালককে হাতছানি দিত, কিন্তু তার উপায় ছিল না সেই প্রকৃতির সঙ্গে মেশার—

পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ
আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে।

শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড় জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ পোহানো ছাদে।

প্রৌঢ় কবির চিন্তায় সেদিনের সেই বৃষ্টিধৌত দিনগুলির স্মৃতি জাগরূক হয়ে ওঠে বর্তমানের কোন বর্ষণমুখর অপরাহ্ণে—

বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করছে আমার মন ;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।
শালের পাতায় পাতায় কোলাহল,
তালের ডালে ডালে করতালি,
বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে,
ছাতিম গাছের থেকে মালতী-লতা
ঝরিয়ে দেয় ফুল।
আর সেদিনকার আমারি মতো অনেক ছেলে আছে ঘরে ঘরে,
লাটাইয়ের সুতোয় মাখাচ্ছে আঠা,
তাদের মনের কথা তারাই জানে।

শেষ সপ্তক কাব্যের একাধিক কবিতায় যৌবনের প্রেম-বেদনার স্মৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় কবিতা সাধারণতঃ ঘটনাকেন্দ্রিক নয়—এগুলি অনুভূতির বিষণ্ণ কাব্যরূপ।

'এক' সংখ্যক কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন জীবনে কিছুই হারায় না,—সবই স্মৃতিকে আশ্রয় করে থাকে। হয়ত কোন অনুভূতির তীব্র মুহূর্তে এই হারানো সম্পদ আবার চৈতন্যলোকে এসে উপস্থিত হয়। জীবনে যাকে হারাই তাকে আবার প্রেমের মধ্যে ফিরে পাই। তাই বিরহের মধ্য দিয়েই প্রেম সার্থকতা লাভ করে—

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।

এই কবিতাটি কার স্মৃতি বহন করছে তা সঠিক বলা যায় না। তবে তিরিশ বছর আগে হারানো স্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। অনেক বিদগ্ধ সমালোচকও মনে করেছেন কবি এখানে স্ত্রীকেই স্মরণ করেছেন। শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন—"একি ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে গৃহলক্ষ্মীকে এই অগ্রহায়ণ মাসে হারাইয়াছিলেন তাঁহারই স্মরণ অথবা কবি-মানসের নিরর্থক বেদনা মাত্র ?"[১] এই প্রসঙ্গে ড. ক্ষুদিরাম দাসের মন্তব্যটিও

১. শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ৩য় খণ্ড (১৩৬৮), পৃ. ৪৫২

প্রণিধানযোগ্য। কবিতাটি "বিচ্ছেদ-ব্যবহিত পূর্ব-প্রণয়ের স্মৃতির উপর ক্ষণিকের রচনা। দাম্পত্যপ্রীতি সুলভ বলে এবং নিত্যপ্রাপ্যতা এবং অধিকারবোধের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রাপ্য গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। প্রিয়ার বিয়োগই কবির অনুপলব্ধ প্রেমকে যথার্থ মহিমায় স্থাপিত করেছে —এই বিষয়টির রমণীয়তা কবিতাটিতে বাহুল্যহীন বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।"[১]

'দুই' সংখ্যক কবিতাটি কবির পূর্বজীবনের স্মৃতি-বেদনায় করুণ। গোধূলি লগ্নে উপনীত কবি অতীতের হারানো দিনের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। যৌবনকালে কোন নারীর আবির্ভাব কবির চিত্তে দোলা দিয়েছিল। আর কোনদিন তার দেখা মেলে নি, শুধু স্মৃতিতেই জেগে রইল সে—

জোয়ারে তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্রবেলায়।

'তিন' সংখ্যক কবিতাটিও কবির বিরহবেদনার স্নিগ্ধরূপ প্রকাশ করেছে। পৌষের দিন গত হল, বাতাবি গাছে দেখা দিয়েছে কচি পাতা। এই কিশলয়গুলি যেন তমসা নদীর তীরে উচ্চারিত বাল্মীকির প্রথম শ্লোকের মত গভীর অর্থপ্রকাশে উন্মুখ, যে অর্থ প্রকাশ করতে পারত কবির ক্ষণকালীন জীবনসঙ্গিনী। কিন্তু কিছু না বলেই সে চলে গেছে। সেদিনের সেই বসন্তে কবি ও তাঁর সঙ্গিনীর মধ্যে আধচেনার যবনিকা ছিল যা সরাবার অবকাশ তিনি পান নি—

ঘণ্টা গেল বেজে,
সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে।

যে ক্ষণকালের জন্য কবির জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল এবং যে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল তারই স্মৃতির আভাস পাওয়া যায় এই কাব্যের 'বার' 'তের' এবং 'চোদ্দ' সংখ্যক কবিতায়।

'ছাব্বিশ' সংখ্যক কবিতায় মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কবি বিশ্বের শাশ্বত ভালবাসার বাণী উচ্চারণ করেছেন। এই ভালবাসা কবির আজন্ম-আচরিত বিশ্বাত্মবোধ নয়। এর মধ্যে কবির যৌবনের ভালবাসার স্মৃতিও প্রকাশ হয়ে পড়েছে গভীর মমতা ও বেদনায়—

১. ড. ক্ষুদিরাম দাস, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৯৬৬). পৃ. ২৪১

যেন কোন্ লোকান্তর-গত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বতবাণী—
"ভালোবাসি"।

'উনত্রিশ' সংখ্যক কবিতায় কবির বিরহী মনের বেদনাতুর উপলব্ধির চিত্র। অনেক কালের একটিমাত্র দিনের স্মৃতি তাঁর মনে যৌবনের প্রেমানুরাগের মুহূর্তটি এনে দিয়েছে। সেদিন একজনকে ভালবেসেছিলেন, তখন সেই ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। আজ কালের দূরত্ব সেজন্য দুঃখ এনে দিয়েছে—

আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি,—
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হল না ;—
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,
ফেরার পথ নেই।

বীথিকা কাব্যটি স্মরণমূলক। কবির যৌবনের স্মরণীয় বৎসর হল তাঁর জীবনের একবিংশ বৎসর। এই সময়ে তিনি চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়ীতে কিছুকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করেছিলেন। আবার বৃদ্ধবয়সে ১৩৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে আশ্রয় নিলেন চন্দননগরের গঙ্গার উপর বোটে। নৌকা যেখানে স্থায়িভাবে বাঁধা হল, তার ঠিক সামনেই সেই দোতলা বাগানবাড়ী। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে কবি আবার সেই পুরনো দিনগুলিকে স্মৃতির আলোয় ফিরে পেলেন। এই সময়ে রচিত কবিতাগুলিই বীথিকাতে সংকলিত হয়েছে। 'জাগরণ' নামে এই গ্রন্থের শেষ কবিতায় চন্দননগরের স্মৃতি কবির চেতনায় যে আকস্মিক কল্পান্তর এনেছে তার পরিচয় আছে। কবির এই

বীথিকা নামকরণের মধ্যেও তাঁর অন্তরলোকের প্রচ্ছন্ন স্মৃতি-বীথিকার অনুসন্ধান। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম যাত্রীর-ডায়েরি-র একটি চিঠিতে লিখেছেন —"বিশেষ কোনো একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তাহলে তারই নিভৃত ছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম।"[১] এই পত্রটিও স্মৃতিমূলক। এখানে কোন একজন বলতে অতীতের কোন প্রিয়জনকে বুঝিয়েছেন। অধ্যাপক শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে ইনি কবির বৌঠান অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী।

চন্দননগরে বোটে অবস্থানকালে কবির রচিত কবিতার মধ্যে 'বিদ্রোহী', 'গীতচ্ছবি', 'ছুটির লেখা', 'নিমন্ত্রণ', 'ছায়াছবি' ও 'নাট্যশেষ' উল্লেখযোগ্য।

চন্দননগরে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে লেখা কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই স্মৃতিমূলক। শান্তিনিকেতনে ফিরে লেখা কবিতাগুলিই বীথিকা-র মূল কবিতা। অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "গ্রীষ্মাবকাশের পর কবি নদীবাস থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন উনিশে আষাঢ়। কিন্তু চন্দননগরের সেই স্বপ্নাবেশ তাঁকে ঘিরে রইল আরো কিছুদিন। এই প্রেরণায় বীথিকা-র শেষ কবিতা 'জাগরণ' লিখিত হয় ২৯শে ভাদ্র।"[২]

পূরবী-র যুগে কবি কিশোর-প্রেমের পুনরুজ্জীবন ঘটান। সেই কিশোর-প্রেমের আর একটি রূপ 'কৈশোরিকা' কবিতায়। যে কৈশোরের প্রিয়া কবির জীবন প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানাভাবে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে সেই প্রিয়াকেই কবি স্মরণ করেছেন। কবি এই সংসারভূমিতেই প্রিয়ার দীপ্তিময়ী রূপ দেখেছেন, যে শুনিয়েছে অনাদি যুগের বাণী—

> দেশের কালের অতীত যে মহাদূর,
> তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,—
> বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
> অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
> পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা
> অপূর্ব গৌরবে।

১. রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯ খণ্ড (বিশ্বভারতী ১৩৬৯), পৃ. ৩৮১
২. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২), পৃ. ৩৯১

এই কবিতাটির সঙ্গে এই সময়ে রচিত আরো কয়েকটি প্রেম-কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের মতে কবি একটি মানসী মূর্তির স্মৃতিই কবিতাগুলিতে লালন করেছেন—"একদিকে বলাকা-র 'ছবি' কবিতার সঙ্গে এই সব কবিতা মিলিয়ে পড়লে এবং অন্যদিকে পূরবী-র 'কিশোর প্রেম' ও 'দোসর' কবিতার সঙ্গে বিচিত্রিতা-র 'নীহারিকা' ও বীথিকা-র কৈশোরিকা'র ভাবানুষঙ্গ বিশ্লেষণ করলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, কবি সর্বত্র একটি মানসী মূর্তিকেই ধ্যান করেছেন—একটি প্রেমই সর্বদা নব নব রূপে তাঁর চিত্তে আস্বাদ্যমান হয়ে উঠেছে।"[১]

'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কবি চন্দননগরে অবস্থানকালে রচনা করেন। চন্দননগরের স্মৃতি কবির মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। কবিতাটিতে কবি তাঁর চিরকালীন প্রেয়সীকে আহ্বান জানিয়েছেন। ক্ষণকালের জন্য কবি তাঁর মানসীর উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন। কবিতাটিতে অনেক ছোটখাট 'ডিটেলে'র মধ্যে গেছেন, তাই মানসীর সাজপোষাক, ভঙ্গী এবং কি নিয়ে আসবেন তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে কবিতাটির মধ্যে গভীর বেদনার অনুরণন শোনা যায়—

যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে!
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে॥

কবিতাটির কোন কোন স্থানে কবির অতীত জীবনের স্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির স্মৃতি কাদম্বরী দেবীর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত জড়িত। মনঃসংযোগ করিয়া কবিতা-কয়টি পাঠ করিলে কবির মনোভাব স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়।"[২] এই কবিতার ষষ্ঠ স্তবকে আছে—

মনে ছবি আসে—ঝিকমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি—

১. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবি মানসী (১৯৬২), পৃ. ৩৭৯
২. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড (১৩৭১), পৃ. ১৭

কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোল ;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
... ...

তাম্র-থালায় গোড়েমালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি,
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে—
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি ?

এরই পাশাপাশি কবির ছেলেবেলা গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে কবির মনে কার স্মৃতি জেগে উঠেছে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও সমর্থন করেছেন এই মত। উদ্ধৃতিটি হলো—"দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচি পান। বৌঠাকরুণ গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরী হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা।"[১] এই অংশটি ছাড়াও আর একটি অংশ আছে কবিতাটিতে যেখানে কবির মনে বৌ-ঠাকরুণের স্মৃতি জেগে ছিল এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তবে ধারণাটি অনুমান-সাপেক্ষ।

অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া,
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া॥

এর সঙ্গেও অনায়াসে মিলিয়ে নেওয়া যায় ছেলেবেলা-র সেই অংশটি যেখানে কবি বলছেন—'ছাদটাকে বৌঠাকরুণ একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্লের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা।"[২] এই 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যও একই মত পোষণ করেছেন—"রবীন্দ্রনাথের বিরহীচিত্তে অতীত বর্তমানে ভাগ করা কাল-পরিধির গণ্ডি হয়েছে বিলুপ্ত, ইহলোক ও পরলোকের সীমান্তরেখা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। চন্দননগরের

১. ছেলেবেলা, রবীন্দ্ররচনাবলী ২৬ খণ্ড (বি. ভা. ১৩৬৫), পৃ. ৬১৬
২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (বি. ভা. ১৩৬৫), পৃ. ৬১৬

লেখা 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন।⋯⋯ দেশকাল-অভিভূত করা মিলনের এমন অপূর্ব স্বপ্ন-কামনা এমন মধুচ্ছন্দা কাব্য-মালিকা দ্বিতীয়বার গ্রথিত হয়েছে বলেও আমরা জানিনে।"[১]

'ছুটির লেখা' কবিতাটিও চন্দননগরে রচিত এবং এখানেও মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির স্মৃতি জড়িত। এই কবিতাটিতে কবি বয়ঃসন্ধি-লগ্নের একটি চঞ্চলা কিশোরীর ছবি এঁকেছেন। এই কিশোরীরূপের বর্ণনার মধ্যেও অতীতের কোন স্মৃতি জড়িত কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথ কবিতার প্রারম্ভেই বলেছেন—

এ লেখা মোর শূন্য-দ্বীপের সৈকততীর,
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে।
উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা খুশি তাই ভাসিয়ে আনে।

'ছায়াছবি' কবিতাটিও অতীত প্রেমের স্নিগ্ধ স্মৃতিমূলক। জীবন-সায়াহ্নে কবির মনে পড়েছে অতীতের কোন শ্রাবণমুখর দিবসের নতনেত্র ছাত্রীর কথা যে কবির মনের অগোচরে প্রীতিচিহ্ন রেখে গেছে। এই কবিতায় এক স্থানে বলেছেন—

প্রবল বরিষণে
পাংশু হল দিকের মুখ,
আকাশ যেন নিরুৎসুক,
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

এই অংশটির সঙ্গে কবির প্রথম যৌবনে চন্দননগরে গঙ্গা-সান্নিধ্যে বাসের স্মৃতি গভীরভাবে জড়িত। জীবনস্মৃতি-তে কবি লিখেছেন—"আমার

১. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২), পৃ. ৩৮৮

গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি, গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্ম-ফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর-মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত-মুখরিত জলাধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম।"[১] বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে এসে কবির পুনরায় পুরানো স্মৃতি ও বিশেষ করে কাদম্বরী দেবীর কথা মনে পড়েছে। তাই তিনি বলেছেন—"গিয়েছে তার ছায়া-মূরতি কালের খেয়াপারে।"

'নাট্যশেষ' কবিতাটিও চন্দননগরে রচিত। এখানে কবি বিশ্বকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এবং মানুষকে নটনটীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানুষ নেপথ্যলোক থেকে দেহ-ছদ্ম-সাজে নটরূপে এই ধরাতলে আবির্ভূত হয়। তারপর কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জীবনে যবনিকাপাত হয়। মানুষ বিশ্বরঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হয়। কবিও আজ জীবন-গোধূলিতে উপনীত, তিনি জীবনের ভাঙা ঘাটে বৃদ্ধ বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে পৌঁছেছেন। যেখানে তাঁর জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক অভিনীত হয়েছে, সেই স্মৃতি কবির মনে জেগে উঠেছে। তখন সহসা যার সঙ্গে পরিচয় হল, তার প্রভাব সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হল। কিন্তু তারপর—

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে-অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত,
... ...
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্য-লতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তা গুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে ; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে।

জীবন নাট্যের প্রথম অঙ্কের একটি বিশিষ্ট চরিত্র কাদম্বরী দেবীর কথা স্মরণে আসাও বিচিত্র নয়। এই বেদনা কবি আজীবন হৃদয়ে বহন করেছেন।

'পোড়ো বাড়ি' কবিতাটি অতীত প্রেমের বেদনায় আচ্ছন্ন। কবি তাঁর হারানো প্রেমের একটি স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন এখানে। অতীতে কবির

১. জীবনস্মৃতি (১৯৬২), পৃ. ১১৬

জীবনে প্রিয়া-সান্নিধ্য ঘটেছিল, সমগ্র জগৎ কবির কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বহুদিন কেটে গেছে, কবির সেই প্রেম-জীবনের স্মৃতি বিবর্ণ হয়েছে। আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে সেদিনের কথাগুলি দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মত যেন ঝুলে রয়েছে। প্রিয়ার সে দিনটি আজ পোড়ো বাড়ির মত, তার লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে, বিস্মৃতির আগাছায় পথ ভরে গেছে, দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপে তাকে ভূতে-পাওয়া ঘর বলে মনে হচ্ছে।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি চন্দননগরে বাসকালের আর একটি ফসল। জীবনের শুষ্ক গোধূলিতে অতীতের স্মৃতি মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা উপস্থিত করেছে। কবি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু ভিক্ষুকের রিক্ততা তাঁর মধ্যে নেই। বরং তিনি অপ্রাপ্তি-জনিত বেদনার জন্য অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। স্বপ্নের বঞ্চনায় জীবনকে না ভরিয়ে ব্যর্থতাকে কঠোর বীর্যের দ্বারা জয় করবার শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করবেন।

'গীতচ্ছবি' কবিতাটিও চন্দননগরে রচিত। কবি তাঁর মানসী প্রিয়ার সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই সঙ্গীত রহস্যময়, সৌন্দর্যময়। এই সঙ্গীতের সুরে কবি-মন বিশ্ব-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে—

যেখানে বিদ্যুৎ সূক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি—
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি।

'জাগরণ' কবিতাটি একটি বিশিষ্ট কবিতা। এই কবিতাটি সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—বীথিকা-র শেষ কবিতা 'জাগরণ'-এ কবি এই দিনগুলিকে (চন্দননগরের গঙ্গাবাসের কথা) চৈতন্যলোকে আকস্মিক কল্পান্তরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১] দেহে মনে সুপ্তি যখন ভর করে তখন জগৎ মিথ্যা বলে মনে হয়। নিদ্রার শূন্যতায় তখন যে স্বপ্নের সৃষ্টি হয় তাকেও তখন সত্য বলে মনে হয়। সে নিদ্রা ভেঙে চিত্ত যখন এক নূতন পৃথিবীতে জেগে ওঠে তখন সেই জগৎকেই সত্য মনে হয়। স্বপ্নে দেখা নিশ্চিত রূপ তখন অনিশ্চিত মনে হয়—

১. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২), পৃ. ৩৮৫

তাই ভাবি মনে
যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,
সবকিছু অন্য এক অর্থে দেখি,—
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি।
সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে।

কবিতাটি শান্তিনিকেতনে ফিরে রচনা করেন। কবিতাটির একটি তাত্ত্বিক অর্থ থাকলেও কবি বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিলোকে জেগে উঠেছেন। এই স্মৃতিলোক তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ কল্প-অভিজ্ঞতা।

পত্রপুট-এর কয়েকটি কবিতার মধ্যেও কবির অন্তরতম পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন, জীবনে আমরা অপ্রাপণীয়ের বেদনা বহন করে চলেছি। কবির স্বপ্ন, কল্পনা সবই আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর মানসীর স্মৃতি। সন্ধ্যার মায়াবিষ্ট নিবিড় স্তব্ধক্ষণে খোলা ছাদে সেই নারী একা গান করছে, যার মর্মার্থ—যে চলে গেছে তাকে আর ডাকা যাবে না। এখানেও কবির মন স্মৃতিলোকবিহারী।

'বার' সংখ্যক কবিতাটি একটি বিশিষ্ট কবিতা। জীবন-সন্ধ্যায় কবি কৈশোর যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন—

বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়া ঘাটে
শেষ ধাপের কাছটাতে ;
কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে পা ডুবিয়ে দিয়ে।
জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে।

কবিতাটিতে কবির অতীত প্রেমের স্মৃতি ও বেদনা এবং জীবনের অসম্পূর্ণতার স্বীকৃতি আছে। জীবন-সায়াহ্নে কবি মানবেতিহাসের স্রষ্টা নিত্য-মানবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলির মধ্য দিয়ে কবি-মন স্মৃতিলোকে প্রয়াণ করেছে। এখানে সাধারণতঃ অতীত

প্রেমের স্মৃতিই লক্ষ্য করা যায়। কবি যে প্রিয়তমার কথা বলেছেন তিনিই সেই পূরবী-যুগের মৃত্যু-বিচ্ছিন্না প্রিয়া। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিতে কবির ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং অন্য কয়েকটিতে স্মৃতি-চারণার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

'বিদায়-বরণ' কবিতায় বৃষ্টিভেজা প্রহরগুলির সঙ্গে কবি নারীরূপের তুলনা করেছেন। এই প্রহরগুলিকে কবি ধরে রাখতে চেয়েছেন ; কিন্তু এরা অভিমানিনী ঘোমটাপরা নারীর মত মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—

তাদের ধরি ধরি করে মনটা,
ভাবি বেঁধে রাখি লেখায় ;
পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।
এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপসা হয়ে যাওয়া রূপ,
ফিকে হয়ে যাওয়া গন্ধ,
কথা হারিয়ে যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া—
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

কবির মন দিনান্তের সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে ওকে বিদায়বরণ করতে চায়। এই কবিতা এবং 'মিলভাঙা' নামক অপর একটি কবিতা সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—"কবিতা দুটিতে বৌঠানের প্রকাশ স্পষ্ট।"[১] তিনি 'বিদায়বরণ' কবিতার 'ঘোমটা পরা অভিমানিনী'-র চিত্রটি বৌঠানের বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু মন্তব্যটি সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। একটিমাত্র উপমার মধ্য দিয়ে আমরা নিঃসংশয়িতভাবে উক্ত মন্তব্য করতে পারি না। এটি একটি নিছক কাব্যিক উপমা হওয়াও অসম্ভব নয়।

'মিলভাঙা' কবিতাটিতে কবির প্রথম যৌবনের প্রেমস্মৃতির রোমন্থন আছে। বহুলোকের সংসারের মাঝখানে কবি এবং তাঁর প্রেমিকার নিভৃত জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তারপর তাঁদের জীবনের গাঁথনি গেছে ভেঙে, তাঁদের পথ গেছে ভিন্ন হয়ে। তারপর অনেকদিন গত হয়েছে, কিন্তু কবি-

১. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২), পৃ ৪০২

জীবনে সেই 'যৌবনের মায়া'র প্রভাব আজও কাটে নি। বাস্তব জগৎ থেকে কবির যৌবন-সখী হারিয়ে গেলেও কবির মনে তাঁর স্মৃতি অক্ষয়। কবির নূতন জীবনযাত্রার পথে পুরানো প্রেমের স্মৃতি জীবনবীণায় অনুক্ষণ ধ্বনিত হচ্ছে—

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু।
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে ;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ; তা হল কবির ব্যক্তি-জীবনের স্মৃতি। এই কবিতাটি প্রসঙ্গে অনেকেই তাঁর কৈশোর-জীবনের সঙ্গিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। ড. ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন—"কবির কৈশোরের ক্ষণ-সখীর স্মৃতি নিয়ে জল্পনা।"[১] শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও মনে করেছেন কবির অতীত স্মৃতির প্রতিফলন হয়েছে এখানে—"কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়।"[২] এখানে লেখক শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার কথা বলেন নি। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের বৌঠানের স্মৃতির কথা বলেছেন—"শ্যামলীর 'মিলভাঙা' কবিতাটিতে কবিচিত্তের অন্তরঙ্গ কথাটি যেমন কুণ্ঠাহীন, তেমনি বেদনামধুর। শেষসপ্তক-এর 'তেতাল্লিশ' সংখ্যক কবিতায় কবির যে আত্মপরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, শ্যামলী-র 'মিলভাঙা' যেন তারই পুনশ্চ ভাষণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি

১. ড. ক্ষুদিরাম দাস, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৯৬৬), পৃ. ২৮০
২. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ. ৬১৪

ব্র্যাকেট-যোগে কবি তাঁর নতুন বৌঠানের সঙ্গে যেন মুখোমুখি বসে কথা বলছেন। 'মিলভাঙা' কবিতাটিতেও দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বলার ভঙ্গিটি অনুসৃত হয়েছে।"[১] কবিতাটি পড়ে বাস্তবিকই ধারণা হয়, এর মধ্যে অতীত জীবনের স্মৃতি হয়ত মিশে আছে। তবে এটা যে তাঁর বৌঠানের স্মৃতি এমন কথা বোধ হয় নিশ্চিত করে বলা যায় না।

'কনি', 'অমৃত', 'হঠাৎ দেখা', 'দুর্বোধ' প্রভৃতি কাহিনী-কাব্যগুলির মধ্যে কবি প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে স্মৃতি ও বিরহের মধ্যে প্রেমের সার্থকতা—একথাও বলা হয়েছে। 'হঠাৎ দেখা' কবিতায় একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে কবি বলেছেন, যে দিন চলে যায় তা একেবারেই বিলুপ্ত হয় না, স্মৃতির আকাশে তারা বেঁচে থাকে—

বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধোল,
আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।

কবির উত্তর—

রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।

শ্যামলী-র পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থ মূল কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত না হলেও স্মৃতিচিত্রণের দিক দিয়ে এদের কিছু মূল্য আছে। এই কাব্য দুটি হল খাপছাড়া এবং ছড়ার ছবি। এর মধ্যে ছড়ার ছবি গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবির শৈশব-স্মৃতির চিত্ররূপ লক্ষ্য করা যায়। বৃদ্ধ কবি পুনরায় যেন তাঁর বাল্য-জীবনে প্রবেশ করে অতীত স্মৃতির আবেশে বিভোর। 'কাঠের সিঙ্গি', 'প্রবাসে', 'বালক', 'আতার বিচি' প্রভৃতি কবিতায় কবির স্মৃতিচারণা লক্ষ্য করা যায়। ছেলেবেলা গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন—"কিছুকাল হল, একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম ছড়ার ছবি। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশীর প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের।"[২]

১. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২) পৃ ৪০৪

২. রবীন্দ্ররচনাবলী ২৬ খণ্ড (বি. ভা. ১৩৬২), পৃ ৫৮৫

'কাঠের সিঙ্গি' কবিতাটি কবির বাল্যকালের একটি খেলার স্মৃতি। এই প্রসঙ্গে তিনি ছেলেবেলায় বলেছেন—"আরও একটা খেলা ছিল, সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পুজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নইলে পুজো হয় না—

সিঙ্গি মামা কাটুম
আন্দি বোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যামকুড়্‌কুড়্‌
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
পট পট পটাস।"[১]

কবিতাটির মধ্যে বাল্যকালের কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে খেলার চিত্র আছে।

'প্রবাসে' কবিতাটি চিত্রধর্মী। কবিমন চিরচঞ্চল। তাই তিনি কোথাও বেশীদিন অবস্থান করতেন না। কবিতাটি আলমোড়ায় রচিত। এখানে বসে কবির মনে পড়েছে বহুদিন পূর্বের এক প্রবাসের স্মৃতি—

বাক্সো নিলেম ভর্তি করে, নিলেম ঝুলি থলে,
বাংলাদেশের বাইরে গেলেম গঙ্গাপারে চলে।
লোকের মুখে গল্প শুনে গোলাপ খেতের টানে
মনটা গেল এক দৌড়ে গাজিপুরের পানে।

১২৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজিপুরে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করেন। এখানেই তিনি মানসী-র কেন্দ্রীয় কবিতার অনেকগুলি রচনা করেন। উক্ত 'প্রবাসে' কবিতাটিতে গাজিপুরের স্থানিক শোভার বর্ণনা করা হয়েছে বহুদিন পর আবার। মানসী-র কোন কোন কবিতায় ঐ স্থানের বর্ণনা আছে। মানসী কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত।······তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। ······একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, কিন্তু গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের ক্ষেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো

১ রবীন্দ্ররচনাবলী ২৬ খণ্ড (বি. ভা. ১৩৬৫), পৃ ৫৯৪

চলেছে মন্থরগতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলক-চাঁপার ঘন পল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।"[২] এরই পাশাপাশি যদি 'প্রবাসে' কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা যায় তাহলে আমরা হুবহু একই চিত্র দেখতে পাব—

> আটচালা ঘর, ডাহিন দিকে সবজি-বাগানখানা
> শুশ্রূষা পায় সারা দুপুর, জোড়া বলদটানা
> আঁকাবাঁকা কল্‌কলানি করুণ জলের ধারায়—
> চাকার শব্দে অলস প্রহর ঘুমের ভাবে ভারায়।
> ইঁদারাটার কাছে
> বেগনি ফলে তুঁতের শাখা রঙিন হয়ে আছে।
> অনেক দূরে জলের রেখা চরের কূলে কূলে,
> ছবির মতো নৌকো চলে পাল-তোলা মাস্তুলে।
> সাদা ধুলো হাওয়ায় ওড়ে, পথের কিনারায়
> গ্রামটি দেখা যায়।
> খোলার চালের কুটীরগুলি লাগাও গায়ে গায়ে।

'পদ্মায়' কবিতাটিও স্মৃতিচিত্র। প্রথম জীবনে জমিদারীর কার্য পরিচালনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল বাংলাদেশের, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করতে হয়েছিল। সেই সময় তিনি পদ্মার তীরে এবং পদ্মানদীর উপর বোটে দিন কাটিয়েছেন। এই যুগের কাব্যফসল 'সোনার তরী' এবং আর একটি অনবদ্য সৃষ্টিসম্ভার তাঁর ছোট গল্পগুলি। এই কবিতাটিতে তাঁর 'পদ্মা' বাসের স্মৃতি এবং সেখানকার পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠেছে।

'বালক' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনের স্মৃতি। কবি ছেলেবেলা ও জীবনস্মৃতি-তে তাঁর বাল্যকালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তারই প্রতিচ্ছবি

২. মানসী, সূচনা

কবিতাটিতে। জীবন-স্মৃতিতে যে কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ আছে, তাঁর কথা বলেছেন কবিতাটিতে এইভাবে—

কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে ;
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।

জীবনস্মৃতি-তে বলেছেন—"এ হেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্জ্যে আসিয়া দাশু রায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল।"[১]

'আতার বিচি' কবিতাটিও স্মৃতিমূলক। কবিতাটিতে বাল্যরস-প্রধান হয়েছে। এখানে তিনি শিশু বয়সের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। বালক রবীন্দ্রনাথ দোতলার পড়ার ঘরের বারান্দার কোণে জড়ো করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলেন একটি আতার বিচি। অদম্য কৌতূহল ছিল ফলাফলের জন্য। পড়ার চেয়ে ঐ দিকেই ছিল কবির মনোযোগ।

কিন্তু যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড,
কচি কচি পাতার কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড,
আমার পড়ার ত্রুটির জন্যে দায়ী করলেন ওকে,
বুক যেন মোর ফেটে গেল, অশ্রু ঝরল চোখে।

শুধু কবির ক্ষোভ, বালককে এভাবে শাস্তি না দিলে, কিছুদিন পরেই তো চারাটি আপনি শুকিয়ে যেত। এ বিষয়ে জীবনস্মৃতি-র মধ্যেও উল্লেখ আছে—"বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে এ কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত।"[২] কবি ছেলেবেলা গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন—"বারান্দার এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরুবে দেখবার জন্যে মন ছটফট করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষপর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো।"[৩]

১. জীবনস্মৃতি (১৯৬২), পৃ. ১৫
২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১
৩. রবীন্দ্ররচনাবলী ২৬ খণ্ড (বি. ভা. ১৩৬৫), পৃ. ৬০৮

ছড়ার ছবির পরবর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে স্মৃতিচারণা লক্ষ্য করা যায় না। প্রান্তিক-এ মৃত্যুর দ্বারদেশ থেকে ফেরা কবির চৈতন্যলোকে গভীর আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে। প্রৌঢ় কবি শুভ্র নিত্যজ্যোতির সন্ধান পেয়েছেন। সেঁজুতি-তে কবি যে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর মানস করেছেন, সেই প্রদীপই আকাশ-প্রদীপ কাব্যে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে কবি কল্পনার আকাশ-প্রদীপ জ্বালিয়ে অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনের দিকে গোধূলি-ধূসর দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। ছেলেবেলা-য় কবি গদ্যে যে অতীত ধ্যান করেছেন আকাশ-প্রদীপ-এ তারই পদ্যময় প্রকাশ। প্রথম জীবনের ঘটনাগুলিকে কবি আকাশ-প্রদীপ-এর আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে চাইছেন। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। উৎসর্গ-পত্রের এই লেখাটির মধ্যেও কবির কালচেতনা স্পষ্ট। তিনি যেন অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সাঁকো বাঁধতে চাইছেন—"বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়-বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি।"[১]

এই কাব্যে কৈশোর-যৌবনের নানা স্মৃতিকে আকার দিয়ে আঁকা হয়েছে। বোধের অস্পষ্ট চিহ্নগুলি ভাষায় ধরে রাখার প্রয়াস এখানে। কালস্রোতে ভঙ্গুর বস্তু মূর্তিগুলিকে স্মৃতি চিরজীবী করে রাখতে চায় তার দ্বিতীয় রূপসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। কবি মনে করেছেন এই নশ্বর জগতে বস্তুমূর্তি ধ্বংস হয়ে গেলেও কবির কল্পনা-রচিত মূর্তি চিরস্থায়ী। 'ভূমিকা' কবিতায় বলেছেন—

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে।

'যাত্রাপথ' কবিতাটিতে কবির বাল্যকালের বহু পুস্তক পঠনের স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। 'দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে' কবির পুরানো কথা মনে পড়েছে—

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
দিদিমায়ের বালিস-তলায় চাপা।

১. রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩ খণ্ড (বিঃ ভাঃ ১৯৫৮), পৃ ৭২

আলগা মলিন পাতাগুলি দাগী তাহার মলাট,
দিদিমায়ের মতই যেন বলি-পড়া ললাট।
মায়ের ঘরে চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি এক মনে।

'স্কুল-পালানে' কবিতায় কবির স্বীকারোক্তির সঙ্গে জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা-র রবীন্দ্রনাথকে মিলিয়ে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। জীবন-স্মৃতি-তে তিনি স্বীকার করেছেন স্কুলের বাঁধাধরা গণ্ডি তাঁকে বাঁধতে পারে নি—"ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বের চেয়ে আরও অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে শুরু করিলাম।"[১] 'মাস্টারি শাসন দুর্গে' সিঁধ কেটে কবি অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে পুরানো আমড়া গাছের কুঞ্চিত বল্কলে পিঠ রেখে উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে সুবৃহৎ আলস্য ভোগ করতেন। সে বয়সে প্রাণের প্রসার ছিল, সহজ কোন ভাবনার স্তূপ মনের সহজ গতিকে রোধ করে নি। শেষ বয়সের এই কবিতাটিতে স্মৃতির সঙ্গে মননের সুষ্ঠু সংযোগ ঘটেছে—

যেন কী আদিম সাঁকো
ছিল মোর মনে
বিশ্বের অদৃশ্য পথে যাওয়ার আসার প্রয়োজনে।

'ধ্বনি' কবিতাটির মধ্যে কবির বাল্যকালের কল্পনাপ্রবণতার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উন্মেষের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন অনেক সমালোচক ;—" 'ধ্বনি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা উন্মেষের স্তর-পরম্পরা অনুধাবনের পক্ষে দুর্লভ উপকরণ। কবি জীবনের ঊষালগ্নেই প্রতিভা সূত্র বিকাশের স্তরগুলি কেমন করে সকর্মক হয়েছিল, শব্দায়মান এই বসুন্ধরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি-সতর্ক শ্রুতির মাধ্যমে তাঁর কল্পনাপ্রবণ চিত্তকে অসীমতামুখী করে তুলত, এই কবিতায় কবি অলস ভাবনার অনুলেখনচ্ছলে তার কয়েকটি অসামান্য অনুভূতির ইতিহাস বিধৃত করে রেখেছেন।"[২] বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের জীবন কঠোর নিয়ম ও শাসনে বদ্ধ ছিল, বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিল। ফলে বিশ্বপ্রকৃতি ও জনজীবনকে দূর থেকে দেখার জন্য প্রকৃতি ও জীবন সম্বন্ধে একটা রহস্যময় উপলব্ধির সুযোগ

১. জীবনস্মৃতি (১৯৬২), পৃ. ৬০
২. ড. অরুণকুমার বসু, রবীন্দ্রবিচিন্তা (১৩৭৫), পৃ. ৩১৫

হয়েছিল। বাল্যকালে চিলের সুতীক্ষ্ণ স্বর, পাড়ার কুকুরের কোলাহল, ফেরিওয়ালাদের ডাক, রাস্তার সহিসদের ডাক, পাতিহাঁসের স্বর, স্কুলের ঘণ্টা কবির 'সূক্ষ্ম তারে বাঁধা' মনকে আঘাত করত। আজ শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি বৃদ্ধ কবিকে—

কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্র স্থলে,
বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

কবিতাটিতে বালকের অনুভূতির সঙ্গে প্রবীণের ভাবনা যুক্ত হয়ে গেছে। এই ধ্বনি আদি পিতামহীর বিশ্ব-পাঁচালির ছড়ার মত ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া। তাই কবির মন ধ্বনির ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-রহস্যের অদৃশ্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে।

'জল' কবিতাটিতেও কবির বাল্যস্মৃতির ছায়া পড়েছে। কবিতাটির প্রথম দিকে দূর থেকে পুকুরের জলকে দেখে কবি মনে মনে অসম্ভব কল্পনার সাধ মিটিয়েছেন! যারা জলের সঙ্গে অনায়াসে পরিচিত হতে পেরেছে তাদের কবি স্বাধীন মনে করেছেন। কবিতাটিতে কবি যে পুকুর ও বৃদ্ধ বটের উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় জীবনস্মৃতি-র মধ্যে—"জানালার নিচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডি বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম।......পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল।"[১] উক্ত কবিতাটিতেও দেখা যায় কবি সেই বট ও পুকুরের সঙ্গে মানসিক আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন—

পূর্বতীরে বৃদ্ধ বট প্রাচীন প্রহরী
গ্রন্থিল শিকড়গুলো কোথায় পাঠাত নিরালোকে
যেত পাতালের নাগলোকে।

১. জীবনস্মৃতি (১৯৬২), পৃ. ৭

সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,

আকাশ-প্রদীপ-এর কবিতাগুলিতে কবির বাল্যজীবনের স্মৃতি অতি অপরূপ রূপ লাভ করেছে। বৌঠান কাদম্বরী দেবী কবির বাল্য-কৈশোরের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিও আকাশ-প্রদীপ-এ অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। এছাড়াও বাংলার প্রাচীন ছড়া ও পাঁচালীগুলি রবীন্দ্রনাথের শৈশবকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পুরানো ছড়াকে অবলম্বন করে লেখা দুটি কবিতা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। দুটিতেই শৈশবস্মৃতি ও বার্ধক্যের বিষণ্ণতার মিশ্রণ। এই দুটি কবিতা হল 'বধূ' এবং 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'।

আটাত্তর বছর বয়সে লেখা 'বধূ' কবিতাটির সঙ্গে কবির বাল্যকালের একটি ঘটনার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কবি জীবনস্মৃতি-তে বলেছেন—"কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মত বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটা ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল।"[১] কবিতাটিতে শৈশব অভিজ্ঞতা প্রৌঢ় কবির লেখনীতে গাম্ভীর্যময় ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে—

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে—
ভাবখানা মনে আছে—"বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।"
বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে

ছন্দের লাগাল দোল আধোজাগা কল্পনার শিহর দোলায়, তারপর 'সেকাল মিলাল'। বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে যে বধূ-আগমন-গাথা বেজেছে, সেদিনও গত হল। একদিন অকস্মাৎ কোন মায়াময়ীর স্পর্শে

১. জীবনস্মৃতি (১৩৬২), পৃ. ৩৯

'রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ', 'নারীমন্ত্র-আগমনী' গানের মধ্য দিয়ে কবি বিশ্বরহস্যের মূলে প্রবেশ করেছেন। কল্পনার এই রহস্যময়তা শেষ পর্যায়ের কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্য, কৈশোর ও পরিণত বয়সের নারী-চেতনার ইঙ্গিত আছে কবিতাটিতে। কবিতাটির শেষ অংশে কবির প্রশ্নের যে উত্তর নারী দিয়েছে তাতে কবিতাটি বাল্যস্মৃতি ও ছড়ার লোক থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে—

ইঙ্গিতে জানায়েছিল, 'আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে
অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
ফিরিছে সে চির-পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।'

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটিতেও ছড়ার প্রভাব আছে। 'ঝাপসা স্মৃতি'র থেকে কবির মনে আছে—

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

সময় এগিয়ে গেছে। তাই এ ছড়ার ব্যথার মূল্য কমে গেছে এবং ছবিটা ফিকে হয়ে গেছে। তাই কবি স্বীকার করেছেন—

বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয় পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জনার মতো!

কবিতাটির শেষাংশে এই পুরানো ছড়াটির সঙ্গে একটি সাম্প্রতিক ঘটনাকে যুক্ত করা হয়েছে। হঠাৎ অন্ধ কলুবুড়ির কান্নায় জানা গেল তার নাতনিটিকে গাঁয়ের কোন খুনী চুরি করে নিয়ে গেছে—

বুক ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।

শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহের পর নববধূর আবির্ভাবে অন্তঃপুরের রহস্য ও আকর্ষণ দুর্নিবার হয়েছিল। সেই রহস্যলোকে প্রবেশের জন্য অনুক্ষণ কবির প্রয়াস আকাশ-প্রদীপ-এর 'কাঁচা আম' কবিতাটিতে প্রকাশ করেছেন—

তিনটে কাঁচা আম পড়েছিল গাছতলায়
চৈত্রমাসের সকালে মৃদু রোদ্দুরে।

কিন্তু কবি অস্থির ব্যগ্রতা অনুভব করলেন না আমগুলি কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য, কারণ বদল হয়েছে পালের হাওয়া। এরপর এই তিনটি আমকে অবলম্বন করে কবির মন যাত্রা করেছে অতীতের দিকে—

গোড়াকার কথাটা বলি।
আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে,
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে।

কবির কাছে সেই বালিকা-বধূ ছিল বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা। তার ডুরে শাড়ি কবির মনে আবর্ত সৃষ্টি করত। তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছেন তার সঙ্গে ভাব জমাতে। এই দুজনের মধ্যে আলাপের সেতু রচনা করেছিল এই কাঁচা আম। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈশব-উন্মাদনা হ্রাস পেতে থাকে। অতীত থেকে কবির মন বর্তমানে ফিরে এসেছে বিষণ্ন স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে—

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে,
খুঁজে পাই নি।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

শ্যামা কবিতাটিও বৌঠানের স্মৃতিতে পূর্ণ। এ কবিতা কিশোর প্রেমের রাবীন্দ্রিক ইতিহাস। কৈশোরের প্রথম নারী-চেতনার কাব্যরূপ এখানে। শ্যামা ছিল এক নব-কিশোরী এবং 'ছিল তার কাছাকাছি বয়স আমার'। ভীরু সলজ্জ বালক কবি এই কিশোরীকে কাছ থেকে দেখতে দ্বিধাবোধ করতেন। এই 'শ্যামা' যেন বালকের স্বপ্নের কিনারে মায়া দিয়ে গড়া দেহ নিয়ে বাস করত। তারপর জানাশোনা যখন বাধাহীন হল, তখন—

একদিন নিয়ে তার ডাক নাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা বিনিময়।

শ্লেষে কৌতুকে ক্রমশ উভয়ের পরিচয় হল নিবিড়তর। কিন্তু—

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না-পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।

জীবনপ্রান্তে কবি শৈশব কৈশোরের পুলকে-বিষাদে-মেশা দিনগুলির নবরূপায়ণ করেছেন তাঁর কল্পনায়।

'জানা-অজানা' কবিতায় ঘরের পুরানো আসবাবের মধ্য দিয়ে কবি অতীতের স্পর্শ অনুভব করেছেন, যদিও তারা নূতন কালের কাছে মূল্যহীন, অতীতের ছায়া মাত্র। অতীত-বর্তমানের মধ্যে 'জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো'কে উপলব্ধি করেছেন কবি। যদিও তিনি কবিতার শেষে বলেছেন—

অতীতের দিনগুলি
মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তার
নূতনের মাঝে পথহারা;

কবিতাটি শুধুমাত্র অতীতের স্মৃতিমূলক বলে মনে হলেও সমালোচক এর মধ্য থেকে কবির ব্যক্তিগত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন—

টেবিলে হেলানো ক্যালেণ্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ।...

এই অংশটি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—" 'জানা-অজানা' কবিতায় একটি সংকেত লুকিয়ে আছে। সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ একবারই মাত্র এই সংকেতটি ব্যবহার করেছেন।" সংকেতটি হল কবিতাটিতে 'আটই তারিখ'-এর উল্লেখ। কারণ ১২৯১ সালের আটই বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের নূতন বৌঠানের মৃত্যু হয়েছিল। এই মন্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। কারণ এই বৌঠানের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছিল। তাই তাঁর প্রথম জীবনের স্মৃতি পরবর্তী জীবনেও উজ্জ্বল হয়ে জেগে ছিল। আর দ্বিতীয়তঃ বলা যায় শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মন অতীতের দিকে তাঁর গোধূলি-ধূসর দৃষ্টি মেলে ধরে ছিল এবং আকাশ-প্রদীপ কাব্যের কয়েকটি কবিতায় বৌঠানের স্মৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। তাই এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে সমালোচকের উক্ত মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়।

কবি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বপ্নময় শৈশব কৈশোরের হারানো দিনগুলির দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করেছেন। 'পঞ্চমী' কবিতায় বলেছেন—

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি—
দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।

ভুলের দুঃখে ভরা পুরানো স্মৃতিগুলি কবির আবার নূতন করে মনে আনার মধ্যে একটি সহজ সম্ভোগের আনন্দ আছে। দীর্ঘপথ পরিক্রমা সেরে কবি কৌতুকের দৃষ্টিতে অতীতকে দেখেছেন। ফেলে আসা অতীতকে কল্পনার রঙ মিশিয়ে মধুর করে তুলেছেন।

শেষ পর্যায়ের কাব্যে কবির অন্যান্য অনুভূতির সঙ্গে মৃত্যুচেতনা চলেছে পাশাপাশি। তাই মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে কবি অতীতকে জীবনের উজ্জ্বল পটভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। নবজাতক কাব্যে ব্যক্তিগত জীবন-পর্যালোচনামূলক কবিতাগুলির মধ্যেও স্মৃতিরূপায়ণ দেখতে পাওয়া যাবে।

'শেষ দৃষ্টি' কবিতায় গোধূলি বেলায় আঁখির শেষদৃষ্টির দিনে অতীতের ফাল্গুনদিনের দান নিরূপণ করেছেন। অতীতের রঙিন স্মৃতি তাঁর বর্তমানের

ধূসর প্রহরকে রঙের স্পর্শ দিয়েছে। অতীতের বেদনা ও আনন্দের মধ্যে কবি চিরন্তন মাধুর্য ও অনির্বচনীয়তা অনুভব করেছেন—

যা গিয়েছে তার অধরা রূপের
অলখ পরশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর,
দিক্ সীমানার পারের সুদূর
কালের অতীত ভাষার অতীত
শুনায় দৈববাণী ॥

'শেষ-হিসাব' কবিতার মধ্যে কবির অতীত পথ পরিক্রমার ইতিবৃত্ত। কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসছে; তাই জীবনের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ করেছেন, এরাই তাঁকে পথ চলার শক্তি ও উৎসাহ জুগিয়েছে।

'শেষবেলা' কবিতায় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত কবি অতীত-চারণার মাধ্যমে বিগত জীবনকে স্মরণ করেছেন। কবি নিজের জীবনের সঙ্গে একটি বৃক্ষের তুলনা করেছেন। আসন্ন সমাপ্তির বেদনা কবিতাটিকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। কবির জীবনরূপী বৃক্ষটি আজ জীর্ণ-শীর্ণ। মানুষের নয়ন-মনের তৃপ্তি সে আর বিধান করতে পারে না। কিন্তু—

একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা
নানা রঙ করা।

জীবনের সেই লীলাচাঞ্চল্যের কাল আজ অবসিত। কিন্তু জীবনের রস মনের অভ্যন্তরে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছে। জীবনে আজ তাই রঙ লেগেছে প্রাবীণ্যের—

যে অতীত পরিচিত সে নূতন বেশে
সাজ-বদলের কাজে ভিতরে লুকালো—
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো।
গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার
প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার।
মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে তারা,
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা।

গোধূলির বর্ণাঢ্যতা রাত্রির অন্ধকারে গাঢ়তা লাভ করে; রাত্রিতে তারকা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। তেমনি জীবনের গোধূলিতে মৃত্যুরাত্রির সামনে কবির স্মৃতিগুলিও তারকার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'শেষ কথা' কবিতাটিতেও কবির মৃত্যুর দ্বারদেশে বিগত জীবনের স্মৃতি রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়।—

চিনে নিই, এ লীলার শেষপরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়ে।

সানাই রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রেম-কাব্য। এই কাব্যের কবিতাগুলি তাঁর 'শেষ বসন্তের ফসল'। কবিতাগুলি কবির অন্তরঙ্গ অনুরাগের পরিচয় বহন করছে। এই কাব্যের সুর ক্ষীণ বিদায়ী বিষণ্ণতার সুর এবং কবিতাগুলি অতীতমুখী। অনেক পুরানো কথা এখানে নূতনভাবে পরিবেষণ করা হয়েছে বিদায় ক্ষণের বেদনায়। পূরবী যুগের সেই স্মৃতিময় করুণ প্রেম আবার নূতনভাবে ধরা পড়েছে সানাই কাব্যে। অধিকাংশ কবিতাই দূরবর্তিনী লীলাসঙ্গিনীর স্মৃতি এবং কৈশোর যৌবনের প্রেমস্মৃতির স্মারক। এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতা গানের ধরনে লেখা। আজীবন কাব্যে যে লীলাসঙ্গিনীর ধ্যান করেছেন কবি, এবার সুরের মধ্যে তাকে ধরতে চাইলেন। এই সমস্ত কবিতায় একটি অচরিতার্থতার বেদনা বার বারই বেজে উঠেছে; কারণ জীবনের গোধূলি লগ্ন উপস্থিত এবং অতীত প্রেমের স্মৃতি ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই কাব্যের নামকরণ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—"মানসীর উদ্দেশ্যে তাঁর এই শেষ 'পুষ্পাঞ্জলি'র 'সানাই' নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে কবি-মানসে বাঁশি বা সানাই বা নহবতের আবেদন বার বার বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে।"[১] এই মন্তব্যটি সর্বতোভাবে স্বীকার করা যায় না। কাদম্বরী দেবীর বিচ্ছেদজনিত বেদনাবোধ তাঁর প্রেম-স্মৃতিমূলক কবিতাগুলির কিছু অংশ অধিকার করে থাকলেও সানাই কাব্যের স্মৃতিচিত্রণ বিগত দিনের কোন বিশিষ্ট স্মৃতি নয়। এখানে স্মৃতি একটা অস্পষ্ট-প্রায় অনুভূতি বা আবেগের পরিমণ্ডল রচনা করেছে। একটি অজানা স্মৃতিলোক-শায়িতা নায়িকার উদ্দেশ্যে বেদনা ও বিচ্ছেদবিরহ কবিতাগুলির প্রেরণা।

১. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২), পৃ ৪২৮

কাব্যের প্রথম কবিতাতেই, 'দূরের গান'-এ বলেছেন তাঁর দৃষ্টি সুদূরের দিকে প্রসারিত। তাঁর কানে ওপারের আহ্বান এসে পৌঁছেছে। তিনি নিকটতমাকে আজ উপলব্ধি করছেন 'অজানার অতিদূর পারে'। সেই প্রেমিকার উদ্দেশ্যেই তাঁর অন্বেষণ—

বাসা হারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

'আসা-যাওয়া' কবিতাটি একটি হ্রস্বায়তন নিটোল লিরিক কবিতা। জীবনে ভালবাসার আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের পর সেই আগমনের স্মৃতি কবিকে ব্যথিত করেছে। কারণ ভালবাসার আবির্ভাব-মুহূর্তটিকে কবি যথাযোগ্য আহ্বান জানান নি—

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন—
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

'জ্যোতির্বাষ্প' কবিতায় কবি সংসারের শত সহস্রের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে জেগে থাকা প্রিয়ার স্মৃতি অনুধ্যান করেছেন। কবির জীবনে এই মানসীর আবির্ভাবকে একটি মহান ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন কবি।—

অনন্তের সমুদ্র মন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।
উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি
আপনার চারিদিকে টানি।
নীহারিকা রহে যথা কেন্দ্রে তার নক্ষত্রেরে ঘেরি,
জ্যোতির্ময় বাষ্প-মাঝে দূরবিন্দু তারাটিরে হেরি।

এই 'দূরবিন্দু' তারার উল্লেখ রবীন্দ্রকাব্যে নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আকাশ-প্রদীপ-এর স্মৃতি-চিত্রায়ণের মধ্যেও এই তারকার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। ভূমিকার কবিতাটিতে বলেছেন—

সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।

এই কবিতাটির সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"এই কবিতাটি পূরবী-র 'তারা' কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—'ওই কি আমার হবে আপন তারা'। আজ জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া প্রথম জীবন-প্রত্যুষের ধ্রুবতারার কথা কি মনে হইতেছে?"[১] এই তারার উপমা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর 'উপহার' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এখানেও কবি-মনে প্রিয়া তারার ন্যায় বিরাজিতা—

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি—
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—"বলাই বাহুল্য কবিতাটি নতুন বৌঠানকে উৎসর্গিত। সেই তারাই তাঁর জীবন-সন্ধ্যার শেষ তারা রূপে দেখা দিয়েছে।"[২]

এরপর এই কাব্যের কতকগুলি কবিতার নাম করতে হয় যেগুলি একই দিনে এবং একই ভাবাদর্শে রচিত। কবিতাগুলি হল—'অনাবৃষ্টি', 'নতুন রঙ', 'গানের খেয়া', 'অধরা' এবং 'ব্যথিতা'। প্রতিটি কবিতাই বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর এবং অপ্রাপ্তিজনিত দীর্ঘশ্বাসে মুখর।

'অনাবৃষ্টি' কবিতায় জীবন-গোধূলিতে প্রেমের গভীর অচরিতার্থতার বেদনা কবির মনকে ব্যাকুল করেছে—

প্রাণের সাধন কবে নিবেদন
করেছি চরণতলে,
অভিষেক তার হল না তোমার
করুণ নয়নজলে।

---

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড (১৩৭১), পৃ. ১৫৯

২. শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (১৯৬২), পৃ. ৪১৬

এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাতেই সুদূরবর্তিনী প্রিয়তমার স্মৃতি। অতীতের প্রেমস্মৃতি যেন নূতন মায়ামোহ রচনা করেছে। অনেক হারানো সুর হারানো ব্যথা ফিরে এসেছে। এই প্রৌঢ় ঋতুর কাব্যে আবার পুরানো রঙ দেখা দিয়েছে 'নতুন রঙ' কবিতায়—

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

'গানের খেয়া' কবিতাতেও 'অতীত কালের মূরতি এসেছে / নতুন কালের বেশে'। 'অধরা' কবিতাতে কবি 'গত ফসলের পলাশের রাঙিমারে' কাব্য-রূপ দিয়েছেন। 'মানসী' কবিতাটিতে পদ্মাবক্ষে বাসের অতীত স্মৃতি প্রতিফলিত হয়েছে—

তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ-'পরে।
বামে বালুচরে
সর্বশূন্য শুভ্রতার না পাই অবধি।

কিন্তু এই কবিতাটির শেষাংশে কবির যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা সমগ্র শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। স্মৃতিচারণায় অতীতকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই আসক্তি দেখা যায়; কিন্তু তাঁর এই আসক্তি গভীর অনাসক্তিজনিত। তাই কবি এই ধরনের কবিতায় বাইরের দিক থেকে একটি বৈরাগ্যের ভাব দেখিয়েছেন—

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।
... ...
শুধু একখানি
সূত্রচ্ছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে।

'মায়া' কবিতায় কবির স্মৃতির বিলাস। জীবন-সায়াহ্নে বাস্তবে প্রিয়ার আবির্ভাব অপেক্ষা স্মৃতিলোকচারিণী প্রিয়া কবির অধিক কাম্য। 'যুগান্তরের প্রিয়া'র স্মৃতি কবির মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। কবি কল্পনায় প্রিয়াকে নানারূপে আস্বাদন করেন। কবির আশঙ্কা জীবন-সন্ধ্যায় প্রিয়ার আবির্ভাব হলে বাস্তব ও কল্পনার মিল হবে না—

যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোয়, তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।

প্রিয়ার সঙ্গে কবির সম্পর্ক শুধু এ জীবনের নয়, কালের অতীত প্রান্তে কোন এক অরূপলোকে সঙ্গীতের পথে উভয়ের পরিচয় হয়েছিল। 'গানের স্মৃতি' কবিতায় কবি সেই অনন্তকালের প্রিয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন—

··· আজো এই অন্ধকারে জ্বালো
সেই সায়াহ্নের স্মৃতি, যে নিভৃতে নক্ষত্রসভায়
নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়—
যে ক্ষণে তোমার স্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি
অনন্তের পথ-চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী।

যৌবনে কবি যে প্রিয়াকে অনেকের মাঝে পেয়ে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি, আজ যৌবন-মধ্যাহ্নের পালা শেষে যখন সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা হল তখন কবি নিজের মাঝে তাকে অনুভব করলেন। 'অবশেষে' কবিতায়—

একেলার ঘরে তাকের একা
চেয়ে দেখি, কথা কই চুপে চুপে,
পাই তারে না পাওয়ার রূপে।

সানাই-এর অধিকাংশ কবিতাতেই কবির অতীত প্রেমকে ঘিরে রোমান্টিক মনোভঙ্গীর পরিচয়। এই ধরনের কবিতাগুলির সঙ্গে কবির প্রথম যুগের মধুর প্রেমের কবিতারই সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ নারীকে যেমন ব্যক্তি-সীমার মধ্যে অনুভব করেছেন তেমনি তাকে অন্যরূপে সমস্ত জাগতিক সম্পর্কের উর্ধ্বে বিশ্বময়ী রূপে কল্পনা করেছেন। প্রথম যুগে তাঁর এই জাতীয় কবিতা হল 'মানস-সুন্দরী', 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা' ইত্যাদি। সানাই

কাব্যেও এই সর্ববন্ধনমুক্ত নারীর স্মৃতি-সম্বলিত দুটি কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এগুলি হল 'বিপ্লব' এবং 'শেষ-অভিসার'।

'বিপ্লব' কবিতাটিতে কবি মানসীর রুদ্রাণী রূপের কল্পনা করেছেন। এই রূপের মধ্যে জীবন-গোধূলিতে তিনি আবার জীবনদেবতার সন্ধান পেয়েছেন। মহাকালের তাণ্ডবনৃত্যে সেই সুন্দরী নর্তকীর কিঙ্কিণী ছিন্ন হয়েছে, সীমন্তের সাঁথি এবং কণ্ঠহার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—

নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে মুগ্ধ-হস্তে-গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হত রসের প্লাবন
মত্ততার শেষপালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।

'শেষ অভিসার' কবিতায় ঈশানকোণে মসীকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ এবং আসন্ন ঝড়ের বেগের মধ্য দিয়েই তার অভিসার—

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে আর-একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
... ...
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

সানাই-এর পরের কাব্যমণ্ডলটিতে রবীন্দ্রনাথের এক নবতর পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় হয়েছে। এই কাব্যগুলিতে কবির চিত্ত 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি'র ধ্যানে নিবদ্ধ। তবু কবিকে 'মর্ত্যের মধুরতম আসক্তি' ঘিরে ছিল। এই কাব্যগুলি হল রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা। এই কাব্যগুলিরও স্থানে স্থানে কবির স্মৃতিচারণা লক্ষ্য করা যায়।

রোগশয্যায় কাব্যের ৩ সংখ্যক কবিতায় জীবনের শেষবেলায় কবি তাদেরই স্মরণ করেছেন যাদের আবির্ভাব হয়েছিল কবির জীবন-প্রভাতে। সন্ধ্যার ছায়ার মত তারা মিলিয়ে গিয়েছে। বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব না থাকলেও কবির মনে তারা ভীড় করে আছে

আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে ;
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জনের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।

আরোগ্য-এর '১৩' সংখ্যক কবিতায় প্রথম জীবনের প্রেমের স্মৃতি ও শেষ জীবনের প্রেমের রূপ বর্ণনা করেছেন। তরুণ বয়সে ভালবাসার আবির্ভাবে কবির মনে এক বন্ধনহীন উল্লাস সৃষ্টি হয়েছিল। আজ প্রৌঢ় বয়সে প্রেমের সেই ধৈর্যহারা চঞ্চল রূপটি পরিবর্তিত হয়ে স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য লাভ করেছে—

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
... ...
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক কবি। তাই পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের ক্ষণেও প্রাকৃতিক দৃশ্য বিশেষতঃ অতীতে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ আজীবন বহন করেছেন। গাজিপুর, পদ্মাতীর ও বোলপুরের স্মৃতিকে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো আরোগ্য-এর কবিতায় তুলে ধরেছেন। '৩' সংখ্যক কবিতায়—

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।

'৪' সংখ্যক কবিতায় কবির মর্ত্য মমতা ও প্রকৃতি প্রেমের অপূর্ব প্রকাশ। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে কবি যে স্মৃতি তাঁর চেতনার গভীরে ছিল তাই প্রকাশ করেছেন—

পথে চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে ;
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

কবিতাটির একস্থানে গাজিপুরের স্মৃতি ছায়াপাত করেছে। কবির গাজিপুরে অবস্থান সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানেও সেই গাজিপুরের চিত্র—

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষ প্রান্তে বাসা.
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নিচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
... ...
ইঁদারায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলুকুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল কাঁকন পরা হাতে।

'৮' সংখ্যক কবিতায় 'সংসারের প্রান্ত জানালায়' বসে কবির চোখে নানা ছবি ভেসে ওঠে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরকে তুলে ধরেছেন—

দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।

জন্মদিনে-র '১৯' সংখ্যক কবিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাল্য-স্মৃতির যোগ আছে। পরিণত বয়সে জীবনের অসংখ্য জটিলতার মধ্যে বাল্যকালের সেই অনাবিল

শান্তি ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কথা মনে করেছেন। কবিতাটির মধ্যে বর্ণিত নীলকুঠির উল্লেখ আছে ছেলেবেলা-য়।

পুরাতন নীলকুঠি দোতলার পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত
... ...
সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে

টাট্টু ঘোড়া চড়ি
রথতলা মাঠে গিয়ে দুর্দাম ছুটাও তড়বড়ি.
... ...
জবা নিয়ে, গাঁদা নিয়ে নিঙাড়িয়া রস
মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত, সে লেখার যশ
আপন মর্মের মাঝে হয়েছে রঙিন—

সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে
তার কাছ থেকে
বাঘ শিকারের গল্প নিস্তব্ধ সে ছাতের উপর,
মনে হত, সংসারের সব চেয়ে আশ্চর্য খবর।

রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা-য় লিখেছেন—"পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ, ...শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টুঘোড়া।...

পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে।......ওস্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ।...বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে লাগাত গুলি।...

শিলাইদহে মালী ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে"।[১]

কবিতাটিতে প্রত্যক্ষত বাল্যস্মৃতি। অপরাহ্নের ক্ষীণ আলোতে এবং মননের গভীরতার মধ্যে বাল্যস্মৃতির অপূর্ব রূপায়ণ এটি।

রবীন্দ্ররচনাবলী ২৬ খণ্ড (বি. ভা.), পৃ. ৬১৮, ৬২০, ৬২২

পূরবী কাব্য রচনা কালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায় 'ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো' নাম্নী এক বিদেশী মহিলার আলাপ হয়। এই মহিলা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাই জীবনের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে স্মৃতি-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন শেষ লেখা গ্রন্থের '৪' এবং '৫' সংখ্যক কবিতায়। এই নারী কবিকে একটি 'আরাম-চেয়ার' প্রদান করেছিলেন। এই সম্বন্ধে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী লিখেছেন—"সেই চৌকিখানি নানা দেশ ঘুরে অবশেষে উত্তরায়ণে পৌঁছেছিল। অনেক দিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেন নি। আমাদের কাছেই পড়ে ছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ওই চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন। সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন।"[১] পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার প্রায় চার মাস আগে তিনি ঐ আসন ও আসনদাত্রীকে স্মরণ করলেন কবিতা দুটিতে। '৪' সংখ্যক কবিতায়—

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনা লেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।
শূন্যতার বাণী ওঠে, করুণায় ভরা,
মর্ম তার নাহি যায় ধরা।

— ... ...

চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর,
শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

'৫' সংখ্যক কবিতাটিতেও বিদেশিনীকে স্মরণ করেছেন—

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

১. শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর, নির্বাণ (১ম সং), পৃ. ৪০

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথ যতই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন ততই তাঁর অতীত জীবন তাঁকে আকর্ষণ করেছে। তবে এই স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শই তিনি মানতে চেয়েছেন। বাল্য-কৈশোর যৌবনের অনেক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, প্রেম-স্মৃতি তাঁর এই সময়ের কাব্যকে অধিকার করলেও তাঁর মন ছিল নির্লিপ্ত উদাসীন। শেষ পর্যায়ের কবিতায় স্মৃতিচারণার মধ্যে একটি অপরূপ স্নিগ্ধ মাধুর্য ধরা পড়ে। এখানে কবির ইহকাল ও চিরকালের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস খানিকটা বিষণ্ণতায় রঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমভাবনা ও শেষপর্যায়

প্রেম কবিহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপন। কাব্য-সৃষ্টির উষালগ্নেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম সাধনার সূচনা। ছবি ও গান গ্রন্থের 'রাহুর প্রেম' কবিতাটির মধ্যেই তরুণ রবীন্দ্রনাথ আত্মকেন্দ্রাভিমুখী ভোগ-প্রবৃত্তিই যে প্রকৃত প্রেম নয় এই ধারণার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর প্রেমভাবনা তাই কামনার সংকীর্ণতা ও আবিলতামুক্ত। কি প্রথম যুগের কবিতা, কি শেষের যুগের কবিতা সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের প্রেমকবিতা বিরহ-বেদনায় ব্যথিত। "কবির প্রিয়া তাই মিলন রজনীর উৎসব বাসরের শয্যাসঙ্গিনী নয়—বিরহ-রজনীর অশ্রুময়ী প্রেম-প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথের প্রেয়সী ধরা দিয়াও ধরা দেন না; তাঁহার মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের সুরটি ব্যঞ্জনার মত জাগিয়া থাকে।"[১] কবির প্রেমকবিতার কেন্দ্রবর্তিনী নারী মৃত্যুর দ্বারা বিচ্ছিন্না। তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় তিনি ভোগের উপচার সাজান নি—ব্যথার আরতি করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম সম্পর্কিত ধারণা তাঁর প্রথম যুগের কড়ি ও কোমল-এর মধ্যেই পরিণত প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই আমরা দেখি তাঁর ভোগাসক্তির উদ্বর্তনের প্রবণতা। মর্ত্য প্রেমের উর্ধ্বায়নের বাসনা ও দেহ-সৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এই দুই-এর সন্ধিস্থলে কবিমানসের দ্বন্দ্ব কড়ি ও কোমল-এ। অনেক সুধীজন এখানে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখেছেন, আবার অনেকে কোন কোন কবিতাতে কবির দেহের মাধুর্য-সম্ভোগ, দেহের মধ্য দিয়েই দেহোত্তীর্ণ বিশুদ্ধ প্রেমের উপলব্ধির কথা বলেছেন। তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলিতে আমরা এই বিশুদ্ধ প্রেমের জয় ঘোষণাই দেখব। তাই সমালোচকের মতে—"অবিমিশ্র 'প্রেমের কবিতা' বলতে কেউ কেউ যে দেহ-মনস্কতার দিকটি বুঝে থাকেন, সে অভিমুখিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে সত্যিই বিরল।"[২] এই কড়ি ও কোমল পর্বেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে) রবীন্দ্রনাথ ভালবাসার সত্যকে নূতনভাবে অনুভব করেন। আজীবন

---

১. শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ৪৭

২. ড. হরপ্রসাদ মিত্র, রবীন্দ্র সাহিত্যপাঠ (১৩৭০), পৃ. ২১৭

তিনি এই ঘটনাটিকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। এই মৃত্যুর ছায়াময়ী বিষণ্নতা তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রেমের কবিতার অনেকস্থানে চকিত ছায়াপাত করেছে। কবির প্রথম যুগের কাব্য থেকেই কবির অন্তরলোকে একটি নৈর্ব্যক্তিক মানসী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। কড়ি ও কোমল-এর যুগের এই নৈর্ব্যক্তিক বোধ মানসী পরবর্তী সোনার তরী-চিত্রা-র যুগে কবি-মানস-বিহারিণী বিশুদ্ধ প্রেম ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

মানসী-তে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিশিষ্ট প্রকাশ। এখানে কবি আশা, ভাষা এবং ভালবাসা দিয়ে যে মানসী প্রতিমা গড়ে তুললেন সেই মানসীও বিরহবিচ্ছিন্না। এখানে কবি অনুভব করেছেন প্রেম অনন্ত। দেহ-আত্মার লীলায় যে খণ্ডপ্রেমের প্রকাশ তাতে প্রেমের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করা যায় না। এই প্রেম ব্যক্তি-সীমার সংকীর্ণতা-মুক্ত বস্তুনিরপেক্ষ ভাবলোকে উত্তীর্ণ—

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

—মানসী, 'নিষ্ফল কামনা'

মানসী-র প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছেন—"আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে। সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা।"[১]

পরবর্তী সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্য অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। সোনার তরী-তে সমগ্র প্রকৃতি এবং মানবের সৌন্দর্য কবির কল্পনায় নারী-মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। 'মানস-সুন্দরী' কবিতায় সেই আদর্শ সৌন্দর্যের আধার যে নারী তাকে জীবনে অনুভব করতে চাইছেন—

কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে?

এখানেও আমরা কবির পুরাতন মৃত্যু-শোকের বিষণ্নতা লক্ষ্য করতে পারি। এখানেও প্রিয়া মিলনের বন্ধন ছিন্ন করে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত।

১. প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র, সবুজপত্র : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

চিত্রা-য় প্রেমিকা এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী এক হয়ে গেছে। এখানে প্রেম বস্তু-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়জ ভোগের অতীত ভাবলোক-বিহারী।

এর পরবর্তী যুগে কল্পনা কাব্যে কিছু প্রেম-কবিতার সমাবেশ হয়েছে। তবে এখানে প্রেম-কবিতার বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন ভারতীয় কবি ও শিল্পীর কাব্য ও সৌন্দর্যের প্রেরণা। মানবের প্রেমকে কবি অতীতের মধ্যে স্থাপিত করে সর্বকালের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি সর্বজনীন ঐক্য স্থাপন করেছেন। কল্পনার প্রেম-কবিতার নায়িকা জন্মান্তরের প্রেমিকা, 'মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়া'। এখানেও নায়িকা চির-বিরহ-বিচ্ছিন্না। 'মদন ভস্মের পূর্বে', 'মদন ভস্মের পরে', 'ভ্রষ্টলগ্ন' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমকে আদর্শায়িত করা হয়েছে। "যে কোনও প্রেম কবিতাতেই কবি আপনাকে এই মর্ত্য পৃথিবীর চিরচিচ্ছিন্নতার উপকূলে স্থাপন করেছেন, আর তাঁর প্রেমিকা অনন্তকালের পটে আসীনা, মৃত্যুর দ্বারা ব্যবচ্ছিন্না, স্মৃতি-শায়িতা অসীম সৌন্দযে নিমগনা হলেও একাকিনী।"[১]

পরবর্তী যুগে নৈবেদ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্‌রসলীলা আস্বাদন এবং আত্মনিবেদনের পর্ব। এই যুগ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্যন্ত প্রসারিত। মধ্যবর্তী ক্ষণিকা কাব্যে 'শুধু অকারণ পুলকে' জীবনের ক্ষণিক মুহূর্তের জয়গান। যদিও এ কাব্যের বাহ্যিক চালটা হালকা, কিন্তু অন্তর্নিহিত বেদনার আভাস গোপন থাকে না। কবির অন্তর্জীবনের পরিবর্তন হয়েছে পরবর্তী কালে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমান্তরালে চলেছে মানবজীবন। তাই কবি বলাকা এবং পলাতকা-য় বাস্তব জগতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আক্ষরিক অর্থে প্রেম-কবিতা এই কাব্যগুলিতে পাওয়া যায় না।

মোটামুটি পূরবী থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ের সূত্রপাত। এই কাব্য থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতার একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যায়। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রেম সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিলোকচারী। এই প্রেমে খানিকটা সময়ের দূরত্ব দিয়ে নিরীক্ষা চোখে পড়ে। প্রথম যুগের কাব্যে সাক্ষাৎ রূপ দর্শনের আনন্দ ও সঙ্গসুখ। শেষের যুগে শুধুমাত্র স্মৃতিচারণা। উত্তর জীবনের এই স্মৃতিতেই প্রথম জীবনের প্রেমের যথার্থ মূল্য নিরূপিত হয়েছে। গীতাঞ্জলি যুগের দীর্ঘদিনের অধ্যাত্মসাধনা এবং অতীন্দ্রিয় রসবিহারের পরেও কবি পুনরায় এই পৃথিবীর প্রেম ও সৌন্দর্যময় জীবনে ফিরে এসেছেন। কারণ কোন

১. ড. অরুণকুমার বসু, রবীন্দ্রবিচিন্তা (১৩৭৫), পৃ. ৮৭

একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ধর্ম নয়। বার বারই তিনি কক্ষ পরিবর্তন করেছেন। বার্ধক্যে, যখন যৌবন অতিক্রান্ত তখন, স্মৃতিতে সেই বিগত যৌবনের মধুময় মুহূর্তগুলিকে উজ্জীবিত করে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। যারা তাঁর সাঁঝ-সকালের গানের দীপে শিখা সংযোগ করেছিল তাদের কথা তিনি প্রৌঢ় প্রহরের বিষণ্নতায় স্মরণ করেছেন। আসন্ন অন্ধকারের পটভূমিকায় জীবনকে স্থাপন করে রচিত কবিতাগুলি করুণ, অথচ অপূর্ব সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যে প্রেমকে আদর্শায়িত করা হয়েছিল; তাই সেখানে প্রেমিকার চেয়ে প্রেমই বড় হয়েছিল, কিন্তু শেষ যুগে প্রেমের চেয়ে প্রেমিকাই বড় হয়েছে। তার ফলেই দেখি পূরবীতে 'লীলাসঙ্গিনী'র আবির্ভাব।

পূরবী কাব্যের মুখ্যতঃ পূরবী অংশে কবির প্রেমস্মৃতিমূলক কবিতাগুলি সংকলিত। পূরবী রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠিতম বৎসরোত্তীর্ণ কাব্য। বহুদিনকার অতীত হয়ে যাওয়া যৌবনকে কবি নূতনভাবে ফিরে পেয়েছেন এখানে। পূরবী-র প্রেম-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির মধ্যে লীলাসঙ্গিনীর নাম সর্বাগ্রে করা উচিত। প্রথম যৌবনের প্রেম-মূর্তিকে সুস্পষ্ট কাব্যরূপ দিলেন। এ যেন নূতন করে ফিরে পাওয়া। যৌবন অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রিয়ার অন্তর্ধান হয়েছিল, সেই চিরন্তনীর আবির্ভাব ঘটল গোধূলির ম্লান আলোয়। আবার যেন সোনার তরী চিত্রা যুগের বহুকাল বিস্মৃতা, কাব্যের প্রেরণাদাত্রী বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী মানস-সুন্দরীর সাক্ষাৎ পেলেন। তার এলোচুল ও চঞ্চল অঞ্চলের সুবাস কবিকে উতলা করছে। কত লীলা ও বিচিত্র সম্ভোগের স্মৃতি মানসপটে উদিত হচ্ছে—

> এলোচুলে বহে এনেছ কি মোহে
> সেদিনের পরিমল ?
> বকুল গন্ধে আনে বসন্ত
> কবেকার সম্বল ?

এই কবিতাটির সঙ্গে প্রাক্-পঞ্চাশের শ্রেষ্ঠ প্রেম কবিতা 'মানস-সুন্দরী'-র সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। উভয় কবিতারই উপজীব্য হল প্রেমস্মৃতি। 'মানস-সুন্দরী'-তে পরিপূর্ণ যৌবনে সদ্য বিগতের জন্য বেদনা, আর 'লীলাসঙ্গিনী'-তে প্রৌঢ় প্রহরে অতীতের হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়তমার স্মৃতির ধ্যান ও তার আবির্ভাবে আনন্দ ও শিহরণ। উভয় কবিতাতেই সহসা

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রেমের আবির্ভাবের কথা বলেছেন। 'মানস-সুন্দরী'-তে যে মানসীর সঙ্গ কামনা করেছেন 'লীলাসঙ্গিনী'-তে তারই আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু দিবাবসানের রাগিণী কবিকে বিষণ্ণ করেছে। এই ম্লান সন্ধ্যায় পুনরায় রূপরসের খেলায় অবতীর্ণ হওয়ার পথে কবির সংশয় জাগছে—

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।

—পূরবী, 'লীলাসঙ্গিনী'

কিন্তু এই সংশয় স্থায়ী হয় নি। কবি অনুভব করেছেন এবার এই লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁর মিলন হবে মৃত্যুর পরপারে। এতে কবি ভীত নন, কারণ এই প্রিয়তমা তাঁর চিরজীবনের চেনা—

যদি রাত হয়,—না কবির ভয়,—
চিনি হে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি তবু ছলিবে কি,
হে গোপনরঙ্গিনী?

—পূরবী, 'লীলাসঙ্গিনী'

'শেষ-অর্ঘ্য' নামক সনেট কল্প কবিতাটিতে কবি জীবন-সন্ধ্যায় সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে সেই প্রিয়তমাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন যে, কবিকে প্রত্যুষের মহেন্দ্রক্ষণে প্রথম নিশান্তের বাণী শুনিয়েছিল। তাকেই কবি জীবন-সায়াহ্নে আবার আলিঙ্গন করতে চাইছেন—

এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত-অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

কবির হৃদয়ে সেই ক্ষণিকা প্রিয়তমার আবির্ভাব তাঁর চিরকালের স্বপ্নে কি প্রভাব বিস্তার করেছে তারই অপূর্ব রসোজ্জ্বল ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'ক্ষণিকা' কবিতায়। দিগন্তের কোন্ পারে ক্ষণিকা অন্তর্হিত হয়েছে কবিকে সৌন্দর্য ও প্রেমের স্পর্শ দিয়ে। কবি মনে করেছিলেন সেই ক্ষণিক স্পর্শ বোধ হয় জীবন বিস্মৃত হয়েছে; কিন্তু আজ অনুভব করছেন তারই গোপন প্রভাব কবির গানের ছন্দ, কবির স্বপ্নকে অধিকার করে আছে। কবি সেই ক্ষণিক

প্রেমিকার সঙ্গে বিরহের অন্তরালে সেতু বাঁধতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় ভোগের উল্লাস বিরল। সেই প্রিয়তমার আবির্ভাবের স্মৃতি-মন্থনকালে তিনি অনুভব করেছেন যে তার চকিত আবির্ভাব সংকোচের ছায়াতলে বিলীন হয়ে গিয়েছিল; তাই তার দ্রুত অন্তর্ধান। কিন্তু কবি-হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে রইল সেই বিদায়কালীন ত্রস্ত দৃষ্টি। আজ জীবন-সন্ধ্যায় কবি সেই চঞ্চলা পলাতকা প্রিয়ার উদ্দেশে অশ্রুসজল লিপি রচনা করছেন এবং বিশ্বের আনন্দ ও সৌন্দর্যের উৎস সেই প্রিয়তমাকে অন্বেষণ করতে চাইছেন—

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা—
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা—
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা॥

'খেলা' কবিতাটিতে দেখি কবির প্রিয়া তাঁকে সন্ধ্যাবেলায় খেলার নিমন্ত্রণ করেছেন। ভোরের অরুণ আভাসে তাঁর জীবন-সন্ধ্যাকে রাঙিয়ে দিতে চাইছেন। কবি যৌবনের যে বাঁশীকে হারিয়ে ফেলেছিলেন আজ জীবনের পাতা-ঝরার দিনে কবির লীলাসঙ্গিনী সেই বাঁশীকে খুঁজে এনেছেন। কবিকে সেদিন যে সুরে শিখিয়েছিলেন সেই সুরের প্রতিধ্বনি উঠেছে আজ বুকের দীর্ঘশ্বাসে। প্রভাতের সেই চাঁপা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। সকল চিন্তা উধাও হয়ে যাচ্ছে, বুকে জাগছে ব্যথার চঞ্চলতা, বাতাসে জাগছে ছুটির গান। অতীত প্রেমের স্মৃতি-পূজার পরিবর্তে তাঁর প্রিয়া লীলাবিলাসের পক্ষপাতী। তাই প্রৌঢ় কবি নূতনভাবে লীলার জন্য প্রস্তুত—

তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে.
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি॥

'কৃতজ্ঞ' কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনীকে বহুদিন ভুলে থাকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। কবিতাটি স্মৃতিবেদনায় স্নিগ্ধ। কোন্ অতীতে তাঁর প্রিয়া শেষ চুম্বন দিয়ে গিয়েছে, দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে কবি তা ভুলে গিয়েছেন। সেদিনের সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী-মঞ্জরী থরে থরে শুকিয়ে পড়ে গেছে, কত মধ্যাহ্নের কপোতকূজন কত সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি এঁকে দিয়ে গিয়েছে। কত রাত্রি স্বপনলিখন দিয়ে সে স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে। যৌবন বসন্তের সেই বাণী যদি কবি ভুলে গিয়ে থাকেন সে প্রেম-বেদনার দীপ যদি নিবে গিয়ে থাকে তার জন্য কবি ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। তবে একথা কবি স্বীকার করছেন যে তাঁর প্রিয়তমার আবির্ভাব হয়েছিল বলেই গানের ফসলে তাঁর জীবন ভরে উঠেছিল। সে দানের অনুগ্রহ তিনি এখনও জীবনে বহন করছেন। সকল বিস্মৃতির মধ্যে প্রিয়তমার এই মহান আবির্ভাবের স্মৃতি কবির মনে অক্ষয় হয়ে আছে—

> বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
> ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
> আমারে করায় পান। ··· ·
> ··· ··· ··
> আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
> বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
> সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
> সব মানি—সব চেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন ॥

এই কবিতাটি স্মৃতিবেদনায় ভারাক্রান্ত। এই রকম সজল বেদনার অর্ঘ্য শেষ পর্যায়ের খুব বেশি কবিতায় নেই। এই যুগের প্রেম-কবিতার যেটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য,—দূর থেকে বিগত প্রেম-স্মৃতিকে নিবিড় বেদনায় রোমন্থন, সেটির অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায় এখানে।

'অপরিচিতা', 'আনমনা', 'বিস্মরণ', 'স্বপ্ন', 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি কবিতায় কবি বিভিন্নভাবে তাঁর লীলাসঙ্গিনী, রস-রঙ্গিনী প্রেমিকা বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁর প্রেরণাদাত্রী অন্তরস্থিত কাব্যলক্ষ্মীর প্রভাব এবং স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। প্রতিটি কবিতাই অতীত স্মৃতির বেদনায় মন্থর। প্রৌঢ় প্রহরের বিষণ্ণ আলোয় তিনি বিগত প্রেমকে নূতনভাবে আস্বাদন করতে

চেয়েছেন ; কিন্তু বার্ধক্যের আবির্ভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই প্রতিটি কবিতাতেই আনন্দ-বেদনার দ্বন্দ্ব শান্ত-করুণ মাধুর্যে ফুটে উঠেছে।

পূরবী-র পর মহুয়া কাব্যে কবি অনেকগুলি প্রেম-কবিতা রচনা করেন; কিন্তু সেগুলি ব্যক্তিগত প্রেম-স্মৃতিমূলক নয়। মহুয়া কাব্যটি একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের তাগিদে রচিত হলেও প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এ কাব্যে পাওয়া যায়। পূরবী-তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে পুনরায় ফিরে পেয়েছেন মহুয়াও সেই যৌবনেরই পরিচয় বহন করছে। এই কাব্যের প্রবণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য। —"আমি নিজে মহুয়া-র কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগপ্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।"[১]

এই কাব্যে প্রেমের সৌন্দর্য আর রহস্যকেই কবি তুলে ধরেছেন। জীবনে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়। যদিও প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও পরিবর্তন হয় নি তবুও মহুয়া-র প্রেম সোনার তরী-চিত্রা পর্বের প্রেমানুভূতি থেকে ভিন্ন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম দেহ-কামনার উর্ধ্বে একটি ভাবময় অনুভূতি মাত্র। মহুয়া-র প্রেমও তাই, তবে এখানে প্রেমের দর্শন রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন কবিতায়। আদর্শ প্রেমকেই আহ্বান করেছেন কবি মহুয়া-তে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমের তপস্যা। তাই প্রণয়ের 'প্রসাধন-কলার' সঙ্গে সঙ্গে চলেছে 'প্রণয়ের সাধনবেগ'। যেমন 'সন্ধান' কবিতায়—

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে।

---

১. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৫ খণ্ড (বি. ভা. ১৯৬৮), পৃ. ৫২৭

শেষ পর্যায়ের প্রেমের কবিতায় প্রেমিকার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মহুয়া-তে যে নারীর চিত্র কবি এঁকেছেন তা অবলা, কোমল এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীলা নয়; তার প্রেম বলিষ্ঠ সংগ্রাম, সত্য এবং সাহসে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'অবলা' কবিতায়—

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লবো একদিন
.. ..
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

মহুয়া-র পরবর্তী কাব্য পরিশেষ-এর মধ্যে প্রেম-কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এখান থেকেই কবির ভাবজীবনে আবার একটি পরিবর্তন হয়েছে। এই কাব্যে প্রথম থেকে চলেছে কবির আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-সমীক্ষা। লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেম এই কাব্যের কবিতার বিষয়বস্তু হয় নি বরং কবি 'তুমি' কবিতায় স্বীকার করেছেন তাঁর মনে লীলাসঙ্গিনীর প্রভাব আর প্রত্যক্ষ নয়।

হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এলো যে রাতি॥
.. ..
অবগুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।

পুনশ্চ কাব্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। দার্শনিক চিন্তা, মানব সত্তার রহস্য ইত্যাদিই এই কাব্যের কবিতাগুলির বিষয়বস্তু হয়েছে। তবে কয়েকটি আখ্যায়িকা-জাতীয় কবিতায় প্রেমের

সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই জাতীয় কবিতা হল 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া' ইত্যাদি। তবে এই কবিতাগুলিতে গল্পরসই প্রধান হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রেমের স্পর্শ বা কবির প্রেম-সম্পর্কিত মনোভাবের কোন পরিচয় এসব কবিতায় পাওয়া যায় না। প্রেমের ব্যর্থতা ও নিয়তির পরিহাসের করুণ কাহিনী চিত্রিত হয়েছে এই কাব্যগুলিতে।

পূরবী-র পর বীথিকা-তে আবার রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারী প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তৎপূর্বে প্রকাশিত শেষ সপ্তক কাব্যটি পরবর্তী কাব্য শ্যামলী-র সঙ্গে একযোগে আলোচনাযোগ্য। কবির জীবনে সন্ধ্যার ছায়া যত গাঢ়তর হয়েছে, প্রেমস্মৃতি হয়েছে ততই উজ্জ্বল। বীথিকা অতীত স্মৃতি-সঞ্চারী প্রেম-কাব্য। অতীত স্মৃতির শ্যামস্নিগ্ধ বীথিকা-য় কবি জীবনের প্রৌঢ় প্রহরে আশ্রয় নিয়েছেন। এই কাব্যের প্রেমের কবিতার সঙ্গে পূরবী-র প্রেমের কবিতার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই পর্যায়ের কবিতায় বিগত প্রেম-স্মৃতিকে আহ্বান এবং সেই প্রেমের কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে কয়েকটি আখ্যানবাহী লীলাচঞ্চল কবিতাও আছে।

শেষ পর্যায়ের কবিতায় মহাযাত্রার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কবি তাঁর সমস্ত ভাবনাকে একটি বৃহতের পটভূমিকায় স্থাপন করে অনুভব করতে চেয়েছেন। 'দুজন' কবিতায় একদা যৌবনে দুরু দুরু বক্ষে যুগলের যে প্রেমযাত্রা শুরু হয়েছিল আজ জীবন-সায়াহ্নে সেই প্রেম-স্মৃতি সুদূরের মাঝে লীন হয়ে গেছে। অতীতের সেই প্রেমঘন মুহূর্তকালের গণ্ডী অতিক্রম করে চিরকালের মাঝে আসন পেতেছে। সব সুখ সব দুঃখ যেখানে মিশে যায় সেই সুদূর গগনের দিকে এই দুজন যাত্রী শান্ত চোখে চেয়ে আছে—

অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।
বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলন-লিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে।

'রাত্রিরূপিণী' কবিতায় কবি জীবন-সন্ধ্যায় অতীত ও মৃত্যু রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করে, রাত্রিরূপিণীর প্রেমের মধ্যে জীবনের অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ ত্যাগ করে শান্তি পেতে চাইছে।

তুমি এস অচঞ্চল,
এসো স্নিগ্ধ আবির্ভাব,
তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।
...		...		...		...
সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।

'কৈশোরিকা' কবিতায় কবির কিশোর-প্রেমের ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। কিশোর জীবনে কবি কৈশোরিকা প্রিয়ার সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সে যাত্রায় যুক্ত হয়ে গেছে কত স্মৃতি, সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি। অজান্তে সে যাত্রা কখন থেমে গিয়েছিল। আবার এই গোধূলিবেলায় সহসা সেই প্রিয়ার আবির্ভাব কবি অনুভব করেছেন, সেই আবির্ভাব কবি-জীবনে মহৎ প্রেরণারূপে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাব্য সৃষ্টির কেন্দ্রে সেই প্রিয়া আসীনা, যে অনাদি কালের চিরমানবীর বাণী বহন করে এসেছে। তাঁর সারস্বত প্রেরণার উৎসও এই প্রিয়া—

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
...		...		...
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন-ফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

'সত্যরূপ' কবিতায় কবি বলছেন যে জীবনের অনিত্যতার মধ্যেও সৌন্দর্যে, প্রেমে ও মহত্বে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। প্রেম চিরন্তন, প্রেমই পৃথিবীকে নবীন রাখে—

সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপ-শ্রেণী মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে,
সেই তো বাখানে,
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।

'প্রত্যর্পণ' কবিতায় প্রেম কবি-জীবনে কি প্রেরণা এনেছে, সেই কথাই কবি ব্যক্ত করেছেন। যে নারীর ভাবমূর্তি তিনি কাব্যে এঁকেছেন, সেই নারী কামনা-বাসনার উর্ধ্বে স্বপ্নময়ী ধ্যানপ্রতিমা। ঐ মূর্তি কবির মুগ্ধ মনের দানে পুষ্ট। কিন্তু কবির সমস্ত প্রেরণার উৎস সেই প্রিয়া—

প্রিয়-হাত হতে পর পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে কর তুমি আরবার
দানের মাল্যদান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান।

'ছায়াছবি' কবিতাটি একটি আখ্যানবাহী প্রেম-কবিতা, কোন একটি বর্ষামুখর দিনের স্মৃতি বহুকাল পরে কবির মানসপটে উদিত হয়েছে।

'নিমন্ত্রণ' কবিতাটিতে অতীত প্রেমকে কবি পুনরায় আহ্বান করেছেন। পুরোনো দাবী নিয়ে প্রিয়াকে আবার তাঁর নিকট আসতে বলেছেন। বিভিন্ন রূপে তিনি প্রিয়াকে কল্পনা করছেন। প্রথম যুগের প্রেম-কবিতার সঙ্গে শেষ পর্যায়ের প্রেমের কবিতার একটি পার্থক্য হল প্রৌঢ় প্রহরে প্রিয়াকে তিনি শুধুমাত্র অপার্থিবরূপে কল্পনা করেন নি তার বাস্তব সত্তাকেও স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রথম যুগে প্রেম-কবিতা নিরুদ্দেশ কল্পনালোকে উধাও, কিন্তু শেষের যুগে সৌন্দর্য কল্পনার মধ্যে অকস্মাৎ কবি-মন মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছে—

এ কালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি-রুমাল টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।

কিন্তু বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাব নয়। তাই অনাবিল আনন্দের মধ্যে প্রিয়াকে শুধুমাত্র অনুভব করতেই চাইছেন—

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে—
স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষ-ডালের ফাঁকে।

প্রেম শুধুমাত্র বন্ধনের মধ্যেই সার্থক হতে পারে না। অধিকার প্রতিষ্ঠাই প্রেমের একমাত্র কাম্য নয়। কবি মনে করেছিলেন প্রকৃত প্রেম লাভের পথে সাধনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কালক্রমে কবির সে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কবি অনুভব করেছেন প্রেমের সঙ্গে অধিকার প্রতিষ্ঠার পার্থক্য আছে। 'অপরাধিনী' কবিতায় বলছেন—

ভাগ্যেরে করেছি জয়
এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নির্ভয়।
আলস্যে কি ভেবেছিনু তাই—
সাধনার আয়োজনে আর মোর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু,—

রুষ্ট ভাগ্য ভেঙে দিল অহংকার।

'উদাসীন' কবিতাটি প্রেমের অপরিপূর্ণতা ও স্মৃতিবেদনায় বিষণ্ণ। কবি মনে করেছিলেন তাঁর দান সম্পূর্ণ হয় নি। কিন্তু তবুও তাঁর মনে আশা সেই প্রেমনিবেদনের আনন্দ ব্যর্থ হয় নি—

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ—
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল ?।

আবার 'দানমহিমা' কবিতায় প্রেয়সীর পূর্ণতার রূপটি অঙ্কন করেছেন। 'নির্ঝরিণী' যেমন অকারণ আবরণ সুখে আপনাকে দান করে তেমনি নারী নিরাসক্ত দাক্ষিণ্যে জীবনকে ধন্য করে। নারী স্বমহিমায় অপ্রমত্ত, অচঞ্চল এবং ঐশ্বর্যরহস্যময়ী। নারীর এই দাক্ষিণ্যের মূর্তিই কবি সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন—

তুমি আছ কাছে,
সে আত্মবিস্মৃত কৃপা,—চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে।
ঐশ্বর্যরহস্য যাহা তোমাতে বিরাজে
একই কালে ধন সেই, দান সেই, ভেদ নেই মাঝে।

'ঈষৎ দয়া' কবিতাটি প্রৌঢ় কবির অতীত স্মৃতিমন্থন, অতীত প্রেমের

ক্ষীণ সৌরভ বর্তমান মুহূর্তকে ক্ষণগৌরব দান করছে। অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধ কবি যৌবনের সেই মুহূর্তকে উজ্জীবিত করে তুলতে চাইছেন।

কবির প্রেম তো ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সীমাবদ্ধ নয়। অনুভবে কবি-মনে তা অনন্ত সৌন্দর্যরূপে ধরা দেয়, কিছু জানা এবং কিছু অজানায় মিলে যে মূর্তি কবির কাছে ধরা দেয় তাকেই তিনি বারংবার কাব্যের অর্ঘ্য দান করেছেন—

তোমার যে-সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে ;

—বীথিকা, 'মাটিতে-আলোতে'

কামনার পিঞ্জরে বদ্ধ কবি প্রকৃত প্রেমকে উপলব্ধি করতে পারেন নি ; তাই বার বারই ভোগ করেছেন প্রত্যাখ্যান-লাঞ্ছনা, কিন্তু যখনই তিনি মোহমুক্ত চোখে নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার দুর্গ থেকে নির্মল আলোতে বেরিয়ে এসেছেন তখনই ঘটেছে তাঁর সত্য প্রেম-উপলব্ধি। প্রেম যে আকাঙ্ক্ষার ধন নয় তা রবীন্দ্রনাথ চিরকালই স্বীকার করেছেন। 'মুক্তি' কবিতার মধ্যেও আমরা এই ধারণার প্রতিফলন দেখতে পাই।

একদা বসন্তে তাঁর বীথিকা যারা চটুল চরণের অসংকোচ নূপুরঝংকারে মুখরিত করেছিল আজ ঋতুর অবসানে তারা অন্তর্হিত হয়েছে। কবি আজ নিস্তব্ধ নির্জন বীথিকায় অতীত দিনের সেই আনন্দোৎসবের স্মৃতিকে স্মরণ করছেন। 'ঋতু-অবসান কবিতাটি স্মৃতি-বেদনায় বিষণ্ণ। আজ কবি স্মরণের প্রদীপ জ্বালিয়ে অতীতের সেই দেওয়া আর নেওয়ার মুহূর্তগুলিকে গোধূলির ম্লান আলোয় পুনর্বার দেখে নিচ্ছেন। দান-উন্মুখ কবি জীবনের প্রান্তদেশে অজানা সার্থকতার দিকে তাকিয়ে আছেন—

কোথা তারা গেল আজি,—
গোধূলিছায়াতে হল লীন
যারা এসেছিল একদিন
কলরবে কান্না ও হাসিতে
দিতে আর নিতে।

আজি লয়ে মোর দানভার
ভরিয়াছি নিভৃত অন্তর আপনার ;
... ...
কোন্ বিরাটের পায়ে ধরিয়াছে তুলি
নাহি জানে আপনি সে,
সুদূর প্রভাত-পানে চাহিয়া রয়েছে নির্নিমেষে ।

শেষ সপ্তক-এর '৪৪' সংখ্যক কবিতাটিকে শ্যামলী কাব্যের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তার পূর্বে শেষ সপ্তক কাব্যের কোন কোন কবিতাতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি প্রৌঢ় প্রহরে আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিগত প্রেমকে অনুভব করেছেন।

'এক' সংখ্যক কবিতায় বলেছেন প্রাপ্তির মুহূর্তেই পাওয়ার মূল্যায়ন হয় না। কবি যৌবনে যে প্রেম লাভ করেছিলেন, আজ তাকে হারিয়েই যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করলেন। মহৎ বেদনার মধ্যেই প্রাপ্তি সার্থক হয়ে ওঠে—

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।

জীবনে প্রেমের আবির্ভাবে কোন কোন মুহূর্ত হয়ে ওঠে অনন্ত। প্রেমের স্বীকৃতি অমৃতের আস্বাদ বহন করে আনে। এর কাছে অন্যান্য সুখ-দুঃখ, প্রাত্যহিকতার আবেদন তুচ্ছ হয়ে যায়। '১৪' সংখ্যক কবিতায় এই ধারণার স্বীকৃতি আছে—

সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।

'ত্রিশ' সংখ্যক কবিতাতেও তিনি তাঁর সেই বিরহ-বিচ্ছিন্না প্রিয়াকেই স্মরণ করেছেন। পরবর্তীকালে শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে শ্যামল মাটির কাছাকাছি যে শ্যামলী প্রিয়াকে অনুভব করেছেন, তার আভাস আছে এই কবিতায়। তাঁর এই পর্যায়ের প্রেম-কবিতায় শ্যামল অনুষঙ্গটি বার বারই ফিরে এসেছে।

শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার নাম 'শ্যামলী'। এই কবিতা অবলম্বনেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। শ্যামলী গ্রন্থের শেষ কবিতা 'শ্যামলী' রবীন্দ্রনাথের 'মাটির বাসা', 'শেষবেলাকার ঘরখানি'-র গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে রচিত। এই গৃহের পরিকল্পনা শেষ সপ্তক-এর 'চুয়াল্লিশ' সংখ্যক কবিতায় পাওয়া যায়—

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।

কিন্তু কবিতাটি পাঠ করলে দেখা যায় শুধুমাত্র মৃত্তিকার প্রতি অনুরক্তিই তাঁর প্রেরণা ছিল না। শ্যামল মাটির গৃহটি যেন শ্যামলা নারীর শ্যামল মাধুর্যের স্মৃতি বহন করছে,—

আমি ভালোবেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে;
যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ঐ মাটির দিগন্তে
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে।

শ্যামলী গ্রন্থে 'স্বপ্ন', 'হারানো মন', 'বিদায় বরণ', 'অকাল ঘুম', 'বাঁশিওয়ালা', 'মিলভাঙা' প্রভৃতি কবিতায় এই শ্যামলী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রেম কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সম্পর্কিত চিরন্তন ধারণার পরিচয় আছে।

'দ্বৈত' কবিতায় কবি বলেছেন যে প্রেমিকার একটি স্বতন্ত্র রূপের সৃষ্টি হয় প্রেমিকের মনোভূমিতে, প্রেমিকার রূপের সমস্ত অসম্পূর্ণতা প্রেমিকের প্রেমে পূর্ণ হয়। প্রেমিকের প্রেমের মধ্য দিয়েই প্রেমিকার সত্যকার আত্মোপলব্ধি হয়—

আমি বেঁধেছি তোমাকে দুয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে।

'শেষ প্রহরে' কবিতায় কবি প্রেমশূন্য অভিশপ্ত দাম্পত্য জীবনের কথা বলেছেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-সম্পর্ক ছিন্ন হলে স্বামীর কাছে স্ত্রী একটা মূল্যবান প্রাণহীন বস্তুর চেয়েও তুচ্ছ হয়ে যায়। মানসিক ব্যবধানের জন্য স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হৃদয়ানুভূতির বিষয়ে নির্লিপ্ত হয়ে ওঠে।

'সম্ভাষণ' কবিতায় পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর অসাধারণত্ব ও রহস্যময়তার কথা বলা হয়েছে। প্রসাধনরতা প্রিয়াকে দেখে কবির মনে হয়েছে প্রতিদিন পুরানো দিনের ঘরনী নিজেকে সাজিয়ে তোলে। তখন সে আর সাধারণ থাকে না। সে যেন হয়ে ওঠে অন্য যুগের নারী। তাকে প্রাচীন কাব্যের নায়িকার মত মনে হয়। পুরুষের প্রেমানুভূতির কোনো বিশেষক্ষণে নারী আর কালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, সে হয়ে ওঠে চিরন্তনী। সেই সময় পুরুষ তার প্রেমকে প্রকৃতির মনোহর সামগ্রীতে সাজিয়ে তোলে। তার প্রেম-সম্ভাষণও হয় কাব্যিক।

'হারানো মন' কবিতায় কবির প্রৌঢ় বয়সের প্রেম-চেতনার স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়। বৃদ্ধ কবির প্রেমে যৌবনের সযত্ন প্রসাধন নেই। প্রেমিকা অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেমিক তার উপস্থিতি ও মিলনের দ্বিধা অনুভব করতে পারছে। কিন্তু সে আজ প্রেমিকাকে আহ্বান জানাবে না, কারণ এই মুহূর্তে তার চেতনা 'কৃষ্ণ পক্ষের গভীর আকাশে নীহারিকা' কিংবা বর্ষণ শেষে শরতের নীলিমায় সাদা মেঘের মত ছড়িয়ে পড়েছে। তার প্রেম আজ সীমানার বন্ধন না মেনে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। তার প্রেম লুপ্ত হয় নি, কেবল সে আজ কোনো বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ নয়—

আজ কোনো-সীমানা-দেওয়া নয় আমার মন,
হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে।
আগেকার চিহ্নগুলো সব গেছে মুছে,
আমাকে এক করে নিতে পারবে না কোনখানে
কোনো বাঁধনে বেঁধে।

'বাঁশিওয়ালা' কবিতার মধ্যে বাংলাদেশের সমাজ এবং সংসারে আবদ্ধা নারীর মর্মবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতাটির সঙ্গে কবির 'স্ত্রীর পত্র' নামে ছোটগল্পের তুলনা করা যায়। বাঁশির সুর রূঢ় বাস্তবের উপর সৌন্দর্যের আবরণ টেনে দেয়। সাধারণ নারীর মধ্যেও যখন প্রেমের আবির্ভাব হয় তখন সেও হয়ে ওঠে অসাধারণ। তার মনের সেই আনন্দের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমের বাঁশির সুরে সে অমর্ত্য লোকের আহ্বান শুনতে পায়। তার মধ্যে চারিদিকের প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করবার সাহস ও বিদ্রোহ জেগে ওঠে। বাঁশিওয়ালারূপ প্রেমিককে লক্ষ্য করে সে বলে—

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।

কিন্তু সে বাঁশিওয়ালার বাঁশি সুরের দূরত্বে থাকতে চায়। কারণ দূরত্বের পটেই প্রেমের সত্যকার রূপ ফোটে। পরিচয়ের সীমার মধ্যে আনলে তার বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা।

'মিলভাঙা' কবিতাটির মধ্যে কবির কিশোর প্রেম-স্মৃতির ছায়া পড়েছে। প্রথম যৌবনে তাঁর চিত্তে যে নারী প্রথম প্রেমানুভূতি জাগিয়েছিল, সে কখন তাঁর জীবন থেকে অপসৃত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রেমিকার অমলিন স্মৃতিকে প্রকৃতির কালজয়ী বস্তুর মধ্যে অনুভব করেন। জীবনের নানা অবস্থায় কবি তাঁর প্রেমিকার পূর্ব পরিচিত সীমানা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। কিন্তু তবুও কবি স্বীকার করেন যে সেই প্রিয়াই তাঁর কাব্যসাধনার আদি প্রেরণা এবং সেই প্রেরণা আজও অম্লান। তিনি তাঁর কাব্য সাধনার অব্যাহত স্রোতে সেই প্রথম প্রেমের স্পর্শ অনুভব করেন।

এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিল ঠেলে
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে ;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

'হঠাৎ-দেখা' কবিতায় কবি বলেছেন যে প্রেমিকের চিত্তে প্রেমিকার জন্য প্রেমানুভবের মৃত্যু নেই। রাত্রির তারা দিনের আলোয় অদৃশ্য হলেও তার অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যায় না। তেমনি বাস্তব সংসারে প্রেম অদৃশ্য থাকলেই তা মিথ্যা হয়ে যায় না। তাই বহুকাল পরে রেলগাড়ির কামরায় প্রেমিক-প্রেমিকার হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে আবার চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে যখন প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করেছে যে তাদের বিগত দিনের সব সম্পর্ক কি লুপ্ত হয়েছে, আর কিছুই কি বাকি নেই, তখন প্রেমিক বলেছে—

"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

'বিদায় বরণ' কবিতায় শেষ রাত্রির বৃষ্টি-ভেজা, ভারী হাওয়ায় থমকে থাকা সকালবেলার মন্থর মুহূর্তে কবির মনে হয়েছে যে তাঁর সব ভাবনার আবছায়া হালকা বেদনার রঙ মেলে দিয়ে মনের চারিদিকে ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে। তিনি তাদের কাব্যের মধ্যে ধরার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। তাঁর মনে হয় এগুলি হচ্ছে তাঁর কৈশোরের ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ, ফিকে হয়ে যাওয়া গন্ধ, কথা হারিয়ে যাওয়া গান, তাপহারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া প্রভৃতি নিয়ে গঠিত এক অবগুণ্ঠিতা অভিমানিনীর রহস্যময় স্বপ্নছবি। তিনি দিনান্তে বিদায় গ্রহণকারিণী কৈশোরের নারী-প্রিয়াকে শেষবারের মতো বরণের উদ্দেশ্যে ডেকে ফেরাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন এবং তাকে জানাতে চেয়েছেন যে তার প্রেম তাঁর কাছে সত্য ও মধুর। প্রিয়ার প্রেমের স্মৃতিতেই তাঁর মনে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে।

আকাশ-প্রদীপ কাব্যের প্রেম একান্তভাবেই স্মার্ত। ভূমিকার 'আকাশ-প্রদীপ' কবিতাটিতে এই গোপন প্রেম-বেদনারই প্রকাশ।

মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।

অপরাহ্নের অন্ধকারে দৃশ্যমান তারাটি রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনারই স্মারক, "এই তারকা মর্ত্যলোকের যে মানবীর স্মৃতি সে ছিল মিলনরাতের সহচরী, কখনও বা শিশির সজল বিদায় লগ্নের বিরহিণী। আজ দেহাবসানে স্মৃতির নীলিম আকাশে দূরবর্তী তারকায় রূপান্তরিত।"[১] আকাশ-প্রদীপ-এর

১ ড. অরুণকুমার বসু, রবীন্দ্রবিচিন্তা (১৩৭৫), পৃ. ১১৯

কয়েকটি কবিতায় কৈশোর ও যৌবনের অস্ফুটপ্রায় উন্মেষ-পর্বের প্রেমানুভবের স্মৃতি, এই কবিতাগুলি বিরহবিচ্ছিন্না নারীর স্মৃতি বহন করেছে। 'বধূ', 'শ্যামা' এবং 'কাঁচাআম'—এই তিনটি কবিতা প্রত্যক্ষভাবে মিলনরাতের সাক্ষীর স্মৃতি। ধূসর বর্তমান থেকে ব্যগ্র ব্যাকুল আগ্রহে কবি অতীতের শ্যামলিমার স্পর্শ অনুভব করতে চেয়েছেন।

'বধূ' কবিতাটি কল্পনার রহস্যময়তায় উজ্জ্বল। প্রাচীন ছড়ার বধূকে কল্পলোকের চিরন্তনী রহস্যময়ী রূপে অনুভব করেছেন। চিরজীবনের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায়ও বধূকে প্রত্যক্ষতার মধ্যে পাওয়া যায় না—

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ ;
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
"তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছে আলোতে"।
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ,
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে।
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।…"

সেই কল্পনার বধূ অপ্রাপণীয়া ; অনন্ত সৌন্দয ও প্রেমের বিগ্রহ রূপসীকে জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। সংসারে বধূর মধ্যে আমরা অন্তরালবর্তিনী অনন্ত সৌন্দর্যময়ীর রহস্যের আভাস পাই।

'শ্যামা' কবিতায় কবির কৈশোর প্রেমস্মৃতির কাব্যরূপায়ণ। কৈশোরে যে শ্যামা বালিকার সঙ্গে পরিচয় শ্লেষে-কৌতুকে নিবিড় হয়েছিল, পশ্চিম দিগন্তের পুলকে বিষাদে মেশা দিনে কবি সেই স্মৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন।

'নামকরণ' ও 'তর্ক' কবিতা দুটিতে প্রেমের এক নবীন ভাষ্য আবিষ্কার করা যায়। শেষ জীবনের এই প্রেমের কবিতাগুলিতে মননই প্রাধান্য লাভ করেছে। ভাবের গাঢ়তা, কল্পনার নিবিড়তা ও প্রেমের দার্শনিকতা এই কবিতাগুলিকে বিশেষ মূল্য দান করেছে। বিচিত্র উপমায় কবি নারীর শান্ত মহিমান্বিত মূর্তি চিত্রিত করেছেন, 'নামকরণ' কবিতায় নারীর সৌন্দর্য মাধুর্য ও রহস্যময় মূর্তি

অনেকটাই পুরুষের মনের সৃষ্টি। প্রথম যুগের কবিতায় কবি বলেছেন—'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। নারীর এই কাল্পনিক মূর্তিই মনোহর—

পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী,—
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি;

'তর্ক' কবিতায় নরনারীর দেহ-আত্মাগত প্রেমের সম্বন্ধ নিয়ে বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ। কবি বলেছেন পুরুষের এই কাল্পনিকতায় প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। ভোগের বন্ধনে প্রেমকে আবদ্ধ করা যায় না। দূর হতে আস্বাদনেই প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে। পুরুষের মায়ামোহেই প্রেমের যথার্থ পরিচয়—

আমি কহিলাম, 'যদি প্রেম হয় অমৃতকলস,
মোহ তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্য ভরা কায়া,
তাহার তো বারোআনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেমে আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।
আকাশের আলো
বিপরীতে-ভাগ-করা সে কি সাদা কালো।

ঐ আলোই তো আপনার পূর্ণতাকে ভেঙে তৃণে-শস্যে-পুষ্পে-পর্ণে, আকাশে-বাতাসে বিচিত্র বর্ণে আত্মপ্রকাশ করে, আর বিশ্বে চোখ ভোলাবার মোহ বিস্তার করে। এই মন-ভোলাবার প্রয়াস না থাকলে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তো তাৎপর্যহীন হত। তাই—

পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।

এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।
পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
মোহতরী বেয়ে তাই সুধা সাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া,
অসীমের ছায়া,
অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।

আলোচ্য দুটি কবিতায় নারী-প্রেমের রহস্যময়তার কথাই বলা হয়েছে।

'কাঁচা আম' কবিতায় কবি অনুভব করেছেন 'বদল হয়েছে পালের হাওয়া'। তাই চৈত্র মাসের সকালে মৃদু রোদদুরে গাছের তলায় পড়ে থাকা তিনটি কাঁচা আম অস্থির ব্যগ্রতায় কুড়িয়ে নিতে গেলেন না বৃদ্ধ কবি। এই তিনটি 'কাঁচা আম'কে কেন্দ্র করে কবির কিশোর প্রেমের প্রথম উন্মেষ ও চাঞ্চল্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই অপরিণত প্রেম প্রায়শঃই পূর্ণতা লাভ করে না, অস্ফুট মনের জাগরণেই এর সার্থকতা। তাই পরবর্তী কালে স্মৃতির মধ্যেই কিশোর প্রেম তার যথার্থ মূল্য লাভ করে।

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে,—
খুঁজে পাইনি।
এখনো কাঁচা আম পডছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

প্রেমের কবিতা হিসাবে সানাই-এর কবিতার একটি আলাদা স্বাদ আছে। পূরবী-র সেই সুকুমার স্মৃতিময় প্রেম সানাই-এর কবিতাগুলিতে আবার নূতন করে ধরা পড়ল। অধিকাংশ কবিতাতেই দূরবর্তিনী লীলাসঙ্গিনীর স্মৃতি এবং কৈশোর ও যৌবনের প্রেম-স্মৃতি সৌন্দর্য ও মোহের তুলিকায়

অঙ্কিত। তবে অধিকাংশ কবিতাতেই কবির একটি অতৃপ্ত গভীর বেদনার আভাস পাই। জীবন-সায়াহ্নের এই দীর্ঘশ্বাস বিগত প্রেমের অপ্রাপণীয়তায়। তবু এ যেন পুরাতন প্রেমকে নূতন করে অনুভব—

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রং দেয় গুঞ্জনগীতি।

—সানাই, 'নতুন রঙ'

স্মৃতিমূলক প্রেমের ইতিহাস বলাকা থেকে নবজাতক পর্যন্ত সর্বত্রই অনুভব করা যায়। এই স্মৃতির মধ্যে স্পষ্টতা আছে ; কিন্তু সানাই-এ এসে সেই স্পষ্টতা আমরা দেখতে পাই না। এখানে একটা অস্পষ্ট ভাব-পরিমণ্ডল। এখানে কোন অনুভূতি বা অস্পষ্ট মানসিক অবস্থাকে কাব্যরূপ দেওয়া হয়েছে। এই কাব্যের স্বল্পভাষিত কবিতাগুলির মধ্যে পূরবীর উদাস-করুণ সুর শোনা যায়। শেষ জীবনের এই কাব্যে অতীতকালের মূর্তি নূতনকালের বেশে এসেছে তাঁর জীবনে, তবুও অতীতের পানে চেয়ে তাঁর স্মৃতির হাহাকার 'গানের খেয়া' কবিতায়—

যে আসে নি এ জীবনে
ঘাট খুঁজি খুঁজি
গানের খেয়া সে মাগিতেছে বুঝি
আমার তীরেতে এসে।

'অনাবৃষ্টি' কবিতায় কবি অতীত যুগের প্রেমিকাকে স্মরণ করেছেন। এই কবিতায় কবির আক্ষেপানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। শেষ জীবনে কবি অতীত প্রেমের ব্যর্থতার কথা মনে করছেন—

যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে
পড়িত তোমার দান
এ মাটি লভিত প্রাণ,
একদা গোপনে ফিরে পেতে তারে
অমৃত ফলে।

'গানের খেয়া', 'অনাবৃষ্টি', 'নতুন রঙ', 'অধরা', 'ব্যথিতা'—এই কবিতাগুলি একই দিনে রচিত এবং প্রতিটি কবিতাতেই করুণ বেদনার মূর্ছনা শোনা

যায়। কবিতাগুলি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সুরে গাঁথা। মিলনের বিপরীত অবস্থা বিপ্রলম্ভ। এই বিপ্রলম্ভের জন্যই প্রেম অধিকতর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 'অধরা' কবিতায় কবির মনের নিভৃতে যে প্রেমের অস্তিত্ব তার দ্বারাই তিনি 'অধরা মাধুরী'কে আস্বাদ করতে পারছেন। প্রেমিকার যৌবন-উৎসবে কবি আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন।

'ব্যথিতা' কবিতায় অতীত জীবনের সকরুণ অপ্রাপ্তিকে কবি জীবন-সায়াহ্নে নিঃশেষে মেনে নিতে চাইছেন। দুরাশার গুরুভার, কৃপণ প্রাণের বঞ্চনা অতীতের বিদ্রূপবাণী তামসী বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যাক্। স্মৃতি হতে বেদনার গুঞ্জন থেমে যাক। পূর্বোক্ত প্রতিটি কবিতাতেই বিরহের ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস অনুভব করা যায়। সব স্থানেই একটি দূরবর্তিনী নায়িকার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতায় নানা চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায়। কোন স্থানে তিনি দার্শনিক, আবার কোন স্থানে তিনি পৃথিবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ জীবন-প্রেমিক। কিন্তু সানাই-এর কবিতাগুলিতে আমরা একমুখী প্রবণতা দেখি। একটি দূরবর্তিনী নারীর অস্তিত্ব ও বিরহ বিচ্ছেদ-জনিত বেদনাই কবিতাগুলির মূল প্রেরণা।

'পূর্ণা' কবিতায় কবি তাঁর প্রেমিকাকে পঞ্চদশী-রূপে কল্পনা করেছেন, যেন শুক্ল পক্ষের চরম তিথির চাঁদ।

'ছায়াছবি' একটি মধুর প্রেম-কবিতা, বহুদিন পরে রবীন্দ্রকাব্যে এই ধরনের সুর শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় মিলনানন্দের চিত্রণ খুব বেশী দেখা যায় না। দূরত্বের পটভূমিকায় প্রিয়াকে স্থাপন করে প্রেমার্ঘ্য নিবেদনেই রবীন্দ্র-কবিতার বৈশিষ্ট্য। এই কবিতায় সমগ্র প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে প্রিয়ার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন।

> আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণ-ধারায়
> আকাশ চেয়ে মনের কথা হারায়,
> আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
> নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে।

বর্ষণঘন শ্রাবণ-সন্ধ্যায় প্রিয়ার স্মৃতি কবিকে আকুল করেছে। তিনি 'আহ্বান' কবিতায় প্রেয়সীকে আহ্বান করেছেন তাঁর স্মৃতিরুদ্ধ গৃহকে আলোকিত করার জন্য, 'ছায়াছবি' এবং 'আহ্বান' এই দুটি কবিতারই পটভূমি

বৃষ্টিস্নাত শ্রাবণ। এই দুটি কবিতা জানুয়ারী মাসের একই দিনে রচিত। অনুমান করা যায় এই কবিতা দুটির রচনার প্রেরণা ছিল একই। অতীতের কোন মোহময় রোমান্টিক স্মৃতিতে কবি আবিষ্ট ছিলেন এবং তার সঙ্গে হয়ত মিলেছিল কোন বর্ষণঘন দিবসের স্মৃতি।

'দ্বিধা' কবিতায় কবির একটি সূক্ষ্ম অনুভূতির স্মৃতি-রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। কবির জীবনে প্রিয়ার আবির্ভাব এবং লীলার চিত্র এই কবিতায় সহজ-সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও কবি বিরহভাবনায় ব্যথিত।

তুমি কোথা দূরে কুঞ্জ ছায়াতে
মিলে গেলে কলমুখর মায়াতে,
পিছে পিছে তব ছায়া রৌদ্রের
খেলা গেলে তুমি খেলে।

এই সানাই কাব্যের সুরে শেষ পর্যায়ের সূচক-কাব্য পূরবীর সুরের অনুরণন শোনা যায়। স্মৃতিতে অতীতের পুনরুজ্জীবন, মর্ত্যপ্রীতি এবং লীলা-সঙ্গিনী প্রেয়সীকে পুনরায় আহ্বানের মধ্যে পূরবী কাব্যের প্রবণতার আভাস পাওয়া যায়। 'কর্ণধার' কবিতায় সেই লীলাসঙ্গিনীরই অনুভব—

ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবন-তরী মৃত্যু ভাঁটায়
কোথায় কর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরে দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার।

এই কাব্যে স্মৃতিচারণা এবং মর্ত্যপ্রীতির মধ্যে যে কবির আসক্তির প্রকাশ হয়েছে একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করা যায় না। যদি বা আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাও আবার গভীর অনাসক্তিজনিত। 'মানসী' কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি স্মৃতির ভূমিকাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে প্রত্যক্ষ জগতের আবেদন কবির কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়েছে, তাঁর মনের ভাবুকতায় স্মৃতি বিশুদ্ধ

আনন্দের উৎস রূপে ধরা পড়েছে। সানাই কাব্যের মূল সুরের পরিচয় এখানেই—

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।
অস্ফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষস্পন্দে কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে
সেই সন্ধ্যাতারা।
জন্ম সাথিহারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন তরে ;
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে।

সানাই-এর সূচনা কবিতা 'দূরের গান'-এর মধ্যেই এই অনাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন কবি। সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত কবি তারার আলোতে কোন দূরবাসী অধরার অন্বেষণ করেছেন।

দিগন্তের নীলিমায় স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলি লগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।
নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে ;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।

সানাই কাব্যে প্রেমই প্রধান কথা। রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্য মাধুর্য ও প্রেমের যুগটি যেন আবার ধরা পড়েছে। গোধূলি আলোয় পুরাতন প্রেম ও মাধুর্যের স্মৃতিকে কথা ও সুরের অপরূপ মায়ায় চিত্রিত করেছেন, যে লীলা-সঙ্গিনীর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন তিনি, সেই লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে পূর্বযুগের লীলাসঙ্গিনীর একটু পার্থক্য আছে। কালের ব্যবধানে তিনি ভিন্ন মূর্তি গ্রহণ

করেছেন, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে যেন একটু কাঠিন্য দেখা যাচ্ছে—মহাকালের তাণ্ডবনৃত্যে সেই সুন্দরী নর্তিনীর 'ঝংকৃত কিঙ্কিনী' ছিন্ন হয়েছে, 'সীমন্তের সিঁথি ও কণ্ঠহার' চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—

আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ,
ভীষণ রিক্ততা তার
উৎসুক চক্ষুর 'পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার।
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে, মুগ্ধ হস্তে-গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হত রসের প্লাবন
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।

—সানাই, 'বিপ্লব'

শেষ জীবনের কাব্যে প্রেম পরিপূর্ণ রূপেই স্মৃতিচারী। কবি অতীত প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে কাব্য-অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এই প্রেম বিগতের বিরহে বিধুর। তাই এই যুগের অধিকাংশ কাব্যের প্রেম-বিষয়ক কবিতায় দার্শনিকতার অবকাশ কম। তবে কোন কোন স্থানে আদি সৃষ্টি-রহস্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবি নরনারীর প্রেম নিবেদনের মধ্যে এক আদি-অন্তহীন দুর্জ্ঞেয় প্রাণস্রোতের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। তাই রমণীর মধ্যে কবি শুধুমাত্র নারীমূর্তিকেই প্রত্যক্ষ করেন নি—নারী বিধাতার অনন্ত সৌন্দর্যের দূতী। তাই গৃহে বধূর আগমন যুগে যুগে এই বার্তাই ঘোষণা করে—

··'আমি তারি দূত;
যে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
... ...
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে—
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।

—আকাশ প্রদীপ, 'বধূ'

তবে সব কবিতার মধ্যেই তিনি স্মৃতি-শায়িতা বিরহবিচ্ছিন্না প্রেমিকার কথাই বলেছেন। পুরাতন প্রেমের পুনরুজ্জীবন শেষ পর্যায়ের অধিকাংশ কাব্যেরই বিষয়বস্তু। পূরবী-তে জীবনে দিনের আলো থাকতে থাকতে বিগত প্রেমের মূল্যায়ন করে নেবার সকরুণ চেষ্টা রয়েছে, আবার বীথিকা-তে অতীত প্রেমের ছায়াবীথি রচনা করে প্রৌঢ় অবসন্ন কবি সেখানে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। পত্রপুট, শ্যামলী, আকাশ-প্রদীপ প্রভৃতি কাব্যের সর্বত্রই অতীত স্মৃতির মৃদু সৌরভে সুরভিত। প্রেম-সৌন্দর্যের শেষ আবির্ভাব সানাই কাব্য-গ্রন্থে। এরপর কবি ঔপনিষদিক চেতনা ও আত্মোপলব্ধির গভীরে ডুব দিয়েছেন। শেষ পর্যায়ের প্রেমের কবিতায় স্মৃতি-চিত্রণের মধ্যে একটা গভীর অচরিতার্থতার বেদনা লক্ষ্য করা যায়। বার্ধক্যে উপনীত কবি অনুভব করেছেন যে পূর্ব-জীবনের সেই সুরটিকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তাই এই সময়ের কাব্যগুলিতে বিপ্রলম্ভ বিরহের বৈরাগ্যই সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যুচেতনা ও শেষ পর্যায়

কবি মাত্রই মৃত্যুর স্বরূপ জানতে উৎসুক। মানুষের জীবনের অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু। এই মৃত্যু বিভিন্ন কবির কাছে বিভিন্ন রূপের ব্যঞ্জনা দিয়েছে এবং এই নানা রূপে মৃত্যুকে উপলব্ধি করার প্রবণতার মূলে থাকে কবিগণের বিশিষ্ট কবি-স্বভাব। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন।

অনেক সময় দেখা যায় মানুষ তার জীবন-দর্শন রচনা করে জীবনের অভিজ্ঞতায়। তাই কবি জীবনের ঘটনা-পরম্পরা উপলব্ধির মাধ্যমে অনেক সময় কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু একথাকে সর্বতোভাবে সত্য বলা যায় না। কবি-জীবনে একই ঘটনা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তাকে উপলব্ধি করতে হলে যেমন আমাদের তাঁর জীবনের বাহ্যিক ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করতে হবে, কারণ এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা তিনি কখনও কখনও প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি আবার তাঁর অন্তরস্থিত কবি-মানসের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টাও একান্ত আবশ্যক।

মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা কবির জীবনাসক্তির পরিচায়ক। এই পৃথিবী, এই জীবন কবির কাছে পরম মূল্যবান। কাব্যরচনার প্রথম যুগে কড়ি কোমল-এ তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। এই আকাঙ্ক্ষাই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পোষণ করেছেন। জীবনের প্রতি কবির ভালবাসা গভীর; আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুতে সেই জীবনের পরিসমাপ্তি। জীবন ও মৃত্যু যেন দুটি বিরোধী অবস্থা। তাই জীবন-প্রেমিক কবি মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে আগ্রহী। এই পৃথিবীর প্রতি কবির ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাঁর সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টি পৃথিবীর অবারিত উদার দাক্ষিণ্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ইতিহাস। জীবনের উপান্তে পৌঁছে কবি যেন আরও নিবিড় আবেগে পৃথিবীকে নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন। তাই জীবনে মৃত্যুর আবির্ভাবের ক্ষণটি যতই নিকটবর্তী হয়েছে, মৃত্যু সম্বন্ধে কবির জিজ্ঞাসা ততই প্রবলতর হয়েছে। মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়েই যে কবির মনে মৃত্যু-চেতনার উদ্ভব হয়েছে একথা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর থেকেই মৃত্যু সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছেন এবং আপন মনেই কৌতূহল-নিবৃত্তির উপায় খুঁজেছেন

রবীন্দ্রনাথের মতে কড়ি ও কোমল-এর যুগেই তাঁর মনে প্রথম মৃত্যুর উপলব্ধি জাগে। এই সময়ই কবির পরিবারের উপর দিয়ে মৃত্যুর একটি প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন এবং সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কাদম্বরী দেবী বা বৌ ঠাকুরাণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরক্তির কথা সর্বজনবিদিত। এই মৃত্যু-বিচ্ছেদজনিত প্রতিক্রিয়াকে অবশিষ্ট সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ কখনও বিস্মৃত হন নি। জীবনস্মৃতি-তে তিনি এই সময়কার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন,—"আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে......জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না।......যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনমতে মিল করিব কেমন করিয়া।"[১] এই সময় সাময়িকভাবে তাঁর জীবনের সজীবতা ও সরসতা শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ভাব তাঁর জীবনে স্থায়ী হতে পারে নি। মৃত্যুকে তিনি স্বাভাবিক ঘটনা বলেই জেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর এই মনোভাব তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনাগুলিতে আরও স্পষ্ট হয়েছে। মৃত্যু সম্বন্ধে তখন তিনি একটি দার্শনিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থিত হয়েছেন। কড়ি ও কোমল-এর সমসাময়িক রচনা 'রুদ্ধগৃহ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কবি বলেছেন—"পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে......হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।"[২] এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি সেই প্রথম যুগেই মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের চেষ্টা করেছেন।

যদিও কবি মৃত্যু-সচেতনতার প্রথম অনুভূতির দিক থেকে কড়ি ও কোমল-এর যুগটিকেই চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু তাঁর এই যুগের পূর্ববর্তী রচনাগুলিতেও মৃত্যুর প্রশ্ন কবিকে আলোড়িত করে নি একথা বললে ভুল হবে। একেবারে প্রথম দিকের রচনাগুলিতে কবির মনে একটি অনির্দেশ্য দুঃখবাদ প্রধান হয়েছে, রচনাগুলি উচ্ছ্বাসের বাষ্পে পরিপূর্ণ। তথাপি সেগুলির মধ্যে কবির জীবন-জিজ্ঞাসাকে আবিষ্কার করা যায়। মৃত্যু সম্বন্ধে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত

---

১. জীবনস্মৃতি, (বি. ভা. ১৩৬৮), পৃ. ১৪৩-৪৪

২. বিচিত্র প্রবন্ধ, (বি. ভা. ১৩৬৭), পৃ. ৩৫-৩৬

হয় প্রভাত সঙ্গীত-এর যুগেই। এই সময়েই তিনি উপলব্ধি করেছেন মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি হয় না, মৃত্যু জীবন থেকে জীবনে যাবার তোরণ মাত্র, তাই তিনি বলেছেন—

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।

—প্রভাত-সঙ্গীত, 'অনন্ত জীবন'

তিনি মনে করেছেন বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকে। ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা।

'কড়ি-কোমল'-এর যুগের মৃত্যু সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পূর্বেও মৃত্যুর প্রশ্ন তাঁকে নাড়া দিয়েছে এবং মৃত্যুর স্বরূপ ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন; সেটি হল, মৃত্যুর অর্থই সমাপ্তি বা শূন্যতা নয়। জীবনে যত অগ্রসর হয়েছেন কবি স্বমতে ততই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একেবারে শেষ জীবনের কাব্যগুলিকে আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় মৃত্যুর স্বরূপের উপলব্ধি একটি স্বতন্ত্র আস্বাদ দান করেছে। শেষ পর্যায়ের প্রৌঢ় প্রহরের আলোয় মৃত্যুকে কবি যেন নূতনভাবে নবরূপে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা নিয়ে আলোচনা করলে এক কথায় তাঁকে রোমান্টিক কবি বলে আখ্যাত করা যায়। জগৎ ও জীবনের প্রতি অফুরন্ত বিস্ময়ই রোমান্টিক সাহিত্যের মর্মকথা। এই বিস্ময়-বোধই রোমান্টিক কবিগণকে মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে আগ্রহী করে তোলে। রবীন্দ্রনাথও স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তার স্বরূপ আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব তাঁর রোমান্টিক কবি-প্রকৃতির সঙ্গে জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার মিশ্রণ তাঁকে একটি বিচিত্র মানসিকতা দান করেছিল। এই মানসিকতার একদিক যেমন সুদূর কল্পলোকে যাত্রা করেছে, তার অন্যদিক আবার তেমনি বাস্তবতার মধ্যে নিহিত। তাই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তাকে বাস্তব সম্পর্ক-রহিত কোন দার্শনিক প্রত্যয় বলে অভিহিত করা যায় না।

জীবন এবং মৃত্যু দুটিই অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তার উদয় হলেই অনিবার্যভাবে জীবনের কথা মনে পড়বে। জীবনের স্বাভাবিক পরিণাম মৃত্যু এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নূতন জীবনে উত্তরণ, নূতন জীবন সৃষ্টি

ইত্যাদির ইঙ্গিতও রবীন্দ্রকাব্যে প্রচুর। তাঁর কবিতা ও গানে একাধিকবার পুনর্জন্ম লাভ করার ইচ্ছা করেছেন—

আবার যদি ইচ্ছা কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের-ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।

—গীতালি, ৮৬ সংখ্যক কবিতা

এ শুধু তাঁর উচ্ছ্বাস নয়, তাঁর আন্তরিক কামনাও। মৃত্যু সম্পর্কে তিনি কোন প্রচলিত ধারণা গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজ শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং কল্পনায় মিশিয়ে একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারায় স্থিতিলাভ করেছেন যা তাঁর একান্ত নিজস্ব উপলব্ধি-জাত।

তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য-জীবনে মৌলিক বিশ্বাসের কোন পরিবর্তন হয় নি। যদিও কাব্য-রচনার পর্বে পর্বে প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য হয়েছে। প্রথম যুগের চিন্তাধারা রোমান্টিক ভাব-কল্পনার পরিমণ্ডলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষের যুগের রচনায় এসেছে মননশীলতা, যুক্তিপ্রবণতা এবং অনুমান। তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল অলংকার-বর্জিত ভাষায় তাঁর মৃত্যুচিন্তা শেষ পর্যায়ের কাব্যে রূপলাভ করেছে। কখনও কখনও তাঁর কবিসত্তা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সংশয়াকুল প্রশ্নে, আবার গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন তিনি স্বীয় উপলব্ধিতে।

রবীন্দ্র-কবিচিত্ত চির পথিক। জীবনযাত্রায় যিনি বহু বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, চিন্তা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রেও যে তিনি বিভিন্নতার দিকে আকৃষ্ট হবেন, এ স্বাভাবিক। তাই একই বিষয় জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। জীবনের প্রথম মৃত্যুশোক (যদিও এর পূর্বে তাঁর জননীর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু কবির স্বীকৃতিতে এই শোক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নি। আর সেই সময় কবি ছিলেন একান্তই বালক) অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু যেভাবে তাঁর নিজস্ব জগৎকে শূন্য করে দিয়েছিল, পরবর্তী কালে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুও তাঁর সেই জগৎকে এতখানি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে নি। এই মৃত্যু তিনি অনেকটা স্থৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এর থেকে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিভিন্নতা প্রমাণিত হয় না; শুধু তাঁর উপলব্ধির তারতম্যই প্রমাণিত হয়। জীবনের শেষের দিনগুলিতে যখন মৃত্যুর ছায়া

তাঁর চিত্তলোকে গাঢ় হয়েছে, সেই সময় মৃত্যুকে আর একভাবে বর্ণনা করেছেন, যার স্বাক্ষর বহন করছে জন্মদিনে ইত্যাদি কাব্য। এই কাব্যের প্রথম কবিতায় কবি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, এখানে তিনি মৃত্যুকে আদর্শায়িত করেন নি। নিজেকে 'অলক্ষ্য পথের যাত্রী' বলে বর্ণনা করেছেন। মৃত্যুর সঙ্গে তিনি অজানা রহস্যাবৃত পথের তুলনা করেছেন। কবিতাটিতে মৃত্যু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর উপলব্ধি লক্ষণীয়। এখানেই তাঁর শেষ পর্বের কাব্য-ভাবনার বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দেখেছেন নানাভাবে। কখনও বাস্তব আঘাতের পটভূমিকায় আবার কখনও রোমান্টিক কল্পনা-মিশ্রিত বেদনার রসে। শেষ পর্যায়ের কাব্যে বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে পৃথিবীকে নূতন করে ভাল লাগার ইতিবৃত্ত। ফলে মর্ত্যপ্রীতির সমান্তরালে মৃত্যু-চিন্তাটি আরও ব্যাপক আরও বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। এই পর্বের কাব্যে জীবন ও মৃত্যু, ধ্বংস ও সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গভীর দর্শন রূপায়িত হয়েছে। মৃত্যু সম্বন্ধে কবির অহেতুক মোহ কোনদিনই ছিল না, কিন্তু শেষ জীবনে মৃত্যুর নিকট-সান্নিধ্যে এসে কবিচিত্ত আরও মোহহীন, আরও নির্ভীক হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর বিভীষিকা কবির দূর হয়েছে, তাই তাঁর সমগ্র কীর্তির প্রতি পরম বৈরাগ্য—

> তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক
> অতীতের বাষ্পজাল হতে
> সদ্যনব জাগরণ দিক শঙ্খধ্বনি
> এ জন্মের নবজন্মদ্বারে।

—রোগশয্যায়, ৩৫ সংখ্যক কবিতা

মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু বিচার-বিশ্লেষণ ও কল্পনার পথ ধরে আসে নি। প্রত্যক্ষ মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁর জীবনে বার বার। একান্ত বাল্যকালে (১৮৭৫ সাল) মাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। কিন্তু সেই পরিচয় তাঁর মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করতে পারে নি, যদিও সাময়িক একটা বিচ্ছেদের দুঃখ সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ, পরবর্তী কালে পুত্র-কন্যাদের মৃত্যু, প্রিয় বন্ধুজনের মৃত্যু তাঁর উপর আঘাত হেনেছিল। এতগুলি মৃত্যু বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তাঁর মনে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই সমস্ত মৃত্যুকেই তিনি একটা নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দুটি মৃত্যুর ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মর্মমূলে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। একটি তাঁর তরুণ বয়সে এবং আর একটি তাঁর যৌবনের শেষ প্রান্তে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চব্বিশ বছর তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয় (১৮৮৪)। কাদম্বরী দেবী ছিলেন তাঁর কাব্য-জীবনের প্রেরণাদাত্রী এবং মাতৃহীন জীবনের নির্ভরস্থল। এই আঘাতে তাঁর মনের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেছিল। জগৎ ও জীবন তাঁর কাছে অন্ধকার ও বিষাদময় হয়ে উঠেছিল। মৃত্যুকে এত নিকটে অনুভব করা এই প্রথম। এই ঘটনার স্মৃতি সারাজীবন তিনি বহন করেছেন। এই প্রথম শোকের কথা তিনি জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'মৃত্যু-শোক' প্রবন্ধে বলেছেন। এই সময়ই কবি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। গভীর বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে 'মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি' তাঁর কাছে মনোহর হয়ে উঠেছিল। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁর মনের যত গভীরেই নাড়া দিক না কেন এবং তা তাঁর মনে আজীবন একটা বেদনার রেশ রেখে গেলেও কবির মনে মৃত্যু সম্বন্ধে কোন গভীরতর প্রত্যয় সৃষ্টি করে নি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মৃত্যু পত্নী মৃণালিনী দেবীর। তাঁর বয়স তখন একচল্লিশ। পত্নী-বিয়োগজনিত শোকের ফলশ্রুতি হল স্মরণ কাব্য-গ্রন্থ। এই সময়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে; যৌবনের সেই কূলপ্লাবী আবেগ এখন অস্তমিত। তাই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া এই মৃত্যুতে হয় নি। ইতিপূর্বে কবি চৈতালী থেকে ক্ষণিকা এবং তৎপরে নৈবেদ্য পার হয়ে একটা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। এই সময়ে তাঁর মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা যুক্ত হয়ে গেছে ওতঃপ্রোতভাবে। তাই কবি মৃত্যুকে ভয়হীন চিত্তে গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যুর মধ্যে ঈশ্বরের অখণ্ড আদর্শকে উপলব্ধি করেছেন—

জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

—নৈবেদ্য, ৯০ সংখ্যক কবিতা

পত্নীর মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে তিনি শোককে আদর্শায়িত করেছেন, তাই এই কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত শোকের অংশ সামান্য। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"এই কাব্যে শোককে উপলক্ষ্য করিয়া কবি মৃত্যুর দানকে গ্রহণ করিয়া বৃহত্তর সান্ত্বনার আনন্দলাভ করিতেছেন।"[১] এ ছাড়া তিনি জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে উপনিষদ-কথিত অনন্ত ব্রহ্মের লীলাকে অনুভব করেছেন। মৃত্যুই অমৃত প্রাপ্তির উপায়। মৃত্যুর আলোকে কবি মৃত পত্নীকে নূতন রূপে দেখেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কবির সঙ্গে কবি-পত্নীর চিরমিলন হল। জন্ম এবং মৃত্যু যে সত্যের এপিঠ-ওপিঠ, সত্য-ই যে চিরস্থায়ী রবীন্দ্রনাথের এই বোধের সঙ্গে Shelley-র মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণার একটা সাদৃশ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

> The one remains, the many change and pass ;
> Heaven's light for ever shines, Earth's shadows fly ;
> Life, like a dome of many coloured glass
> Stains the white radiance of Eternity,
> Until Death tramples it to fragments.
>
> —P. B. Shelley, Adonais, stanza 52

এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মনে বিরাজ করছিল বলে এই স্মরণ কাব্যে শোকের হাহাকার খুব উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয় নি। তবু স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত শোক-প্রকাশ দেখা গেছে। বিদগ্ধ সমালোচকের মতে "মৃত্যু সম্পর্কে মানুষ যত অভিজ্ঞতাই অর্জন করুক না কেন, প্রতিটি মৃত্যুই তাকে নতুন করে শোকগ্রস্ত করে।"[২] রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও একথা স্বীকার্য। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু তাঁকে মৃত্যু সম্পর্কে নূতন করে সচকিত করেছিল—

> প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার—
> আর কভু আসিবে না।
> বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,
> তারি সাথে শেষ চেনা।
>
> —স্মরণ, ৩ সংখ্যক কবিতা

কবি তাঁর মৃত পত্নীকে বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র অনুভব করেছেন এবং এইভাবে তাঁকে নূতন করে ফিরে পেয়েছেন।

---

১. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ. ৩৫৭

২. ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু (১৯৬৬), পৃ. ৭২

তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে।

—স্মরণ, ৮ সংখ্যক কবিতা

এইভাবে তিনি শোক-উত্তরণের পথ খুঁজে পেলেন। শোকে আবদ্ধ হয়ে থাকা তাঁর কবিচিত্তের ধর্ম নয় ;[১] উপরন্তু ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় এবং উপনিষদের রসপুষ্ট কবিচিত্তে আত্মার অমরতা এবং মৃত্যুতে ঐশ্বরিক লীলার প্রতিফলন একান্ত স্বাভাবিক।

জীবনে অর্জিত মৃত্যুর অভিজ্ঞতাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখলাম কবির জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মৃত্যুর ঘটনা স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যৌবনের মৃত্যু অভিজ্ঞতা এবং যৌবনোত্তর মৃত্যু-অভিজ্ঞতা বিভিন্নরূপে উপস্থিত হয়েছিল এবং মূলে ছিল কবির দৃষ্টিভঙ্গীর এবং উপলব্ধির তারতম্য। তেমনি কবির মৃত্যু-ভাবনার মধ্যেও এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগে বিশেষ করে নৈবেদ্য রচনার পূর্ব পর্যন্ত কবির কাছে মৃত্যুর বিনাশী মূর্তিটিই প্রধান হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে কবির চিন্তায় মৃত্যু ও জীবন একই মহান সত্যের প্রকাশক হয়ে উঠেছে। জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা মৃত্যুতে এবং মৃত্যুই নবজীবনের সূচনা করে। মৃত্যু চিরকালই রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য জাগ্রত করেছে, তাই তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ের সমস্ত কাব্যই মৃত্যু-চিন্তার ইঙ্গিত রেখে গেছে।

প্রথম জীবনের কাব্যগুলিতে সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে মানসী, সোনার তরী অতিক্রম করে চিত্রার যুগ পর্যন্ত কবি মৃত্যুকে নিষ্ঠুর বলে উপলব্ধি করেছিলেন। মৃত্যুতে সমস্ত কিছু শূন্যতায় পর্যবসিত হয়, একথা কবি কোনদিনই স্বীকার না করলেও মৃত্যুর আনন্দময় রূপটি কবি তখনও পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে পারেন নি। কড়ি ও কোমল-এর 'বৈতরণী', 'সিন্ধুগর্ভ', 'অক্ষমতা', ছবি ও গান-এর 'রাহুর প্রেম', সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর 'অনুগ্রহ', মানসীর 'শূন্য গৃহে', 'সিন্ধু তরঙ্গ', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', সোনার তরীর 'অক্ষমা', 'সোনার তরী', 'প্রতীক্ষা', চিত্রা-র 'স্নেহস্মৃতি', 'মৃত্যুর পরে' প্রভৃতি কবিতায় কবি মৃত্যুর ধ্বংসকারী বিষাদময় রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই ঈশ্বর পৃথিবী এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর একটি বিপরীত মনোভাব সৃষ্টি

১. স্মরণ, ২৫ সংখ্যক কবিতা

হয়েছে। মনে হয়েছে ঈশ্বর যেন নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুর মাধ্যমে এই আনন্দময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই বিশ্বাসে কবি দীর্ঘদিন শান্তিলাভ করতে পারেন নি। জীবন সম্পর্কে এই রকম একটি খণ্ডিত দৃষ্টি কোন জীবন-প্রেমিক কবির কাম্য হতে পারে না। স্বীয় উপলব্ধিতে তিনি এই বিচ্ছিন্নতার বেদনাকে অতিক্রম করতে চাইলেন। চিত্রা-র যুগ পার হয়ে তিনি নৈবেদ্য কাব্যের যুগে যেন একটি স্থির লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছেন। উপনিষদের শিক্ষা, বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ কবিকে জীবন এবং মৃত্যুর অপরূপ লীলার পরিচয় দিয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের এবং চিন্তাধারার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় এই নৈবেদ্য কাব্যে। এখানে কবি-প্রাণ অন্তর্যামীর চরণে ভক্তিনত। জীবন এবং মরণকে এখানে তিনি একটি আদর্শের সূত্রে গ্রথিত করেছেন। অবিচলিত চিত্তে দুঃখ-দৈন্যকে অতিক্রম করার মানসিক শক্তি অর্জন করেছেন। খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি-তে কবি এক অনাস্বাদিত-পূর্ব অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশ করেন। এই কাব্যগুলিতে দুঃখ, আঘাত, বেদনা সমস্ত অতিক্রম করে ভগবানকে একান্ত করে পাওয়ার বাসনা। তাই মৃত্যু সম্বন্ধে একটা আধ্যাত্মিকতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। এর পরই ভিন্ন ভাবধারা, ভিন্ন রীতি সম্বলিত অপরূপ কাব্য বলাকা-তে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চিন্তার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যে কবি গতিবেগের বন্দনায় মুখর, অনন্ত চলার মধ্য দিয়েই পৃথিবী জড়তার বন্ধন মুক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করছে। মৃত্যুস্নানে সে নিত্যই শুচি হচ্ছে—

> যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
> তুমি তাই
> পবিত্র সদাই।
> তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
> মলিনতা যায় ভুলি
> পলকে পলকে—
> মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
> যদি তুমি মুহূর্তের তরে
> ক্লান্তি ভরে
> দাঁড়াও থমকি,
> তখনি চমকি
> উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;

—বলাকা ৮ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা আপাত-বিরোধের দৃষ্টি দেখা গেছে। মধ্য পর্বে অর্থাৎ নৈবেদ্য-র পর রবীন্দ্রনাথের সেই দৃষ্টির বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হয়েছে এবং মৃত্যু-চিন্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার একটি সুষ্ঠু অন্বয় হয়েছে। এই অন্বয়বোধের জন্যই জীবন ও মৃত্যু ঈশ্বরের লীলা বলে কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছে এবং কখনও কখনও কবি জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য মৃত্যুকে অপরিহার্য মনে করেছেন। শেষ পর্যায়ে প্রবেশের পূর্বে রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যুচিন্তার এই ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত, রবীন্দ্র-চিন্তাধারাকে এইভাবে বিভক্ত করা যায় না। কারণ এক যুগের চিন্তায় পরবর্তী যুগের চিন্তার বীজ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তাই পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু সম্পর্কে যে একটি অখণ্ড চিন্তায় স্থিত হতে পেরেছিলেন তার আভাস প্রথম যুগের কাব্যগুলিতে বিরল নয়। তা না হলে মৃত্যুকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অনুভব করতে না পারলে সেই তরুণ বয়সে 'মরণের বৃহৎ পট-ভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি' মনোহর হয়ে উঠত না।

অন্তিম পর্বে রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা মৃত্যু-সচেতন। মৃত্যু-চিন্তার পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব শেষ পর্যায়ের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আজীবন মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ছিলেন তা দেখা গেছে। ক্রমাগত আন্দোলনে মৃত্যুর ভয়াবহতা তাঁর দূরীভূত হয়েছে। পূর্ব পর্বের মৃত্যু-চিন্তার সঙ্গে অন্তিম পর্বের মৃত্যুচিন্তার অন্যতম পার্থক্যটি হচ্ছে প্রথম জীবনে কতকগুলি ব্যক্তিগত শোক এবং উপলব্ধির মধ্যে মৃত্যু-ভাবনা আবর্তিত; কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন,—মৃত্যুর অনন্ত রহস্য এবং মহিমার দ্বারোদ্ঘাটনের অপেক্ষা মাত্র। মৃত্যুর অমোঘ পদধ্বনি জীবনে যতই নিকটবর্তী হয়েছে কবির কাব্য-ভাবনাও ততই রূপান্তরের পথে অগ্রসর হয়েছে। এই সময়ে কবি বারংবার অসুস্থতার মধ্য দিয়ে মৃত্যুদূতের আগমন প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৯৩৭ সালে তিনি নিদারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় চৌষট্টি ঘণ্টা অচেতন অবস্থায় অতিবাহিত করে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আরোগ্যলাভের পর তাঁর চেতনা হয়ে ওঠে ঋজু, স্বচ্ছ এবং শুচি। এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল প্রান্তিক-এর সুমহান কবিতাগুলি। দৈহিক পীড়া এবং জরা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, তাই দেহ যতই অশক্ত হয়েছে, মন হয়েছে ততই ভারমুক্ত, মোহমুক্ত, স্বচ্ছ এবং সবল। একেবারে শেষ চারটি কাব্যগ্রন্থ রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা-র কবিতাগুলিতে তীব্র অনুভূতি-

সম্পন্ন, শক্তিশালী মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় পৃথিবী থেকে বিদায়ের ক্ষণটি তাঁকে বারংবার সচকিত করে তোলে। তিনি অনুভব করেন যে পৃথিবীকে যা কিছু দেয় তা দেওয়া হয়েছে এবং পৃথিবীর কাছ থেকে যা কিছু প্রাপ্য তাও নেওয়া হয়ে গেছে, তবু এই জগতের আকর্ষণ তাঁর কাছে কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। জীবন ও মৃত্যু, ধ্বংস ও সৃষ্টির স্বল্পবাক্ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মানবাত্মার স্বরূপোদ্‌ঘাটনের প্রয়াস দেখা যায় এই শেষ যুগের কবিতা-গুলিতে। জীবন যে সমাপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই বেদনার ক্ষীণতম লেশ নেই এই কবিতাগুলির বক্তব্যে বা বাচনভঙ্গীতে। জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে কবির বলিষ্ঠ চিন্তাধারাই তাঁকে এক সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী করেছে। আত্মার অন্তহীনতার কথা তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন শেষ জীবনের কবিতা-গুলিতে। কবির শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে কয়েকটি সূত্রের আকারে ব্যক্ত করা যায়। তবে এই ধারণা বা বিশ্বাসগুলি যে শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ে এসে তিনি অর্জন করেছিলেন এমন মনে করা যায় না। অনেকগুলি মৌলিক ধারণা তিনি আজীবন অনুসরণ করেছেন।

ক

মৃত্যুস্নানে জীবন নবীন হয়ে ওঠে একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তিম পর্বের কাব্যে একাধিকবার বলেছেন। মৃত্যু অর্থে অবসান, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে পারেন নি। হে মহাপ্রাণ বা অনন্ত প্রাণ জীবনের মধ্যে প্রকাশিত, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তো তার প্রবাহ রক্ষা হয়। নটীর পূজায় বলেছেন—

মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা

তাই মৃত্যুর অন্তরের কথাই হচ্ছে হারিয়ে ফিরে পাওয়া। মৃত্যুতে আপাত-শেষ, কিন্তু সেই শেষ তো অসীম অশেষেরই অংশ। এই কথারই স্বীকৃতি—

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
জ্যোতিহীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলঙ্কার।

—পূরবী, 'শেষ'.

পুরনো জীবনকে নূতন এবং কলুষমুক্ত করে মৃত্যু। তাই প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যু শুধু অমোঘ নয় অপরিহার্যও।—

জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা।

—পূরবী, 'পদধ্বনি'

মৃত্যুর মধ্যে এমন একটি শক্তি কবি আবিষ্কার করেছেন যা জীবনের সর্বকলুষ হরণ করে জীবনকে পুনরায় উজ্জ্বল করে তোলে।—

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি।
অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চির পুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি।

—মহুয়া, 'বোধন'

পরিশেষ-এর 'সান্ত্বনা' কবিতার মধ্যেও কবি এই কথাই বলেছেন। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কবি জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, জীবন সৃজনের হোমানলে আপনাকে আহুতি দিয়ে আবার নূতন হয়ে ওঠে, এই লীলাই নিত্যকাল ধরে চলছে—

নিজেরে আহুতি দিয়া নিত্য সে নবনী হয়ে উঠে,—
প্রাণেরে ভরিয়া তুলে নিত্যই মৃত্যুর করপুটে।

খ

মৃত্যু সম্বন্ধে কবির আর একটি বিশ্বাস হল মৃত্যু ধ্বংস বা বিচ্ছেদ নয়—এ হল জীবনের রূপ পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগ আছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্য ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়, ২২ শ্লোক

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নূতন দেহ ধারণ করে।

পূরবী-র 'শীত' কবিতাতেও এই মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। জীবনে মৃত্যুর আবির্ভাব মহা দুঃখজনক বলে মনে হলেও বিশ্ব-জুড়ে জন্মমৃত্যুর প্রবাহ অবিরাম বয়ে চলেছে। মৃত্যুতে জীবনের অবসান হয় না, তাই কবির দৃঢ় প্রত্যয়—

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়—
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান,
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।

শীতের পরেই বসন্তের আবির্ভাব। জরাজীর্ণ পৃথিবীকে বসন্তই শোনায় নব আশ্বাসবাণী—জীবনের বার্তা।

শীতের রথের ঘূর্ণি ধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জান।
... ...
নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে।
ম্লান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তারে।

—মহুয়া, 'বোধন'

গ

মৃত্যুকে কবি জীবন থেকে জীবনান্তরে যাবার উপায় বলে মনে করেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটি জীবন অন্য জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এ যেন একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়া। প্রদীপেরই যা

পরিবর্তন, শিখাটি অপরিবর্তনীয়, তেমনি একটি জীবনের অবসানে আত্মার পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনে সীমার বাধা অপসারিত হয়, সে অসীমের সঙ্গে যুক্ত হয়। জীবনের এই প্রবাহ নিত্যকাল চলছে, কোন শক্তিই তাকে থামাতে পারে না।

'যেয়ো না, যেয়ো না' বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন।
কোথা সে বন্ধন
অসীম যা করিবে সীমারে।
সংসার যাবারই বন্যা, তীব্র বেগে চলে পরপারে
এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে।
... ...
মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান ;

—পরিশেষ, 'ধাবমান'

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসেও কবি এই বিশ্বাসে অটুট ছিলেন। প্রান্তিক রচনাকালে কবি মৃত্যুস্নানে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। মৃত্যুদূতের স্পর্শে কবি পুরাতন জীবনের সবকিছু ত্যাগ করলেন, কিন্তু এই পৃথিবী ও জীবনের প্রতি তাঁর অসীম কৃতজ্ঞতা। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন-সংগ্রামের শেষে মানুষ নবতর বিজয়যাত্রা করে, একথা বলেছেন প্রান্তিক-এর ৭ সংখ্যক কবিতায়—

ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, ···
... ...
আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয় যাত্রায়।

—প্রান্তিক, ৭ সংখ্যক কবিতা,

ঘ

কবি উপলব্ধি করেছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন পরিপূর্ণতা পায়। মৃত্যুতে জীবনের পরিবর্তন ঘটে বটে, কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্য দিয়েই জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জীবন-মৃত্যুর প্রবাহের ভিতর দিয়ে জগতের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা হয়। মৃত্যু না থাকলে পৃথিবী নীরস এবং একঘেয়ে বলে মনে হত। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ক্ষণিক জীবনে সব সময় চরিতার্থ হয় না। মৃত্যুর পারে, অদৃষ্টের উপকূলে তারা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। কবি কল্পনায় দেখেছেন তাঁর জীবনের সমস্ত রূপ, বর্ণ, রস, প্রেম ও সৌন্দর্য মৃত্যুর পরপারে—পূর্ণরূপে বিরাজ করছে।

তোমার অরূপতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে,
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।
যে-সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
যে চির মধুর।
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।

—পূরবী, 'বৈতরণী'

ঙ

উপরোক্ত চিন্তার পরিপূরকরূপে কবির মৃত্যু সম্পর্কে আর একটি চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে মৃত্যুকে কবি পথিকের প্রতি পথের আহ্বান-রূপে দেখেছেন। জীবনে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবস্থান আর মৃত্যুতে অসীমের অভিমুখে মানবাত্মার যাত্রা।

জন্ম সে যে গৃহ মাঝে গৃহীরে আহ্বান।
মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জনে
হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী।

অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর,
বিদেশের বিরাগী নির্ঝর
বিদায়-গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনন্তের মন্দির-সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে,
দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথ রাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরি ডাক।

—পূরবী, 'মৃত্যুর আহ্বান'

কবি নিজেকে চির-পথিক রূপে কল্পনা করেছেন। পথ চলাতেই তাঁর আনন্দ। উদার আকাশে তিনি তাঁর মুক্তি অনুভব করেছেন।

আমি-যে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে
দূরের আকাশে চেয়ে ;

—বীথিকা, 'পথিক'

মানুষের চির-পথিকরূপী অন্তরতম সত্তাকে পৃথিবী ও জীবন আবদ্ধ রাখতে পারে না। পৃথিবীর বন্ধন, জীবনের আসক্তির ডালি ও অপবিত্র সঞ্চয় মানুষ ভগ্ন মৃৎপাত্রের মত ফেলে চলে যায়। মৃত্যুর আহ্বানেই মানুষ যাত্রা করে—

হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণ লিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

—সেঁজুতি, 'জন্মদিন'

চ

মৃত্যুতে কোন বিশেষ জন্মের বিনাশ ঘটে—কিন্তু প্রাণ বিনষ্ট হয় না। সে বিশ্বব্যাপী অনন্ত প্রাণ-প্রবাহে মিশে যায়। এই অনন্ত জীবন-প্রবাহ চিরন্তন। ক্ষণিক এই পার্থিব জীবনের সমাপ্তি আছে, কিন্তু মহাজীবন-প্রবাহ অনন্ত। এই জীবনলীলা পৃথিবীর জড় ও জীবে সর্বত্র প্রসারিত। এই সূত্রে বিশ্বের সকল বস্তুই গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ।

পূরবীর 'কঙ্কাল' কবিতার মধ্যে কবির এই ধারণার ছায়াপাত হয়েছে। একটা পশুর কঙ্কাল মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে কবির মনে হয়েছে—" প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে/ভাঙাপাত্র পড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে।" কিন্তু কবি এই খণ্ড দৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না। কারণ তিনি তো কেবল জড়-দেহধারী পশু নন। নশ্বর দেহ বিনষ্ট হলেও তাঁর অপার্থিব কবিত্ব সে তো চিরন্তন ও নিত্য-আনন্দোদ্ভূত। এই সম্পদ তো দেহের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হতে পারে না। মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন প্রাণ অবস্থিত তার বিনাশ কখনো হতে পারে না। এই-ই কবির একান্ত বিশ্বাস—

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে ?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয় ;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি নয়—জীবন অসীমের অংশ। মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছে কবি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনকে নূতনভাবে উপলব্ধি করেছেন। মানুষের এই ক্ষণিক জীবনেই কবির ভূমাবোধ হয়েছে। মানুষের এই ক্ষণস্থায়ী দেহের মধ্যেই মুক্ত আত্মা বাস করে। সুতরাং মানুষ জরা-ধ্বংস-মৃত্যুর অধীন নয়, সে অপরাজেয় শাশ্বত ও মহান। চিরন্তন মানবের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন—

নবজীবনের সংকট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম-মাঝে পথ করি দিবে,
জীবনের ব্রত তব।

—পরিশেষ, 'অগ্রদূত'

কবি অনুভব করেছেন যে, মানবজীবন চির জীবনের একটি অংশ। যে মহিমা জাগতিক সীমা ছাড়িয়ে অনাদিকাল ব্যাপ্ত হয়ে আছে, যে চিরন্তন মানবত্ব মৃত্যুকে পরাভূত করে বিরাজ করছে, কবি নিজের মধ্যে তাকে উপলব্ধি করেছেন। মানবজীবন অনন্তের অংশ, নিত্যমুক্ত নিরাসক্ত—

সংসারের ঢেউখেলা
সহজে করি অবহেলা
রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে
মুক্ত রাখে পাখাটারে,
উর্ধ্ব শিরে পড়িছে আলো এসে।

—বীথিকা, 'নবপরিচয়'

ছ

সমগ্র বিশ্ব চরাচরে একটি অনন্ত জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে। জন্ম এবং মৃত্যু তার দুটি অবস্থা মাত্র। জন্ম এবং মৃত্যুর অবিরাম ঘটনায় এই জীবনপ্রবাহ সচল থাকে, রবীন্দ্রনাথ জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি। জন্ম এবং মৃত্যু সেই পরম সত্তার দুটি দিক। উপনিষদে বলা হয়েছে যে অসীম রসাস্বাদনের জন্য মানুষের সীমায় জন্মগ্রহণ করেছেন—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।"[১], অর্থাৎ তিনি কামনা করলেন 'আমি বহু হব, আজি জন্মগ্রহণ করব।'

কবি মনে করেন যে, মানুষের নিত্য-সত্তা, যাকে কবি নিত্য-আমি বলে অভিহিত করেছেন, তা অসীমেরই অংশ। এই অসীমই মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য—

ওদিকে অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।

—শ্যামলী, 'আমি'

জ

রবীন্দ্রনাথ জীবন-মৃত্যুকে বরবধূর সম্পর্কের রূপকে কল্পনা করেছেন। মানুষের জীবনে বরবধূর সম্পর্কের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে কবি জীবন-মৃত্যুর

১. তৈত্তীরীয় উপনিষদ্—২/৬

লীলায় সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। বর ও বধূর মধ্যে যেমন দূরত্বের মধ্য দিয়েই মিলনের আনন্দ নিবিড় হয়, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মিলন হয় দুঃখের মধ্য দিয়েই।

এ-পারে চলে বর, বধূ সে পরপারে
সেতুটি বাঁধা তার মাঝে।

—বিচিত্রিতা, 'বরবধূ'

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের মর্মকথাও এই। মৃত্যুর আগমনে ঐশ্বর্য নেই, সমারোহ নেই ; আছে ভীষণের সুন্দর রূপ। এখানে রাজা ও রাণীর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কবি জীবন-মৃত্যুর লীলাই প্রত্যক্ষ করেছেন।

বধূ ও বরের মধ্যে যেমন প্রেমের বন্ধন নিবিড় তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে গভীর সম্পর্ক। মৃত্যু ছাড়া অনন্তকে উপলব্ধি করা যায় না।

সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চির জীবনের অম্লান স্বরূপ।

—শেষ সপ্তক, ২৩ সংখ্যক কবিতা

মরণ-বরের উদ্দেশে জীবন-বধূর অনন্তকালীন অভিসার। কবির শেষ জীবনের কাব্যেও মৃত্যু এসেছে বর-বধূর সাজে। আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনির মধ্যেও কবির চোখে মৃত্যুর রূপ ভয়াবহ নয়, তখনও মৃত্যু তাঁর কাছে বর ও বধূর সম্পর্কের মতই মধুর।

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা ;
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ ;
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তরের পানে।

—রোগশয্যায়, ৩৭ সংখ্যক কবিতা

কবি জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে নটরাজের নৃত্যের তুলনা করেছেন। জীবন এবং মৃত্যু নটরাজের দুই পদক্ষেপ; মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি নটরাজের নৃত্যের আনন্দকেই উপলব্ধি করেছেন। মৃত্যু তাঁর কাছে প্রাণেরই উৎস, নটরাজের বিশ্বছন্দের লীলা।

—যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নব-শষ্পদল;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কালপানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্ম-মরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে;

—নটরাজ, 'উদ্‌বোধন'

জীবন-মৃত্যুকে কবি আবার কখনও কখনও পরম একের লীলা বলে করেছেন। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লীলাবাদীদের সাদৃশ্য আছে। সেই পরম এক; তিনি নব নব সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তাঁর লীলার প্রকাশ করেন। তাই মৃত্যুর মধ্যে কবি একটি আনন্দজনক দিককে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি।
অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চিরপুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি।

—মহুয়া, 'বোধন'

সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য লীলার আনন্দ ভোগ করা। সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য-দিয়েই বিধাতা রসোপভোগ করেন। মৃত্যু জীবন থেকে জীবনান্তরে যাবার মধ্যে ক্ষণিক বিরাম মাত্র। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বিধাতা জীবনকে নবীন করে তোলেন।

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ ক্ষেত্রে।

—শেষ সপ্তক, ৩৯ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চিন্তায় উপরেরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য শেষ পর্যায়ের কাব্যে বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গীতে অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

জীবন-সায়াহ্নের পূরবী কাব্যটি বিচিত্র চিন্তার পরিচয় বহন করছে। প্রতিটি কবিতাতেই একটি বিষণ্ন সুর। তিনি অনুভব করছেন রিক্ত শীর্ণ তাঁর জীবন বর্ষাশেষের নির্ঝরিণীর মত মিলিয়ে আসছে। তবুও এই অপরাহ্ণবেলায় দিনের আলো থাকতে থাকতে তিনি গান গেয়ে নিতে চান, ঘোষণা করতে চান যা তিনি পেয়েছেন সবই 'ভালো'। এই জীবন যেমন সুন্দর, মৃত্যুও তেমনি মাধুর্যময়; কারণ মৃত্যুই নিয়ে আসে নূতন প্রাতের আশ্বাস।

এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা,
গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।

—পূরবী, 'পূরবী'

এই কবিতাটিতে কবির মর্ত্যপ্রীতি ও অতীত-চারণার সঙ্গে চকিতে মৃত্যু-চিন্তাও আভাসিত হয়ে উঠেছে। মৃত্যু এখানে কবিকে হতাশাগ্রস্ত করে নি বরং আশান্বিতই করেছে। কবি এখানে মৃত্যুর অনিবার্যতাকে স্বীকার করে মৃত্যুকে একটি সহজ স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং মানবজীবনের পরিণাম সম্বন্ধে কবি সচেতন। তাই অন্তিম যাত্রার পূর্বে পুনর্বার তিনি সত্যের পটভূমিকার উপর জগৎ ও জীবনকে স্থাপন করে আস্বাদ করতে চাইলেন। পূরবী কাব্যের যে কবিতাগুলিতে মৃত্যু-চিন্তার আভাস পাওয়া যায় সেখানে তাঁর এই ভাবধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

'যাত্রা' কবিতাটিতে সমগ্র শরৎ-প্রকৃতির যাত্রার আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কবি নিজ জীবনের যাত্রার আয়োজন করছেন। আশ্বিনের রাত্রি শেষে 'মরণ কূলের উৎসবে'র যাত্রী ঝরে-পড়া শিউলি ফুল তাদের জীবন-অবসানকারী প্রভাতসূর্যের আলোর দিকে হাস্যমুখে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে বিদায় নিচ্ছে। যাত্রার

পথ কেতকী-রেণুতে আচ্ছন্ন, দিগ্বধূর বেণুতে বাজছে ছুটির গান। নদীর কল্লোলিনী স্রোতেও সেই যাত্রার ছন্দ। বাউল বাতাস বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত করছে সমগ্র প্রকৃতিকে, কাশের মঞ্জরীর উদ্দামের পথে আনন্দিত সর্বনাশে যাওয়ার আকাজ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে বাতাসে। এরা সবাই যেন কবিকে আহ্বান করছে সেই অনন্ত যাত্রায়। কবিও সেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত—

…'যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যু দূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অন্তরের অঙ্গদে কুণ্ডলে।

এখানে কবি আশাবাদী। তিনি অনুভব করছেন তাঁর অকৃতার্থ আশা অসিদ্ধ সাধনা সমস্তই চরিতার্থ হবে মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে।

'উৎসবের দিন' কবিতায় কবি আনন্দোৎসবের মধ্যেও একটা 'দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস' উপলব্ধি করছেন। জীবনের সকল আনন্দ-মুহূর্তের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়িত্বর ব্যথা জেগে আছে। প্রকৃতির 'নবীন পল্লব পুটে', 'আম্রের মুকুল-গন্ধে' যেন অশ্রুর অশ্রুতধ্বনি! জীবন-সায়াহ্নে মনে হচ্ছে যে কতবার জীবনে সৌভাগ্য-লগ্ন এসেছিল। বসুন্ধরা ছিল 'আশার লাবণ্যে ভরা'। আজ উৎসবের দিনে সেদিনের স্মৃতি কবির জগৎকে উদাস করছে। উৎসবের বাঁশি দূরের বার্তা নিয়ে আসছে। কবি সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত—

যায় যাক্, যায় যাক, আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মুহূর্তের নৃত্যছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

'ছবি' কবিতায় কবি জাহাজে বসে সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্তের বর্ণ-সমারোহের সঙ্গে এই জগৎ ও জীবনের সাদৃশ্য অনুভব করছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, আকাশপটের এই ক্ষণকালীন বর্ণচ্ছটা 'উদাসীন রজনীর' আগমনে লুপ্ত হয়ে যাবে। তেমনি

মানুষের জীবনেও সুখ-দুঃখ দিয়ে গড়া ক্ষণকালের লীলাবৈচিত্র্য; মৃত্যুর-আগমনে সেই লীলার অবসান। এই বর্ণময় জীবন এবং রহস্যময় মৃত্যুই সৃষ্টির চিরন্তন রহস্য—

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাজাইতে চাস।

এখানে কবি মৃত্যুর মধ্যে আপাত-সমাপ্তি—এই কথা বলছেন; কিন্তু একেবারে শেষে তা বলছেন না। জীবন ও মৃত্যুর লীলা অনন্ত। শেষ দুটি পঙক্তিতে কবির কাজ এবং কাব্যের চিরন্তনতার প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করছেন।

পূরবীর অধিকাংশ কবিতাতেই দেখি কবি মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই যাত্রার আহ্বান কবির কাছে এসেছে নানাভাবে। 'ঝড়' কবিতাটিতে তিনি রুদ্রের আবির্ভাব উপলব্ধি করেছেন। সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে কবি-প্রাণ সমস্ত বন্ধনের উর্ধ্বে ছাড়া পেয়েছে এবং রুদ্রের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে। ঘরের স্বস্তি, তীরের বন্ধনই জীবনের শেষ কথা নয়। 'বাসনা অন্ধ, নিশ্চল শৃঙ্খলবদ্ধ' দূর করে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়াই জীবন। তাই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে রুদ্র দেবতার ন্যায় তিনিও পান্থ—

এস গো ধ্বংসের নাড়া,
পথভোলা, ঘর ছাড়া,
এসো গো দুর্জয়।
ঝাপটি মৃত্যুর ডানা
শূন্যে দিয়ে যাও হানা
"নয় নয় নয়।"

'পদধ্বনি' কবিতায় কবি আপন অন্তরে এক 'অজানার যাত্রী'র পদধ্বনি শুনছেন, যিনি নির্মম, উদাসীন, আপন চলার ছন্দে চিরদিন পিছনের পথ মুছে চলছেন, যিনি নিত্য শিশু, নিজের সৃষ্টিকে নিজেই ধ্বংস করেছেন। এই খেলার মধ্যেই তিনি জগতের একটি স্বাভাবিক নিয়মকে আবিষ্কার করেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন নবরূপ লাভ করে—

জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা।

ধ্বংসই যে নবসৃষ্টির কারণ, জগৎ ও জীবন নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর সার্থকতায় উপনীত হয় ; এই ধারণা কবি আজীবন পোষণ করে এসেছেন। পূরবীতে পৌঁছে কবি এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুতে যে জীবনের অবসান নয়, রূপান্তর মাত্র, একথা তিনি বলাকা কাব্যে বার বার বলেছেন—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

—বলাকা, ৮ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই চিন্তাধারা অনেক প্রবন্ধের মধ্যেও প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি শুধুমাত্র মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাকে স্বীকার করেন নি, মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তাকেও সমানভাবে স্বীকার করেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সৃষ্টির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা হয়—"জগৎ রচনাকে যদি কাব্য হিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত; জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেখানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধি মন্দিরের মতো অত্যন্ত সংকীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত।····মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে, এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে।"[১] জীবন হচ্ছে মরণের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত নূতনকে প্রকাশ করা। মৃত্যুর সূত্র দ্বারাই জীবনের সঙ্গে জীবন যুক্ত।—

১. পঞ্চভূত (১৯৬১), পৃ. ১৪৩

"মৃত্যুর সূত্রে প্রাণের মালাকর অমনি করে জীবনের ফুলকে নবীন করে গেঁথে তুলেছেন।"[১] মৃত্যুর ধারাই চরম সত্য নয়, তা হলে এতদিনে পৃথিবী শূন্য হয়ে যেত, কিন্তু পৃথিবীতে নিত্য নূতন প্রাণের লীলা, আর এই লীলাবৈচিত্র্যকে সার্থকতা দান করে মৃত্যু।

মানুষের জীবনে মৃত্যু যেমন অসীমের সন্ধান দেয় তেমনি বিশ্ব জগতেও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শুভ্র সমুজ্জ্বল সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে। জীবনও অমৃতময় হয়ে ওঠে সীমার নিগড় ভেঙে।

> জ্যোতির্হীন সীমা
> মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
> যায় গলি,
> গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
> হয় সে অমৃতপাত্র, সীমার ফুরালে অহংকার।
>
> —পূরবী, 'শেষ'

মৃত্যু মুক্তির মধ্য দিয়ে জগৎকে যে অমৃতের আস্বাদ দান করে, কবি 'সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত' লাভের জন্য তৃষিত। সেই অমৃতময় স্পর্শে চরম বেদনার মধ্য দিয়ে অপূর্ণ দুঃখ, অসম্মান সার্থকতা লাভ করবে।

'অবসান' কবিতাটিও কবির শেষ পর্যায়ের মৃত্যু-চিন্তার একটি সার্থক নিদর্শন। এখানে কবি নিজ জীবনে মৃত্যুর আগমন উপলব্ধি করেছেন। পারের ঘাট থেকে তরী ছায়ার পাল তুলে প্রাণের উপকূলে এসে পৌঁছেছে। বিদায়-বাঁশির করুণ সুর গোধূলি-আলোটিকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। তাঁর মন যাত্রার জন্য প্রস্তুত। বিদায়ের ক্ষণটিকে তিনি যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন—

> সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
> নিভৃত খনে আপন মনে গাই।

কবির প্রথম যুগের মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে এই কবিতার মৃত্যুচিন্তার একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর একটা অনির্দেশ দুঃখানুভূতি এবং আরও কিছুদিন পরে জগৎ ও জীবন-মৃত্যুর অপরিহার্যতা সম্পর্কে একটি স্থির প্রত্যয় দেখা যায়। কিন্তু শেষ যুগে মৃত্যুর ক্রমাগ্রসরমান ছায়া যতই জীবনের উপর

১. রবীন্দ্ররচনাবলী ১৬শ খণ্ড (১৯৬৫), পৃ. ৪৫৫

এসে পড়েছে, মৃত্যু সম্পর্কে কবির ধারণা হয়েছে ততই স্থির, অকম্পিত এবং ভয়হীন। এই মৃত্যুর জন্য তাঁকে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করতেও দেখা যায়।

'মৃত্যুর আহ্বান' কবিতায় তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন পথিকের প্রতি পথের আহ্বানরূপে। জীবন হল সীমার মধ্যে অবস্থানের আহ্বান এবং মৃত্যু হল অসীমের ডাক। এই প্রসঙ্গে কবির অভিমত হল "আমাদের দেশের চিরকালের ব্যবস্থাই এই যে, মৃত্যুর সময়ে কাহাকেও ঘরে পুরিয়া রাখা হয় না। তাহাকে মুক্ত প্রাঙ্গণে আকাশের তলে বাহির করিয়া রাখা হয়। যখন মানুষের জন্ম হয়, তখন সে আসে গৃহের কোলে গৃহের অতিথি হইয়া; আর যখন মৃত্যু আসে তখন সে অনন্তের যাত্রী। মৃত্যুর সময়ে ঘরের মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিলে ঘরের বস্তুর মমতা যাত্রায় বিঘ্ন ঘটায়——......ইহাতে আমার পরাভব ঘটিতেছে মৃত্যুর কাছে, আর যখন মরণোন্মুখ ব্যক্তি বাহিরে চলিয়া যায়, তখন তাহার মনে হয় সে মৃত্যুকে আগ বাড়াইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিয়াছে; সেখানে তাহার জয়, মৃত্যুর পরাভব।"[১] এই ভাবটি এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে—

> মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জনে,
>
> ... ...
>
> পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে।
> দুয়ার রহিবে খোলা, ধরিত্রীর সমুদ্রপর্বত
> কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
> শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক্—
> মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।

'সমাপন' কবিতাটিতেও দেখি কবি আপন প্রাণে 'চরমের পরম উদ্দেশ' লাভ করেছেন। অস্তরবি, সন্ধ্যাতারা, নীরব রাত্রি, সকলেই তাঁকে 'সকল বাণীর শেষ সাগর-সংগম তীর্থ-তীরে'র ইঙ্গিত দিচ্ছে। কবি তাই সেই পরমের উদ্দেশে তাঁর শেষ নমস্কার নিবেদনের জন্য প্রস্তুত। এখানেও দেখা যায় অস্ত গোধূলির ছায়া জীবনে এসে পড়েছে; কবি ধৈর্য এবং প্রশান্তির সঙ্গে সেই নীরব রাত্রিকে আহ্বান করেছেন।

জীবনের সমাপ্তি মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার চিরন্তন সমাপ্তি ঘোষণা করে না। মৃত্যুর পরপারে তারা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে।

১. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরশ্মি পশ্চিম ভাগ (৩য় সং), পৃ. ২৬৩-৬৪

'বৈতরণী' কবিতায় কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন। মৃত্যুর খেয়া কবির জীবনের ঘাটে এসে অনেকবার ভিড়েছে। তাঁর প্রাণের আশা, গানের সাথি এবং দিবসের আনন্দকে নিয়ে গেছে রূপহীন কালহীন মরণের পরপারে। তিনি অনুভব করেছেন তাঁর জীবনের রূপ, রস, আনন্দ-উপভোগ সমস্তই মৃত্যুর অদৃশ্য উপকূলে অনির্বাণ আলোকে অক্ষয় দীপালিকা সাজিয়েছে—

তোমার অরূপ তলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে ওঠে,
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।

এখানেও কবির চক্ষে মৃত্যুর অবিনাশী রূপটিই ফুটে উঠেছে।

'কঙ্কাল' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে একটি অখণ্ড দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। এখানে কবি আশ্চর্য নির্ভীক এবং নিঃশঙ্ক। একটি পশুর কঙ্কাল তাঁর পরিণামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

তোমারও প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে।

কিন্তু কবি একথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। জড় দেহধারী পশুর জীবন হয়ত মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু মানুষের জীবনের শেষ পরিণাম মৃত্যু হতে পারে না। কবি তাঁর কাব্য-সম্পদ, সৌন্দর্য-সাধনার সমাপ্তি মৃত্যুতে—এটা মানতে পারেন নি, কারণ তাঁর চোখে জীবন চিরন্তন, অবিনশ্বর এবং অপার্থিব—

মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।

তিনি রূপের পদ্মে অরূপ মধু পান করেছেন। তাই একটি নির্দিষ্ট সীমায় যে জীবনের পরিসমাপ্তি একথা তিনি স্বীকার করতে পারেন না—

নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

জীবন-মৃত্যুর অখণ্ড রূপ উপলব্ধি করে মৃত্যুভয় তাঁর দূরীভূত হয়েছে।

কবির জীবন সায়াহ্নের মৃত্যু ভাবনা কোন কোন স্থানে তত্ত্ব ও দার্শনিকতা-মণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ভাব-গাম্ভীর্যে সমৃদ্ধ 'অন্ধকার' কবিতাটিতে তিনি অন্ধকারের ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছেন। জীবনের পরপারে যে অন্ধকার

তা শুধু শূন্য নয়, তার মধ্যেই আছে পূর্ণতা। অন্ধকারের মধ্য থেকেই আলোকের উৎপত্তি। জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে তা অন্ধকারের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। একথা নানা স্থানে স্বীকৃত হয়েছে—

> ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রেহ প্রকেতম্।[১]

'প্রথমে রাত্রি ও দিন পৃথক ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকারে—অন্ধকার-আবৃত ছিল।'

বাইবেলে বলা হয়েছে—"...and darkness was upon the face of the deep...and God said—Let there be light and there was light."[২] অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে—"And the light shineth in darkness ; and the darkness comprehendeth it not."[৩]

পূরবী-কাব্যগ্রন্থের 'সমুদ্র' কবিতাতেও কবি বলেছেন যে অন্ধকারের মধ্য থেকেই দিন তার শক্তি সঞ্চয় করে। 'অন্ধকার' কবিতাটিতে কবির বক্তব্য, উদয়াচল এবং অস্তাচলের পশ্চাতে যে অন্ধকার তা নবসৃষ্টির পূর্বের মহান স্তব্ধতা। তাই কবি জীবনের প্রান্তে এসে অন্ধকারের কাছে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্রামের জন্য যাতে আবার নূতন উদ্যমে জীবন শুরু করতে পারেন—

> আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
> গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
> হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
> যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
> তোমার চরণে নত হল।
> যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণ বেশে
> নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
> বলে "দ্বার খোল"।

দিনের আলোয় উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না। তাই কবি অন্ধকারের গহনে প্রবেশ করে প্রকাশের অপেক্ষায় সঞ্চিত আলোকের ন্যায় আপন সৃষ্টি-

১. ঋগ্বেদ, ১০।১২৯
২. The Bible, Genesis, 12. 3
৩. The Bible, St. John, 12. 3

সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে চাইছেন। তিনিও পুনর্বার নবজীবন লাভ করবেন। সমগ্র জীবনে সঞ্চিত, যশ, মান, অর্থ আজ এই জীবন-সায়াহ্নে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে, তা এই মহান অন্ধকারের সমীপবর্তী হওয়ার যোগ্য নয়। তাই কবি তাঁর সেই খ্যাতির বোঝাকে পশ্চাতে ফেলে যেতে ভীত নন। মহাকালের দরবারে কবির এই সঞ্চয় মূল্যহীন। কিন্তু জীবনে তিনি এমন একটি জিনিস লাভ করেছেন যা চিরদিনই অম্লান হয়ে বিরাজ করবে—যাত্রাসহচরী কাব্যলক্ষ্মীর দান তাঁর কবি-প্রতিভা। এ জন্মের সেই দান তিনি অন্ধকারের থালায় যেখানে অসংখ্য নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে সেখানে রেখে দেবেন। অন্ধকারের কোন পরিবর্তন নেই—তাই সে নিত্য নবীন। অন্ধকারের মহান স্তব্ধতা ও ধ্যান গাম্ভীর্যের অন্তরাল থেকে কবে একদিন তাঁর কবিত্ব-শক্তির প্রকাশ হয়েছিল তার ঠিক নেই। অকস্মাৎ একদিন তাঁর কাব্য-প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। আজ জীবনের শেষ প্রান্তেও তা অমলিন, কোন বৈষয়িক বোধ একে মলিন করতে পারে নি। সেই অম্লান কবিত্ব-শক্তিকেই তিনি অন্ধকারের পায়ে অর্পণ করতে চান। এই কবিত্ব শক্তির দ্বারাই তিনি অন্ধকারের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্ধকারের সঙ্গে তাঁর প্রাণের চিরন্তন সম্বন্ধকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাই তিনি আজ উপলব্ধি করছেন যে অন্ধকার সমাপ্তি নয়, তা একটা নূতন আরম্ভের সূচনা এবং সমস্ত সৃষ্টির আধার। অন্ধকারকে আর তাঁর ভয় নেই, কারণ কবি-প্রাণের সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, এবং অন্ধকারই তাঁর কবি-প্রতিভার আদি গঙ্গোত্রী—

> আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান
> আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
> তোমার আকাশে।

এই কবিতায় সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা এবং পরবর্তী অবস্থার সঙ্গে সৃষ্টির একটি গভীর সম্বন্ধ দেখান হয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কে কোন দুঃখজনক বা নৈরাশ্যজনক ধারণা এখানে স্থান পায় নি।

মহুয়া ভিন্ন স্বাদের কাব্য। এই কাব্যগ্রন্থটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে প্রকাশিত হয়েছিল। মহুয়া মূলতঃ প্রেমানুভূতির কাব্য। কিন্তু এই কাব্যে মৃত্যুচিন্তা একেবারে অনুপস্থিত নয়। কাব্যটির ভাবধারায় আকস্মিকতা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মূল চিন্তাধারার সঙ্গে কোনই মিল নেই, একথা বলা যায়

না। তাই শেষ প্রহরের কাব্যগুলিতে মৃত্যুর কথা যেভাবে উল্লিখিত হতে দেখি অর্থাৎ মৃত্যুকে নবজীবন লাভের উপায়-স্বরূপ অনুভব করার যে প্রয়াস দেখা যায় মহুয়া-তেও তার ব্যতিক্রম নয়। 'বোধন' কবিতাটিতে বলা হয়েছে শীত জগতে জড়তা আনে, প্রাণের স্পন্দনকে শিথিল করে। কিন্তু এই শীতই নবীন বসন্তের আগমনের আশ্বাসবাণী শোনায়—

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জান।
... ...
ম্লান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নব-যৌবন-দূত-রূপী শীত
দূর করে দিল তারে।

জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবেই নবজীবনতীর্থে উপনীত হওয়া যায়। জন্ম-মৃত্যু, জরা-যৌবন সেই অসীমেরই দুই রূপ। ফাল্গুনী নাটকের মর্মবাণী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—"জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি, তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।"[১] এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে লীলাবাদী বলা যায়। জীবন ও মৃত্যুকে তিনি সেই পরম একের লীলা বলে উপলব্ধি করেছেন। চির পুরাতনের কালিমা মৃত্যুস্নানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সৃষ্টিকর্তা বিধাতার লীলা এই জগৎ জুড়ে। নবীন আনন্দে তিনি সৃষ্টিকে নিত্যনূতন রূপদান করেছেন—

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে।

১. আত্মপরিচয়, পৃ. ৩

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধ্বংসেই পরিসমাপ্তি নয়। সৃষ্টির নবরূপ পরিগ্রহের উপায় মাত্র। ভাঙনের মধ্য দিয়েই নব সৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মৃত্যু সেই ভাঙন যজ্ঞকে পরিপূর্ণতা দান করে এবং জীবনকে অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে—

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।

শেষ পর্যায়ের মৃত্যু চিন্তার মধ্যে বার বারই মৃত্যুর সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যু যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণই আমাদের শঙ্কা, লজ্জা, দ্বিধা; কিন্তু সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমাদের আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ হয় এবং আমাদের আত্মা মুক্তির সন্ধান পায়।

তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।

—মহুয়া, 'অচেনা'

মৃত্যুর প্রতি মানবের পরাণ-বধূর নিত্য-যাত্রা। মৃত্যুর আকর্ষণে মানুষ পরিচিত জীবনকে ত্যাগ করে, আবার সেই মৃত্যুতেই নূতন ঘরের সন্ধান পায়। জীবন ও মৃত্যু যেন চেনা আশ্রয় থেকে অচেনা আশ্রয়—

কোন্ টানে জানা হতে অজানায় চলে
আধো হাসি আধো অশ্রুজলে।
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে—
অচেনার ধারে।

—মহুয়া, 'নববধূ'

বনবাণী কাব্যগ্রন্থে কবি সৃষ্টির আদিতে যে প্রাণতরঙ্গ সমগ্র চরাচর ব্যাপ্ত করেছিল, সেই প্রাণের স্পর্শ লাভ করেছেন বৃক্ষের মধ্য দিয়ে। বিশ্বপ্রাণের রহস্য-ইঙ্গিত অব্যক্ত ভাষায় বহন করছে বৃক্ষরাজি। যে বিশ্বেশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে তিনি নব নব রূপে আবির্ভূত হন। কবি ভগবানকে নটরাজ শিবের মূর্তিতে কল্পনা করেছেন। নটরাজের নৃত্যের বেগে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সর্বকলুষমুক্ত যৌবনের আবির্ভাব হয়। মৃত্যুমরুতে প্রবাহিত হয় নবজন্মের ধারা, পুরাতন বিদায় নেয়, আবির্ভাব হয় নূতনের।

জগতে ও জীবনে জড়তার পরেই যে নবজীবনের আবির্ভাব হয় একথা পাশ্চাত্ত্য কবিও বলেছেন—

If winter comes
Can spring be far behind ?

—P. B. Shelley, 'Ode to the West Wind'

নটরাজের চরণ-বিক্ষেপে পুরাতন ধ্বংস হয়ে নূতনের আবির্ভাব হয়। এই নৃত্যের দ্বারাই সৃষ্টির চিরন্তন প্রাণধারার গতি অব্যাহত থাকে। কবি নটরাজের নৃত্যের মধ্যে মুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করছেন—

নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধন গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি ;
সর্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত লয়ে।

—নটরাজ, 'উদ্বোধন'

শেষ পর্যায়ের প্রথম কাব্য পূরবী থেকেই কবির অন্তর্জীবনে মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটেছে। সত্তরোত্তীর্ণ কবির পরিশেষ কাব্যে এসে সেই ছায়া ঘনীভূত হয়েছে ; আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে কবির আত্মস্বরূপ, সৃষ্টি ও সমগ্র মানবজীবনের পরিচয় জ্ঞাপনের কাব্য এই পরিশেষ। এই কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম মূল সুর বিদায়ের সুর। কবি অনুভব করেছেন, 'আয়ুর পশ্চিম পথ শেষে, ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।' তাই জীবন-সন্ধ্যায় নিজের সঙ্গে এবং বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের পালা সাঙ্গ করে নিতে চান। এককথায় মৃত্যুর আলোকে আত্মবিশ্লেষণ পরিশেষ কাব্যের বিষয়বস্তু।

শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা মাঝে মাঝে সংশয় ও নৈরাশ্যকে ছুঁয়ে গেছে। আবার শেষ দু'বছরের কাব্যে এই নৈরাশ্যকে আরও গভীরভাবে অনুভব করা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের কোন চিন্তাই নৈরাশ্যে শেষ হয় নি। তবু মাঝে মাঝে সংশয়-কণ্টকিত জিজ্ঞাসা শেষ পর্যায়ের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।

—পরিশেষ, 'অপূর্ণ'

মৃত্যুতেই যে জীবনের সমাপ্তি এবং মৃত্যুর পর যে জীবনের কোন অর্থ থাকে না একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে চান না।

'আমি' কবিতায় কবি তাঁর অন্তরাত্মার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে আগ্রহী। জীবন-দেবতা কবিকে কাব্য রচনায়, সুখে-দুঃখে প্রেরণা দান করেছেন। কবি মনে করেছিলেন তাঁর সেই অন্তরাত্মা জীবনশেষে মরণে লয় প্রাপ্ত হবে। জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়ে মনে হচ্ছে অন্তরবাসী আত্মা দেশকাল অতিক্রম করে নিত্য-আমিতে পরিণত হয়েছে। কত যুগে যুগান্তরে কত জন্ম-মৃত্যু পার হয়ে সেই জ্যোতির্ময় 'আমি' নানা সৃষ্টিরসে মত্ত হয়েছে। তাঁকেই কবি অখণ্ড মানবাত্মারূপে উপলব্ধি করতে চান—

ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে
সর্বত্রগামীরে।

আয়ুর শেষপ্রান্তে এসে, মরণের দিগন্তের সীমায় দাঁড়িয়ে কবি জীবনের মহিমা উপলব্ধি করছেন। পৃথিবীর প্রতি পূর্ণ ভালবাসায় তাঁর জীবন ও মৃত্যু একাকার হয়ে যাবে। জগতের দুঃখ, সুখ, ব্যর্থতা সবই তাঁকে সমানভাবে বিস্মিত করেছে। জীবলোকে দুর্লভ মানবজন্মের অধিকার লাভ করে তিনি ধন্য। এই পৃথিবীর ধূলিতেই তাঁর অসীমের অনুভব হয়েছে। যুগে-যুগান্তরে যে অমৃতধারা জ্ঞানে, কর্মে ও ভাবের মধ্য দিয়ে উৎসারিত তার মধ্যেই কবি তাঁর আত্মপরিচয় লাভ করেছেন। বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে তাঁর মৃত্যু পরিপূর্ণতা পাবে। তাই যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর শেষ 'অশেষের ধনে' পূর্ণ।

কত কী গিয়েছে ঝরে জানি জানি কত স্নেহ প্রীতি
নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি।
মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
ওগো শেষ অশেষের ধনে।

—পরিশেষ, 'বর্ষশেষ'

পরিশেষ-এর কোন কোন কবিতায় কবিকে শান্ত সংযতভাবে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সাহস ও শক্তি প্রার্থনা করতে দেখা যায়। 'মুক্তি' কবিতাদ্বয়ে

কবি এই সংসারের 'প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণ-পতনপীড়া' থেকে এবং 'তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে'র বিক্ষোভ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন। শ্রাবণ-সন্ধ্যার নির্মম বর্ষণঘাতে, আত্মবিসর্জনের মধ্যে যূথী যে অনন্তের আস্বাদ পায়, কবিও অক্ষুব্ধ সাহসে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনন্ত শান্তির সন্ধান পেতে চান। জগতের 'ক্ষুব্ধ কোলাহল', 'ধূলির নিবিড় টান পদতলে' সমস্তকে অতিক্রম করে কবি জীবন-সায়াহ্নে অজানার অন্তহীন পথে যাত্রার প্রয়াসী—

সেইমতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হোক সুর,
নিয়ে যাক পথে পথে হে অলক্ষ্য, হে মহা সুদূর।

নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় পুরাতনের লয় ঘটে বার বার। ধ্বংস-স্তূপের মধ্য দিয়েই শুরু হয় নবীনের জয়যাত্রা। মৃত্যু সে তো নবজীবনের আহ্বান 'লেখা' কবিতার বক্তব্য এই রকমই—

ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।

জীবন-সন্ধ্যায় নবজীবনের 'দীপিকা' জ্বালিয়ে নব প্রত্যূষের পানে প্রাণের যাত্রা। প্রাণ-নটিনীর চিরন্তন চলা কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। বার বার জীবনে খেলাঘর বেঁধে এবং ভেঙে প্রাণ অনন্তে মেশে।—

ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান,
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণ-নটিনী।

—পরিশেষ, 'দীপিকা'

'বিস্ময়' কবিতাটিতে কবি এই ক্ষণিক মনুষ্য জন্মটিকেই অকৃত্রিম বিস্ময়ের সামগ্রী বলে উপলব্ধি করেছেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গী কিছু পরিমাণে জন্মান্তরবাদকে ছুঁয়ে গেছে। প্রাকৃতিক জগতে কত বিলুপ্তি ঘটে। কত মহাদেশ তার অস্তিত্ব হারিয়েছে, কত তারা হারিয়েছে তার আলো। মানব-জীবন ও জাতিতেও ঘটে কত রূপান্তর। এক যুগের ঐশ্বর্য অন্য যুগে ধূলিশয্যা লাভ করে। এই ধ্বংসধারার মধ্যেও মানুষ গ্রহনক্ষত্র-সমন্বিত আকাশের নীচে, সমুদ্র-বেষ্টিত এই পৃথিবীতে বার বার ফিরে আসে। জগতের

উত্থান-পতনের সাক্ষী আদি বনস্পতির নীচে মানুষ ক্ষণকালের জন্যও উপস্থিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে।

'অগ্রদূত' কবিতায় কবি মানবের অনন্ত পথযাত্রার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মানব মহাসুদূর অচেনা পথের আহ্বানে অজানার দিকে ছুটে চলে। জীবনে নানা বাধা, ভয়, সংশয় সেই অরূপের উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু মানবের যাত্রা কোন সীমা মানে না, জীবন থেকে জীবনান্তরে ছুটে চলে—

নবজীবনের সংকট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম-মাঝে পথ করি দিবে,
জীবনের ব্রত তব।

মৃত্যু জীবনকে সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা এবং অবহেলা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে এক পরম গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। 'অন্তর্হিতা' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আত্মার স্বরূপকে হৃদয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব।

'ধাবমান' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের মৃত্যুভাবনার অপূর্ব প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মানবজীবন একটা প্রবল স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। কোন জাগতিক বন্ধন সে স্বীকার করে না। এই সংসারে চলাটাই সত্য, কান্না এবং হাসির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিত্য চলা। মহাকাল সমুদ্রে যুগপৎ সৃষ্টি এবং ধ্বংসের লীলা চলে। লোভ, শোক এবং ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেই এই সৃষ্টিধারার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব হয়। এই ধাবমান স্রোতে ক্ষণিকের বুকে জ্বলে ওঠে শাশ্বতের দীপশিখা। মরণের বীণার তারে ধ্বনিত হয় জীবনের গান। এই মহান অসীমের দানকে জীবনে সাদরে গ্রহণ করে আবার বিদায়-লগ্নে যেন তাকে জয়ধ্বনি করে বিরাটের অভিমুখে বিদায় দিতে পারি। এক রূপে যে বিদায় নেয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাই নূতনরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—

বিরাটের মাঝে
এক রূপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে।

জীবন ও মৃত্যুর প্রতি কবির এই উপলব্ধি শেষ পর্যায়ের কাব্যে একেবারে আকস্মিক নয়। জীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নবসৃষ্টির কথা বলাকা, পূরবী ইত্যাদি কাব্যেও বলেছেন। এই পরিশেষ কাব্যের কবিতাগুলিতেও দেখা যায় তিনি ক্ষণিকের করপুটে অসীমের দানকে হৃদয়ভরে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যু যতই নিকটবর্তী হয়েছে, মৃত্যু সম্পর্কে মিথ্যা মোহ তাঁর দূরীভূত হয়েছে। এই চলমান ক্ষণস্থায়ী জগতের মধ্যেই তিনি বৃহৎকে উপলব্ধি করেছেন। কবি অনুভব করেছেন মানুষ অমৃতের পুত্র, তার আত্মার বিনাশ নেই এবং এই জগতের ক্ষণমুহূর্তের মধ্যেই তো নিত্যকালের ব্যঞ্জনা।

'নিরাবৃত' কবিতায় কবি সত্য ও ভুলে রচিত এই জীবনের কথা বলেছেন। অনেক সংশয়, অনেক অপূর্ণতা সত্ত্বেও এই জীবনকে তিনি ভালবেসেছেন। জগতে মানুষ সীমাবদ্ধ খণ্ডিত দৃষ্টির অধিকারী—মৃত্যুতে সে পূর্ণের পরশ পায়। কিন্তু এই ক্ষণিক সংশয়ে ভরা জীবন তো মিথ্যা নয়। অসম্পূর্ণতা, সীমাবদ্ধতাই তাকে মাধুর্যময় করে তোলে। জীবন মর্ত্যপাত্রেই অমৃত পরিবেশন করে। কিন্তু মৃত্যু জীবনকে মধুর অপূর্ণতা থেকে মুক্ত করে সত্যস্বরূপের পরিচয় দেয়।

কবি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। যতদিন মৃত্যু দূরবর্তী ছিল ততদিন কবি মৃত্যুকে নির্মম নির্দয় এবং বিনাশী রূপেই দেখেছেন, মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর চিত্ত ভয়শূন্য হয়েছে। তাই 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতায় বলেছেন—

> আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
> যাব আমি চলে।

শেষ পর্যায়ের কবিতায় আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় বসে সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কিছুই নয়, সবই ক্ষণিকের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই এই ক্ষণস্থায়ী জগৎকে আঁকড়িয়ে ধরতে গেলেই দুঃখ পেতে হয়। মৃত্যুর মহা মৌন পারে লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যু সবই এক তরঙ্গে মিশে যায়।

> ওরে তুমি, ওরে আমি,
> যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
> সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
> তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি।

কান্না আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রী-তারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহা মৌনে মিলে যায় শেষে।

—পরিশেষ, 'যাত্রী'

তাই মৃত্যুর প্রান্তে যে আত্মসমাহিত শান্তি ও প্রেম অখণ্ডভাবে বিরাজ করছে কবি তারই মাঝে অচঞ্চল স্থিতি কামনা করছেন।

'সান্ত্বনা' কবিতায় কবি বিশ্বচিত্ত-অন্তঃস্তরের সান্ত্বনার চির উৎসের সন্ধান করেছেন। নিখিল আত্মার কেন্দ্রে যে মহান শান্তি ও আরোগ্যের মহামন্ত্র নিত্যই মৃত্যুর করপুটে আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে প্রাণকে নবীন করে তুলছে; কবি সেই শান্তিকেই গ্রহণ করতে চান। আমিত্ব-বিমুগ্ধ মনের দুর্বহ ভারকে কবি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নির্মমভাবে বর্জন করতে উৎসুক। কবি তাঁর কাব্যেও এই বাণীকে বহন করতে চেয়েছেন—

আমার বাণীতে দাও সেই সুধা
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা।

কবিজীবনে মৃত্যুর আগমনবার্তা পরিশেষ কাব্য থেকেই স্পষ্টতর হয়েছে। এই কাব্যে কবির আত্মার নিত্যতা ও আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে একটি স্থির অচঞ্চল প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়।

পুনশ্চ কাব্যে বিশ্বসৃষ্টি রহস্য, মানবাত্মার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন কবিতায় মৃত্যু বা শোকের কথাও বলা হয়েছে। শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই পৃথিবীর উপর অধিকতর আবেগের সঙ্গে ন্যস্ত হয়েছে। তাই বিয়োগ-ব্যথা কবিকে অধিকতর উতলা করে তোলে। এই সময়ের কোন কোন কবিতায় দেখা যায় শোককে কবি স্বরূপেই গ্রহণ করেছেন। তাকে আদর্শায়িত করার চেষ্টা করেন নি। 'বিশ্বশোক' কবিতায় কবি সমগ্র বিশ্বে শোকের প্রাবল্য অনুভব করে ব্যক্তিগত শোককে ভুলতে চাইছেন। এখানে কবি ব্যক্তিগত শোককে নৈর্ব্যক্তিক করার প্রয়াস পেয়েছেন, কারণ তিনি জানেন যে পৃথিবীর সব মানুষের জীবনস্রোতই অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র।

মানুষের আত্মা, সে তো দেহের সীমার মধ্যে, মাটির বন্ধনে বাঁধা নয় ; প্রাণ এবং সাধনা, সে তো মৃত্যুতেই সমাপ্ত হয় না। তাই কবির প্রার্থনা—

হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়ো না তোমার সত্যের অপলাপ
তোমার সৃষ্টির অপমান।

—পুনশ্চ, 'চিররূপের বাণী'

কবির এই প্রার্থনা সফল হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন জগতে কোন কিছুরই বিনাশ নেই—

শোনা গেল আকাশ থেকে
ভয় নেই।
বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।

—পুনশ্চ, 'চিররূপের বাণী'

কবি আত্মাকে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে অনুভব করেছেন। জীবনের শেষ লগ্নে কবির উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছে দিন-রজনীর অন্তহীন অক্ষমালায় গাঁথা অপেক্ষমান অলক্ষিত ভবিষ্যৎ। এই যে অতীত-ভবিষ্যতে প্রসারিত অখণ্ড প্রাণ-প্রবাহ তার অকস্মাৎ সমাপ্তি হতে পারে না। মৃত্যুতেই যদি শেষ হত, তা হলে একদিন এই সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেত।

একি সত্য হতে পারে।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে।
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাতো না নিখিলতরণী—
মৃত্যু যদি শূন্য হত,
যদি হত মহা সমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ।

—পুনশ্চ, 'মৃত্যু'

জীবন এবং মৃত্যুকে বরবধূর রূপকল্পের মধ্য দিয়ে চিন্তা করা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় ভাবনা। জীবন ও মৃত্যু পরস্পর-বিরোধী নয়। অনন্ত লীলাময়

ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যে জীবন এবং মৃত্যুর মাধ্যমে নূতনত্বের আস্বাদন করেছেন। মৃত্যু ভয়াবহ কিছু নয়, সে আত্মার প্রণয়ী। এই ভাবধারা সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য জুড়েই রয়েছে। বহু পূর্বে লিখিত সোনার তরী কাব্যের 'প্রতীক্ষা' কবিতায় মৃত্যুকে এইভাবেই অনুভব করেছেন—

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এস বরবেশে।
আমার পরাণ বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো।

—সোনার তরী, 'প্রতীক্ষা'

চিত্রা, চৈতালি, গীতাঞ্জলি ইত্যাদির মধ্যেও সেই একই ভাবনার প্রকাশ। শেষ পর্যায়ের কাব্য বিচিত্রিতা-র মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মৃত্যুর সেই বরবধূর সম্বন্ধটি উপলব্ধি করেছেন। বরবধূর আপাত দূরত্ব যেমন তাদের মিলনের আনন্দকে নিবিড় করে, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেও ব্যবধান মৃত্যু সম্বন্ধে অধিকতর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে। জীবনের দুঃখময় ব্যবধানের মধ্যেও মৃত্যুতে সেই মিলনের সেতুটি বাঁধা আছে।

এ-পারে চলে বর, বধূ সে পরপারে
সেতুটি বাঁধা তার মাঝে।

—বিচিত্রিতা, 'বরবধূ'

আত্মা অসীম ও অনন্ত। জীবনের মধ্যে তার খণ্ড প্রকাশ দেখা গেলেও তা পরমাত্মারই অংশ। শেষ সপ্তক কাব্যে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। এই কাব্যে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর একটি ঔপনিষদিক উপলব্ধি লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যে চরম স্ফূর্তিলাভ করেছে।

যৌবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে কবি স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি লাভ করেছেন। জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি-জড়িত অনুভূতিগুলি যেন তাঁর প্রাঞ্জল শুভ্র আলোকের উপলব্ধিতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। তিনি এই নিত্য-বহমান প্রাণপ্রবাহের মধ্য দিয়েই 'কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির মহাসাগরে' প্রয়াণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

এর আলো ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু মহাসাগর সংগমে।

—শেষ সপ্তক, চার সংখ্যক কবিতা

পৃথিবীতে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের চিরন্তন লীলা। সৃষ্টিতে যা সাফল্যলাভ করে আর যা সাফল্য লাভ করে না উভয়েরই এক পরিণতি। ধ্বংস এবং সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে অবিচলিত আনন্দে বিরাজ করছেন মহাকাল। কবি ঐ আনন্দেই আশ্রয়লাভ করতে চাইছেন।

জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

—শেষ সপ্তক, সাত সংখ্যক কবিতা

এই ব্যক্তিজগৎ যা জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে মানবলোকে দেখা দিল, তার অর্থ সর্বক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় না। জীবনের ব্যর্থ ও সার্থক কামনা, প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা সমস্তই অপেক্ষা করে আছে মৃত্যুর হাতের মার্জনার। তাই এই জীবনের অর্থহীন পরিণতি কবি স্বীকার করেন না।

যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

—শেষ সপ্তক, নয় সংখ্যক কবিতা

মৃত্যুরূপ মহাকালের আর এক রূপ একুশ সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। সৌর জগতের নূতন নূতন গ্রহতারকার আবির্ভাব এবং বিলয়ের ন্যায় সভ্যতারও উত্থান-পতন হচ্ছে। অনন্তকাল পরিধির মধ্যে এদের আয়ু একান্তই ক্ষণকালের। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের পশ্চাতে মহাকাল অখণ্ড শান্তিতে অবস্থান করছেন। কবি সেই মহাকালকে প্রণতি জানাচ্ছেন। মানবজীবনের অমৃতভরা ক্ষণ-মুহূর্তগুলি কবির কাছে পরম মূল্যবান, কারণ এই ক্ষণিকের

মধ্যেই নিহিত আছে অপরিমেয় সত্য এবং আনন্দ। তাই যুগের জয়স্তম্ভ ভেঙে পড়লেও এই অমৃতময় মুহূর্তগুলির বিনাশ নেই—

কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

বাইশ সংখ্যক কবিতায় কবি দেহ ও আত্মার বিভেদের কথা বলেছেন। জন্মের প্রথম থেকেই জরা, মৃত্যু, কামনা-বাসনাধীন দেহই আত্মার আবাসস্থল। কবি জীবন-পরিক্রমার শেষে দেহ ও আত্মাকে পৃথকভাবে উপলব্ধি করেছেন। দেহ জন্ম-মরণের সীমানায় বদ্ধ, কিন্তু আত্মার কোন বন্ধন নেই—

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোন কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

মৃত্যু কবির একান্ত অন্তরঙ্গ। সমগ্র জীবন ধরেই মৃত্যুচিন্তা কবিকে চঞ্চল করেছে। মৃত্যু ক্রমাগতই চলার আহ্বান জানাচ্ছে পুরোনোকে, জীর্ণকে, ক্লান্তকে, অচলকে। বন্ধন-মুক্তির মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতের সৃষ্টিধারাকে অক্ষুণ্ন রাখে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই অমৃতলোকের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পুরোনো জীর্ণ জীবন আবার নবরূপ পরিগ্রহ করে। এই ধারণারই স্বীকৃতি—

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে।

—শেষ সপ্তক, উনচল্লিশ সংখ্যক কবিতা

মানবের চিরন্তন সত্তা অমৃতের অংশস্বরূপ। এই সত্তাকেই তিনি 'প্রথম জাত অমৃত' আখ্যা দিয়েছেন। জরা-মৃত্যুর বন্ধন বার বার এই সত্তাকে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু সে মেঘমুক্ত সূর্যের মতই উজ্জ্বল ও বন্ধনমুক্ত। কবি

বিগত জীবনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করছেন তিনি বালককালে প্রকৃতির অনেক কাছে ছিলেন। জীবন যত অগ্রসর হয়েছে ততই তিনি সেই স্নেহ-স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জীবনের অন্তিম লগ্নে তিনি সেই স্পর্শ পুনরায় অনুভব করার জন্য ব্যাকুল—

এ জন্মের ভ্রমণ হলো সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

—শেষ সপ্তক, চল্লিশ সংখ্যক কবিতা

বীথিকা কাব্য গ্রন্থটি বলাকা-মহুয়া-পরিশেষ কাব্যেরই অনুরূপ ভাবধারা সম্বলিত। জন্ম ও মৃত্যুর চিরন্তন রহস্য, মানবের অন্তরতম সত্তার নিগূঢ় পরিচয় প্রভৃতি পূর্ববর্তী কাব্যগুলির মত এই কাব্যেরও অন্যতম উপজীব্য। আসন্ন মৃত্যুর আলোকে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি কবিতাগুলিতে। জীবনের অবসানে কোন দুঃখ-বেদনা তাঁর নেই, বরং একটা গভীর প্রশান্তি এবং বৈরাগ্যের অধিকারী হয়েছেন কবি।

'রাত্রিরূপিণী' কবিতায় কবি জীবন-গোধূলিতে মৃত্যুর আগমন উপলব্ধি করছেন। জীবনের দ্বন্দ্ব-কোলাহল মৃত্যুতে শান্তিলাভ করুক। অন্তহীন প্রয়াস, লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্য, দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ মৃত্যু রজনীর তিমির মন্দিরে শান্ত হোক। কবি মৃত্যুর মধ্যে সেই অখণ্ড শান্তিই কামনা করছেন—

তুমি এসো অচঞ্চল,
এসো স্নিগ্ধ-আবির্ভাব,
তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।
... ...
সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।

কবি জীবনকে আদি শাশ্বত প্রাণ-প্রবাহের একটি খণ্ডাংশরূপে উপলব্ধি করেছেন। নিজ প্রাণে আদি সত্তার সুর শুনতে পাচ্ছেন। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বাজছে সেই আদি 'ওংকার ধ্বনি'। কবি-চেতনায়ও সেই ধ্বনি তরঙ্গ তুলেছে।

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথা হারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান
চেয়ে থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

—বীথিকা. 'আদিতম'

'নাট্যশেষ' কবিতায় কবি জীবনকে একটি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করেছেন, মানুষ নেপথ্য-লোক থেকে দেহ-ছদ্ম-সাজে নটরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। সংসারের অন্তহীন নাট্যলীলায় অভিনয় সাঙ্গ করে আবার অদৃশ্য নেপথ্যে প্রয়াণ করে। সংসার রঙ্গমঞ্চে এই সুখ-দুঃখের অভিনয়ের কোন নাট্যগত অর্থ হয়ত বিশ্ব মহাকবির কাছে আছে। মানুষ জীবনে এই হাসিকান্নাকে সত্য বলে জেনেছিল, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুলগ্নে জাগতিক ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা, লজ্জা-ভয় সমস্তই অর্থহীন। বিশ্ব-বিধাতার কাব্য-কলায় এই অর্থহীন সুখ-দুঃখই আনন্দের দানরূপে প্রতিভাত হয়েছে। গোধূলির শেষ আলোর তির্যক রশ্মি যখন কবির জীবনের উপর এসে পড়েছে, সেই সময় কবি জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কের দৃশ্যগুলির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। সেদিনের আনন্দ-বেদনাময় মুহূর্তগুলি আজ ছায়াসম। তারা যেন বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে ঐক্য রেখে কবি-হৃদয়ের ভিত্তিপটে অজন্তা চিত্রের ন্যায় বিরাজমান—

সেই যুগ হল গত
চৈত্র শেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে।
... .
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তা গুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে ; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে।

'আসন্ন রাত্রি' কবিতাটি স্মৃতি-বেদনায় ভারাক্রান্ত। ঘনায়মান শীত-সন্ধ্যার শীতল স্পর্শের ন্যায় কবি জীবনে মৃত্যু-রাত্রির স্পর্শ অনুভব করেছেন। অতীতের সুখ-দুঃখকে আজ স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছে। এই কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ জীবন এবং মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি 'বর' এবং 'বধূ'র সম্পর্কের রূপকে স্থাপন করেছেন—

এল সে তোমারে চেয়ে
অবগুণ্ঠিত নিরলংকার
তাহার মূর্তিখানি
হৃদয়ে ছোঁয়াল শেষ পরশের
তুষার শীতল পাণি।

'প্রণতি' কবিতায় কবি 'অস্ত মহাসাগর তট' থেকে জীবনের উদয়-দিগন্তের প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করছেন। আবির্ভাব-লগ্নেই তিনি পৃথিবীর সঙ্গে চির-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই পৃথিবীকে তিনি ভালবেসে মুগ্ধ হয়েছেন; নিবেদন করেছেন তাঁর গানের ডালি। জগতের অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধার মধ্যেও তিনি সুধার সন্ধান পেয়েছেন। মমতাহীন সৃষ্টি-লীলা-খেলায় তাঁকে এই জীবন পরিত্যাগ করে যেতে হবে। তবুও তিনি জীবনের প্রথম উদয়-স্থান সেই উদয়গিরিকে প্রণতি জানাচ্ছেন—

এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি কানায় কানা
রঙিন রসধারায় অনুপম।
একটুকুও দয়া না মানি
ফেলায়ে দেবে, জানি তা জানি,—
উদয় গিরি তবুও নমোনম।

এই সংসারে অনেক অপূর্ণতা আছে। মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব চিরকালই এই সৃষ্টির মর্মের কাছে বিরাজ করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই দয়াহীন শ্রেয়কে লাভ করা সম্ভব হয়।

মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত্য যা, যা-কিছু অক্ষয়।

—বীথিকা, 'বিরোধ'

'রাতের দান' কবিতায় কবি অনুভব করেছেন জীবনের আলো নিবে যাবার পর মৃত্যুর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে। কিন্তু সেই মৃত্যুর অন্ধকার রাত্রি বন্ধ্যা নয়, জীবনে যে সম্ভাবনা অপূর্ণ রয়ে গেছে, মৃত্যুতে তারই পরিপূর্ণতা। রাত্রির এই দানকে সুদূর স্বপ্নের মত অনুভব করা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিদায়বেলায় কবি-প্রাণকে এই না-জানা, না-ছোঁওয়া পথের শেষ দান-দাক্ষিণ্যে ভরিয়ে দিয়েছে।

অনন্ত হোমানল-শিখার অংশ এই জীবন। তাই অতীত ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করে যে অপার মহিমা সংসারের সীমা অতিক্রম করে আছে এবং মরণকে হেলা করে যে মহাজীবন অনন্তকাল পথ-পরিক্রমা করছে, কবি সেই চিরন্তন সত্তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করছেন। মানবজীবন সংসার-সমুদ্রে ভাসমান এবং হংসের মতই অনাসক্ত মুক্ত এবং স্বাধীন। তাই মৃত্যুর আগমন-প্রতীক্ষায় কবি বলেছেন—

বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ, সব ক্ষতি,
তুচ্ছ আজি হল অতি
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

—বীথিকা, 'নবপরিচয়'

'মরণমাতা' কবিতায় কবি এই জীবনকে মরণের দান বলে স্বীকার করেছেন। জীবনের জড়তার অবসান হয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আবির্ভূত হয় নবীন প্রাণ, জাগে নূতন আশা, নূতন ভাষা এবং নূতন আয়োজন। কবি নিখিল জীবনস্রোতে অচল বাধাস্বরূপ হয়ে থাকতে চান না। তিনিও জীবনের সীমা ভেঙে অনন্তের পথে চলতে চান—

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে-ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

কবি কোন কোন সময় মানবজীবনকে চিরযাত্রীরূপে অনুভব করেছেন। 'পথিক' কবিতায় কবি বলেছেন অজানা পথের আহ্বানের মতই মৃত্যু জীবনকে আকর্ষণ করে। জীবন সীমাবদ্ধ—মৃত্যু অসীম। এই অসীমের উদ্দেশেই মানবের চিরযাত্রা—

আমি-যে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে
দূরের আকাশে চেয়ে;
... ...
শূন্যতা ছাড়ি সুন্দরে তব আমার মুক্তি চাই।

'জয়ী' কবিতায় কবি মৃত্যুর ঊর্ধ্বে জীবনকে স্থাপন করতে চেয়েছেন। মৃত্যু এবং ধ্বংসের মধ্যেও মানবের চিরন্তন বাণী জয়ী হয়—

আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা,—
তরঙ্গতাণ্ডবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা ;
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

'শেষ' কবিতায় আসন্ন মৃত্যুর স্পর্শ কবি অনুভব করছেন। সংসারের আকর্ষণ তাঁর ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে, অনাসক্ত আনন্দের নির্মল পরশ পাচ্ছেন। সম্মুখে তাঁর নবজীবনের আভাস। সৃষ্টির চিরন্তন প্রবাহে তাঁর প্রাণচৈতন্য ভাসমান—

পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে ; সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক্।
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর নিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে-মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র—'আমি'।

'জাগরণ' কবিতাও কবির মৃত্যু-জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর বহন করছে। মৃত্যুর আঘাতে আমাদের সুপ্ত চৈতন্য যখন জেগে ওঠে এবং যখন চৈতন্যলোকে আসে কল্পান্তর তখন কবির জিজ্ঞাসা, এই জগতের রূপ কিভাবে তাঁর কাছে প্রতিভাত হবে। জীবনের এই রূপ মৃত্যু-পরবর্তী নূতন জীবনে সত্য বলে মনে হবে, না স্বপ্ন বলে মনে হবে ?—

সবকিছু অন্য এক অর্থে দেখি,—
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি।
সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্য কালে ছিল তার মনে।

অসীমের পটভূমিকায় বিশ্বের স্বরূপ, মানবসত্তার চিরন্তন অপরিমেয় রহস্য ধরা পড়েছে পত্রপুট-এর কবিতাগুলিতে। এরই সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলেছে কবির আত্মস্বরূপের উদ্‌ঘাটন। মৃত্যু কবির কাছে এক অভিনব রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উপকরণের দুর্গে মানবের সত্যস্বরূপ ঢাকা পড়ে। বিশ্বের পান্থশালায় জীবনের হাসি-কান্নাকেই সে একান্ত সত্য বলে মনে করে।

কবি অতিথিবৎসল ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তিনি যেন কবির মধ্যকার সমস্ত জীর্ণতা, গ্লানি দূর করে চিরন্তন আত্মাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ছয় সংখ্যক কবিতায় কবি মানবকে পথিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন মানব আলো ও আনন্দ-স্বরূপ ভগবানেরই অংশ—

পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারই সঙ্গে তার রূপের মিল।
... ...
হে অতিথি বৎসল,
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে
আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
সে পাক্ আপনাকে।

এই কাব্যের কবিতাগুলিতে বিশেষ করে দশ, বারো, তের, পনের সংখ্যক কবিতায় কবি মানবাত্মার নিত্যতা উপলব্ধি করেছেন। সর্বত্রই তিনি দেহের আবিল আবরণের অন্তরালে চিরন্তন অমৃতময় মানবসত্তাকে আহ্বান করেছেন। যেখানে আত্মা সম্বন্ধে কবির এই অখণ্ড প্রত্যয়, সেখানে মৃত্যু কোন খণ্ডিত ধারণা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে না।

শ্যামলী-তে রবীন্দ্রনাথ এক শাশ্বত সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন। জীবনের লীলাক্ষেত্র চিরহরিৎ প্রকৃতিই কবির সেই সান্ত্বনাস্থল। ক্ষণভঙ্গুর মাটির বাসাই এই ক্ষণিক জীবনের যোগ্য উপমান। মাটির বাসা পাকা ভিতের বন্ধন থেকে মুক্ত। তাই জীবনের আসা ও যাওয়ার মিলনের সুর এই উদাসীন মাটির বুকেই অধিক অনুভূত হয়। এখানে কবির দৃষ্টি মোহমুক্ত।

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে
এক শাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী
যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।

—শ্যামলী, 'শ্যামলী'

উপনিষদের সর্বব্রহ্মবাদ-এর অনুরূপ চিন্তাধারা দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্যে 'বিশ্ব-আমি'র কল্পনার মধ্যে। রসাস্বাদনের জন্য অসীম মানুষের সীমানায় সাধনা করে শ্বেত রূপ ধারণ করলেন। তিনি বহু হওয়ার এবং জন্মগ্রহণ করবার

আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন—"সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"। অসীমের এই দ্বৈতসত্তার মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয় সৃষ্টির রূপ রস এবং মাধুর্য। 'আমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'আমি', এই 'আমি'র সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমানুভূতির ভিতর দিয়েই বিধাতা তাঁর সৃষ্টির মাধুর্য উপভোগ করেন। এই 'আমি' না থাকলে কবিত্বশূন্য বিধাতা থাকতেন 'নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে'। মানুষ না থাকলে বিশ্বসৃষ্টির কোন অর্থই থাকত না। এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের নানা গানে ও গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি যুগের নানা কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে—

'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হোতো যে মিছে'।

'অকাল ঘুম' কবিতায় কবি নারীসত্তার এক আশ্চর্য রহস্য উন্মোচন করেছেন। অসমাপ্ত ঘরকন্নার অবকাশে নিদ্রিতা নারীর রূপ তাঁর মনে এক অজ্ঞাত রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রতিদিনের পরিচিত নারীর রূপ কোন একটি অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে কবির চোখে অতলস্পর্শ রহস্য ও অমরত্বে মণ্ডিত হয়ে ধরা পড়ে। তখনই তিনি মানবের নিত্যসত্তা ও মুক্ত স্বরূপের পরিচয় পান—

ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্বাক্ রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি,
"কে তুমি ?
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে"।

'চিরযাত্রী' কবিতায় কবি মানবসত্তার পথিক-রূপের কথা বলেছেন। মানুষের মধ্যে যারা সন্ধানী ও সাধক, তারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয় অনাগতের দিকে। যারা বস্তুকে চিরস্থায়ী মনে করে আঁকড়ে থাকে তারা বেঁচে থেকেও মৃতের তুল্য। মানুষ যখনই কোন এক স্থানে স্থায়ী হতে চেয়েছে তখনই ঘটেছে সর্বনাশ। মানুষ তার অন্তরের তাগিদেই যাত্রা করেছে 'পথ-না-চেনা দিক্ সীমানার অলক্ষ্যে'। বার বার জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানুষ এগিয়ে চলে সীমাহীন, বাঁধনহারা অসীমের দিকে—

ওরে চির পথিক,
করিস নে নামের মায়া,
রাখিস নে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।

...   .

আকাশে বেজে উঠেছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
"পেরিয়ে চলো
পেরিয়ে চলো"।

রবীন্দ্রকাব্য-ইতিহাসে প্রান্তিক একটি স্বতন্ত্র মূল্যের অধিকারী। ১৩৩৭ সালের নিদারুণ ব্যাধি কবিকে মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত হয়েছে প্রান্তিক-এর প্রতিটি ছত্রে। মৃত্যুর আলোকে কবি জীবনকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। সে দৃষ্টি স্বচ্ছ, প্রশান্ত। শেষ-দুটি কবিতা ব্যতীত প্রান্তিকের অন্যান্য সব কবিতাই মৃত্যু এবং মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবনকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ আত্মা এবং মানবসত্তার অবিনশ্বরত্বে আজীবন বিশ্বাসী। প্রান্তিক-এ সেই বিশ্বাস আরও সংশয়লেশহীন এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন।

প্রান্তিক-এর প্রথম করিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মৃত্যু সম্বন্ধে উপলব্ধির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাধির যন্ত্রণা এবং জীবনাবসানের ইঙ্গিত কবির চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু তাঁর মানসিক শক্তিকে পরাভূত করতে পারে নি। তিনি অনুভব করেছেন মৃত্যু-দূতের গোপন পদসঞ্চার। ক্ষণিকের জন্য তাঁর চৈতন্যে নেমেছে আচ্ছন্নতা, কিন্তু শেষপর্যন্ত মৃত্যু-অন্ধকারকে অতিক্রম করল আলোকের খরপ্রবাহ, শুভ্র চৈতন্যময় জ্যোতি—

নূতন প্রাণের সৃষ্টি হ'লো অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।

কবি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনের পরম চরিতার্থতার ইঙ্গিত দিয়েছেন দুই সংখ্যক কবিতায়—মরণের প্রসাদবহ্নিতে কামনার যত আবর্জনা দগ্ধ হয়ে যাক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা, আলোকের দানে ধন্য হোক মর্ত্যের প্রান্ত পথ দীপ্ত হয়ে উঠুক।

কবি তিন সংখ্যক কবিতায় কামনা করছেন পুরাতন জীর্ণ জীবন পরিত্যাগ করে শূন্য দিগন্তের পটভূমিকায় নূতন জীবন রচনা করবেন। মৃত্যুর অদৃশ্য আঘাতে যখন জীবনের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়ে গেল—সম্মুখে নিরাসক্ত নির্মম অসীমের তিনি সাক্ষাৎ পেলেন। 'অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে' কবি নয়ন মেললেন। বিশ্বকর্তা নেপথ্য লোকে কবিকে তাঁর সৃষ্টির কাজে আহ্বান জানিয়েছেন। কবিকে বিগত জীবনের সমস্ত জীর্ণ

সঞ্চয় পশ্চাতে ফেলে মহাশূন্যের পটভূমিকায় আবার নবীন জীবনের সূচনা করতে হবে।

কবি চার সংখ্যক কবিতায় বলেছেন, মানুষ অসীমের অংশ। দেবতার আপন স্বাক্ষর নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। 'সংসারের বিচিত্র প্রলেপে', 'বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে' তাঁর জীবনের সত্য লুপ্তপ্রায়। পৃথিবীর পণ্যের হাটে তিনি আপনাকে মেলে দিয়েছেন। কিন্তু একটি পরম লগ্নে পরপার থেকে ধ্বনিত হল মৃত্যুর আরতির শঙ্খধ্বনি, থেমে গেল জীবনের আশা-প্রত্যাশার দ্বন্দ্ব। তিনি অনুভব করলেন সমস্ত পরিত্যাগ করে, 'বুভুক্ষার দীপধূমে কলঙ্কিত' জীবনকে নিয়ে 'নীরবের ভাষাহীন সংগীত-মন্দিরে' প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাই তিনি মহাযাত্রায় চলেছেন 'মৃত্যু স্নানতীর্থ তটে সেই আদি নির্ঝরতলায়'। এই শেষ যাত্রা তাঁর 'অকলঙ্ক প্রথমে'র দিকে, যিনি নানারূপে বারবার পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসেন।

এই আদি প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে রবীন্দ্রনাথ অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইছেন পাঁচ সংখ্যক কবিতায়। এখানে তাঁর দৃষ্টি যুগপৎ অতীত এবং বর্তমানে আবদ্ধ। অতৃপ্ত তৃষ্ণা যা সমগ্র জীবনব্যাপী নিরন্তর তাঁকে পীড়িত করেছে, যা কিছু বেদনার ধন, কামনার ব্যর্থতা সমস্তই মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে ভারমুক্ত শরৎ-আকাশের ন্যায় চিরপথিকের আহ্বানে সাড়া দিতে চাইছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কবি যেন সহজভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে চাইছেন। জীবনের প্রতি তিনি পরিপূর্ণভাবেই মোহমুক্ত। কিন্তু বিদগ্ধ সমালোচক এখানে রবীন্দ্রনাথের দূর-প্রয়াণের ইচ্ছাকে পৃথিবীকে বর্জনের ইচ্ছার সঙ্গে এক করতে পারেন নি। এ যেন রবীন্দ্রনাথ নূতনভাবে পৃথিবীকে গ্রহণ করেছেন—"মৃত্যুকে প্রকৃতই ফিরিয়ে দেবার বিষয়ে কবি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন নি, প্রাণরসের রসিক রবীন্দ্রনাথ, দূরে চাওয়া আকাশে বাঁশির ধ্বনির অনুগামী হতে চাইলেও সেই দূরে চাওয়া আর মৃত্যু-বন্দনা এক বস্তু নয়। বরং মেঘমুক্ত শরতের অনুগমনই তাঁকে জীবনের সঙ্গে নব যোগ-সূত্রে বেঁধেছে, দূরকে নিকট করেছে। পৃথিবীকে অনাদরে বর্জনে নয়, বরং বিশ্বকে সাগ্রহে গ্রহণের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব সুরের পুনরাবিষ্কার করেছেন।"[১]

১. ড. শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্য (১৩৬৮), পৃ. ৮৯

কবি ছয় সংখ্যক কবিতায় অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিষ্ট-বঞ্চিত প্রাণের আত্ম-অস্বীকারকে ধিক্কার দিচ্ছেন। রিক্ততা, নিঃস্বতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতার প্রেত-ছবি কল্পনা করতে কবি চাইছেন না। তাঁর মুক্তির পথ হল—

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে, রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।
আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতি মাঝে, ঊর্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
শরৎ-প্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা-অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে ;

কবি সম্মুখে পূর্ণতার রূপ উপলব্ধি করছেন। কিন্তু এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বন্ধন ছিন্ন করতে তিনি আগ্রহী নন—

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।

মৃত্যুদূতের স্পর্শে কবি নূতন জীবনে প্রবেশ করলেন। পুরাতনকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই পৃথিবী ও জীবনের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। কল্পনায়-বাস্তবে, সত্যে-ছলনায়, জয়-পরাজয়ে বিচিত্র জীবন তাঁকে অপরূপ অনির্বচনীয়ের স্পর্শ দিয়েছে—

আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়।

—প্রান্তিক, ৭ সংখ্যক কবিতা

পরবর্তী কবিতা থেকেই কবির চিন্তাধারা একটু স্বতন্ত্র পথে চলেছে। আট সংখ্যক কবিতায়ও তিনি রঙ্গমঞ্চের উপমাটি গ্রহণ করেছেন। এই জীবনে যে সাজে তিনি তাঁর পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন আজ মৃত্যুর স্পর্শে তা

নিরর্থক মনে হচ্ছে। এখন বাইরের বর্ণপ্রসাধন দূর হয়ে গেল, কবি নিগূঢ় পূর্ণতার আস্বাদ পেলেন।

নয় সংখ্যক কবিতায় অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায় কবি অনুভব করেছেন বিশ্ববৈচিত্র্যের উপর এক কৃষ্ণ অপরূপতা নেমে এসেছে। দেহ ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে, অন্তহীন তমিস্রায় মিলে যাচ্ছে। সেই তমসার পরপারে মহান পুরুষকে দেখার আকাঙ্ক্ষা কবির মনে প্রবল হয়ে উঠেছে—

দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি

এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

দশ সংখ্যক কবিতায়ও কবি জীবনে মৃত্যুদূতের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে নিখিল জ্যোতির জ্যোতি উপলব্ধি করতে চাইছেন। এই চরমের কবিত্ব মর্যাদা লাভের জন্যই জীবনের রঙ্গভূমে তান সেধেছেন। কবি কামনা করেছেন—

আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্য ডালি-'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।

এই সময় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি ঔপনিষদিক জ্যোতির ধ্যানে নিমগ্ন। তিনি আত্মার পরিণাম সম্বন্ধে মোহমুক্ত। অনন্তেই আত্মার আশ্রয় এটা কবির স্থির বিশ্বাস। এগার সংখ্যক কবিতায় পৃথিবীর কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে চাটুলব্ধ জনতা দেবীর পূজা সাঙ্গ করে অনন্তের শান্ত আঙিনায় দূরে সরে যেতে চাইছেন। সেখানে অসীমের মধ্যে ব্যক্তিপরিচয় বিলীন হয়ে যায়।

কবি মৃত্যুতে অবগাহন করে সংসারের অতুল দানকে পশ্চাতে ফেলে সম্মুখে নবজীবনের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে চাইছেন। নব বসন্তে শুষ্কপত্র মোচনের ন্যায় তিনি কামনা করেছেন তাঁর জাগতিক আসক্তি ছিন্ন হয়ে যাক। তের সংখ্যক কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন যে দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করেছেন এবং এই পৃথিবী ও জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। তবু তিনি চিরযাত্রী। অনন্তকাল ধরে মানবাত্মা অসীমের অভিসারী—

তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

আসন্ন জীবন-সন্ধ্যায় কুলায় রিক্ত করে অন্তসিন্ধু-পরপারে পদচিহ্নহীন শূন্যে ভ্রষ্ট-নীড় পাখীর মত উড়ে যাবার পূর্বে কবি এই পৃথিবী ও জীবনের আতিথ্য ও দাক্ষিণ্যের জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন ১৪ সংখ্যক কবিতায়—

এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

১৫ সংখ্যক কবিতায় কবির উপলব্ধির এক আশ্চর্য রূপ দেখতে পাই। মৃত্যুতে কবি জীবনের দীর্ঘকালের নিয়মের প্রহরীব্যূহ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন, তরুণ আলোকে অনুভব করছেন তিনি যেন একজন তীর্থযাত্রী—অতিদূর ভাবীকাল থেকে মন্ত্রবলে যেন বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে উপনীত হয়েছেন। মৃত্যু যেন ব্যক্তিসত্তাকে প্রত্যহের আচ্ছাদন এবং অভ্যাসের জাল থেকে মুক্তি দিয়ে, পুরাতনের দুর্গদ্বারে চাবি খুলে নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। নগ্ন চিত্ত আজ নিরাসক্ত ছুটির আনন্দে পরিপূর্ণ—

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসার-যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থে কবি সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে বিগত স্মৃতির রোমন্থন এবং আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। এই মৃত্যুচিন্তাকে তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন ; কিন্তু প্রতিটি প্রকাশই নূতন। এই কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবি বলেছেন, আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকারগুহা থেকে ফিরে এসে নিজেকে নূতনভাবে আবিষ্কার করেছেন। যে প্রাণ এতদিন সংসারের সুখ-দুঃখে আবদ্ধ ছিল, সেই প্রাণই কবিকে 'অচিহ্নিতের পারে, নব প্রভাতের উদয়-সীমায় অরূপ লোকের দ্বারে' নিয়ে যেতে চাইছে—

আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।

সে ভাষার চরম অর্থ কবির কাছে স্পষ্ট হয় নি। সেই অর্থ উপলব্ধির জন্য তিনি আগ্রহী। এই অজানা তীরের বাসার আহ্বান কবির কাছে দুর্গম হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই চির চেনা পৃথিবীর মূল্যও কবির কাছে কমে নি।

প্রথম কবিতা 'জন্মদিন'-এ তিনি অনুভব করেছেন মরণের ছাড়পত্র পৌঁছে গেছে তাঁর সদ্য রোগমুক্ত চৈতন্যের কাছে। মৃত্যুই তাঁকে নবযাত্রার ইঙ্গিত দেবে। আজ জীবন সায়াহ্নে জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন যেন একাসনে আসীন। কবির অন্তরতম সত্তা আদি-জ্যোতিতে মিলিত হবে; তাই কবিকে তাঁর জাগতিক আসক্তির ডালি এবং জীবনের সঞ্চয়কে পশ্চাতে ফেলে যেতে হবে। কবি যে অন্তহীন প্রাণপ্রবাহকে বহন করে চলেছেন তা এই পৃথিবীর জরা-মরণশীল দেহে আবদ্ধ হতে পারে না—

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য, অরূপ প্রাণের জন্মভূমি,
উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি, করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা।···
··· ··· ···
যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

তবু কবি এই পৃথিবীর ঋণ অস্বীকার করেন না। তিনি এই মাটির মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন—

আমি সে মাটির কাছে ঋণী
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান।

'পত্রোত্তর'-এ 'চিরপ্রশ্নের বেদী-সম্মুখে' কবির দৃঢ় প্রত্যয় মর্ত্যের অমৃত পাত্রেই ঢাকা আছে আলোকধামের আভাস। সেই আভাসের আহ্বানে কবিপ্রাণের বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কাব্যকলায়। সংসারের দুঃখ-দৈন্য তাঁকে আচ্ছন্ন করলেও, পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় তিনি শান্ত শিবের বাণী শুনেছেন। বিশ্বনৃত্যলীলার ছন্দে মেতে তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবেন—

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন-ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা ;
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে ;
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্যতারার সাথি।

সেঁজুতি কাব্যটির অধিকাংশ কবিতাই মৃত্যু-কেন্দ্রিক। কবিতাগুলির সর্বত্রই আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আসন্ন ক্ষণে কবির পৃথিবীর প্রতি ঔদাসীন্যময় আসক্তি দেখতে পাই। জীবন ও জগৎ যে ক্ষণজীবী তা কবি স্বীকার করেন ; কিন্তু এই ক্ষণিকের মধ্যেই চিরন্তনের বাস। 'যাবার মুখে', 'অমর্ত', 'পলায়নী' কবিতার মধ্য দিয়ে কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন। এই কবিতাগুলির মূলে যদিও মৃত্যু ও বিচ্ছেদ-ভাবনা, তথাপি ধরণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই প্রতিটি ছত্রে ব্যক্ত। 'স্মরণ' কবিতাটিরও কেন্দ্রে আছে মৃত্যু ও বিচ্ছেদ-ভাবনা ; কিন্তু এ দুঃখ ব্যক্তিগত শোক দুঃখের উর্ধ্বে। বিদায়কে তিনি অতি সহজ নির্মোহ ও নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করেছেন—

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।
... ...
যে-আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার—
সে-আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায় ?
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না, ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন॥

'সন্ধ্যা' কবিতায় কবি মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে জীবনের নূতন পরিচয় পেলেন। জীবনস্রোতে ভাসতে ভাসতে গোধূলিবেলায় কবি শেষ প্রহরের

নেমে সন্ধ্যার সাক্ষাৎ পেলেন। এই সন্ধ্যার মাধ্যমেই কবি জীবনে সেই পরম প্রার্থিত অচেনার পরিচয় পেতে চান—

সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি,
ঘনিয়ে এসো প্রাণে,
আমার মধ্যে তারে জাগাও
কেউ যারে না জানে।

'ভাগীরথী' কবিতায় কবি ভাগীরথীকে মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে প্রতিক্ষণে ধরায় প্রবাহিত অক্ষয় অমৃত-স্রোত রূপে অনুভব করছেন। তাই কবির প্রার্থনা—

এ জন্মের শেষ ঘাটে;
নিরুদ্দেশ যাত্রীর ললাটে
স্পর্শ দিক আশীর্বাদ তব,
নিক সে নূতন পথে যাত্রার পাথেয় অভিনব;

নবজাতক-এ রবীন্দ্রকাব্য-চেতনা ভিন্ন পথে চলেছে। তবুও তিনি যে মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত এবং সেই মৃত্যুর মধ্যেও যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, একথা অনুভব করেছেন।

জানি না, বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না, এ আজিকার মুছে ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি।

—নবজাতক, 'শেষকথা'

শেষ পর্বের মৃত্যু চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল মৃত্যুর একান্ত সান্নিধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা মৃত্যুকে অনুভব। কবি একবার মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে প্রান্তিক-এর কবিতাগুলিতে অপূর্ব দার্ঢ্য ও সংহতিমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছিলেন। সেই মৃত্যুস্নান কবিকে এক নূতন শুভ্র স্বচ্ছ চৈতন্যের অধিকারী করল। এই ভাববৃত্তের মধ্যে কিছুকাল অবস্থান করার পর কবি পুনরায় তাঁর চিত্তের সহজ মাধুর্যকে ফিরে পেয়েছিলেন, যার ফলে আমরা পেলাম সানাই কাব্য। এই কাব্যে 'পুরবী'-পর্বে

সেই সুকোমল প্রেম ও স্মৃতির অনুবর্তন। সানাই কাব্যেই শেষবারের মত রবীন্দ্রনাথের সহজ সরল মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় তিনি অকস্মাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবন-মরণের সীমানায় আবার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। এর ফলেই কবির অন্তরে আবির্ভূত হল এক নবচৈতন্য। এই সময় রোগক্লিষ্ট দুর্বল দেহ ও মন নিয়ে যে কবিতাগুলি রচনা করলেন, সেগুলি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। এই কবিতাগুলিই রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা কাব্যগ্রন্থ চারখানিতে ধৃত হয়েছে। মৃত্যুদূতের পদধ্বনি যত নিকটে অনুভব করছেন কবি ততই দেহ দুঃখ-হোমানলে পুড়ে খাঁটি হচ্ছেন। তিনি দেহ দুঃখ-তপস্যাকে অতিক্রম করে জ্যোতিষ্মান অপরাজেয় মানবাত্মার শক্তি ও মহিমার জয়গান করেছেন। এখানে তাঁর অন্তরাত্মার অপরিসীম বীর্যের পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে কাব্যগুলি সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন—"এ তো কাব্যের ভাববিলাস নয়। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া এ যে অকৃত্রিম, গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি।"[১]

কবিতাগুলির মন্ত্রবৎ দৃঢ় সংহতি, স্বল্প অথচ তীব্র সংবেদনশীল ভাষা, উদাসীন গাম্ভীর্য এক নূতন অনুভূতি নিয়ে আসে। ব্যাধির যন্ত্রণা এবং মৃত্যুদূতের আনাগোনা কাব্যগুলিতে লক্ষ্য করা গেলেও তজ্জনিত ক্লান্তি বা নৈরাশ্যের ছাপ নেই। শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব-এর মতে—"রোগশয্যায়, আরোগ্য, শেষলেখা-র লেখনী ক্লান্ত নয় মোটেই; এ কাব্যগুলির অক্ষরে অক্ষরে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা আছে, জরা নেই। মানসিক জরা একেবারে অনুপস্থিত।"[২] এই ভাবপরিমণ্ডলের কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে দার্শনিক।

রোগশয্যায় কাব্যগ্রন্থে অতি গভীর গম্ভীর সুরে জীবন-মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংসের ধারণাটি একটি দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবু ব্যক্তিগত জীবনের রোগ ও আরোগ্য নিয়েই কবিতাগুলি আবর্তিত হয়েছে। ব্যাধি-যন্ত্রণায় মানুষ অনেক সময় তার মৌল বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন এই সময় সমস্ত দুঃখের ঊর্ধ্বে আত্মিক অমিত বীর্যের অধিকারী হয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন জীবন ও মরণ উভয়ের লীলাই অনন্ত। নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশ্যে জীবনের চিরকালীন যাত্রা—

---

১. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ. ৬৫৫

২. শ্রী আবু সয়ীদ আইয়ুব, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৭১), পৃ. ১১৮

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,
... ...
নাহি তার শেষ।

—রোগশয্যায়, ১ সংখ্যক কবিতা

৫ সংখ্যক কবিতায় কবি স্বীয় রোগযন্ত্রণার মাধ্যমে মানবাত্মার অপরিসীম বীর্য ও সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন। মহা-বিশ্বতলে যন্ত্রণার ঘূর্ণ্যযন্ত্র অবিরাম চলমান। দেহের মৃৎভাণ্ডে মানুষ অপরিসীম দুঃখের অর্ঘ্য সাজায় জ্যোতিষ্কের তপস্যায়, তার তুলনা কোথাও নেই—

এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণের,
হেন জয়যাত্রা।

দুঃখের সীমান্ত খুঁজতে, নামহীন জ্বালাময় তীর্থে উপনীত হতে মানুষ বার বারই পীড়নের যন্ত্রশালাকে অতিক্রম করে যায়।

কবি অনুভব করেছেন দেহের সীমাকে অতিক্রম করে তাঁর অন্তরতম সত্তার যাত্রা আদি জ্যোতির পানে। তাই প্রভাত-সূর্যের কাছে প্রার্থনা—

করো আলোকিত;
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও,
পরাভূত রজনীর অপমান-সহ।

—রোগশয্যায়, ১৫ সংখ্যক কবিতা

২০ সংখ্যক কবিতায় দেখি রোগ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কবি-চৈতন্য 'দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি'র ধ্যানে নিমগ্ন। এ এক প্রকার কবির নবজন্ম। দুঃখ বেদনার অন্তরালে মানবাত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করছেন কবি—

শাশ্বত প্রকাশ পারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

ব্যাধিমুক্তির পর কবি আদিপ্রাণের স্পর্শ অনুভব করছেন। নূতন দৃষ্টিতে বিশ্বকে আস্বাদন করছেন। প্রভাত-আলোয় উজ্জ্বল নীলাকাশ কবির চোখের সামনে কল্প-আরম্ভের প্রথম মুহূর্তটি উন্মোচিত করছে।

··· এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্ম-সূত্রে গাঁথা।
সপ্ত-রশ্মি সূর্যালোক-সম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।

—রোগশয্যায়, ২৩ সংখ্যক কবিতা

২৮ সংখ্যক কবিতায় জীবনের একটি বিশেষ রূপ। যে আদি-চৈতন্য-প্রবাহ কবির জীবনের মূলে প্রবাহিত, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তা কখনও আবদ্ধ হতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টি সেই আদি-জ্যোতির আনন্দকেই প্রকাশ করছে। তাই আক্ষরিক অর্থে মৃত্যুর কোন মূল্যই নেই—

'আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক।'

গড়া এবং ভাঙার মধ্য দিয়েই সৃষ্টির লীলা চলেছে কালের অসীম শূন্যকে পূরণের জন্য। মানুষের জীবনপ্রবাহও সেই সৃষ্টির খেলারই অঙ্গীভূত। মানুষ নিজের রচিত সীমানার মধ্যেই মিথ্যা সান্ত্বনা খোঁজে যা অনন্তকালের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের লীলার কাছে অকিঞ্চিৎকর। এই ধারণারই সমর্থন পাওয়া যায় ৩০ সংখ্যক কবিতায়।

ঝড়ের পরে যেমন সৃষ্টিতে নামে স্তব্ধতা, তেমনি অতীত আলোড়ন থেকে মৃত্যু তাঁকে নবজন্মের গভীর নিস্তব্ধ দ্বারপ্রান্তে উপনীত করুক। ৩৫ সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন অতীত কীর্তিকে তিনি যেন নিরাসক্তভাবে ত্যাগ করে অগ্রসর হয়ে যেতে পারেন। জাগতিক সুখদুঃখ থেকে যেন তিনি তাঁর সমগ্র চৈতন্যকে মুক্ত করতে পারেন। অসীমের সত্য পরিচয় তাঁর চৈতন্যকে সম্পূর্ণতা দান করুক।

৩৭ সংখ্যক কবিতায় কবি জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারণাটি আজীবন পোষণ করেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি করছেন। জীবন ও মৃত্যুকে বর ও বধূর রূপকল্পের মধ্যে স্থাপন করা কবির একটি প্রিয় কল্পনা। জীবন-গোধূলিতে কবি জীবন ও মৃত্যুকে মুখোমুখি অনুভব করছেন—

ধূসর গোধূলি-লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ-বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,
রক্ত সূত্র-গাছি দিয়ে বাঁধা ;
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ ;
দক্ষিণ-বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।

আরোগ্য-এর কবিতাগুলিতে রোগের বেদনা ও উত্তেজনা অনেকাংশে প্রশমিত। কবি আপনার দুঃখবিজয়ীর মূর্তিটি উপলব্ধি করলেন। এই নবলব্ধ দৃষ্টির আলোকে জগৎ ও জীবনকে সুন্দরতর মনে হল। বিদায়ের ক্ষণে পৃথিবীর প্রতি শেষ বিনম্র নমস্কার জ্ঞাপন করছেন। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে যিনি মোহমুক্ত নির্মল দৃষ্টির অধিকারী তিনিই বলতে পারেন—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

—আরোগ্য, ১ সংখ্যক কবিতা

আরোগ্য কাব্যে সমগ্র মানব-সংসার আশ্রয়লাভ করেছে। যে সব উপেক্ষিত ছবি জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল অনতিগোচর আজ বিদায়লগ্নে সেগুলি চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে জেগে উঠছে—

পথে-চলা এই দেখা শোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ-বেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

—আরোগ্য, ৪ সংখ্যক কবিতা

৮ সংখ্যক কবিতায় কবির পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ-জনিত গভীর মৌন মহান বেদনার পরিচয় পাই। দিনান্তের পান্থশালার দ্বারে উপনীত কবি অনুভব

করছেন 'শেষতীর্থ মন্দিরের চূড়া' 'নহে দূর, নহে বহু দূর'। অন্তরের সিংহদ্বারে ধ্বনিত দিন-অবসানের রাগিণী জীবনের দীর্ঘযাত্রার শেষে কবিকে পূর্ণতার ইঙ্গিত জানাচ্ছে।

উপনিষদের ঋষিরা সমগ্র সৃষ্টির অন্তরালে পরম এককে উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিও অনুরূপ—

দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

—আরোগ্য, ৯ সংখ্যক কবিতা

১৬ সংখ্যক কবিতায় কবি বিদায়ের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। এই জগতের সঙ্গে তাঁর শেষ বোঝাপড়া করে নিতে চাইছেন। যত ভুল-ভ্রান্তি, অসম্মান ঘটে গেছে জীবনে তিনি কামনা করছেন তাঁর মৃত্যুতে যেন সব অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে যায়।

বিদায়-লগ্নে কবি অধিকতর গভীর আবেগে পৃথিবী এবং মানবের অজস্র ঋণের কথা স্মরণ করেছেন। তাঁর এই মানব-প্রেমই তাঁকে মৃত্যুর ভয়-ভাবনা থেকে মুক্ত করে অমৃতের সন্ধান দিয়েছে। ২৯ সংখ্যক কবিতায়—

আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয় নি দুর্বল পরাভব।
মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হই নি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।

যাত্রার সময় তাই কোন দুঃখবোধ তাঁকে কাতর করে নি। শান্তি ও স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে তিনি অনন্তের পদপ্রান্তে জীবন সমর্পণ করতে চান।

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল
বিদায়দিনের 'পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্ভ সূর্যাস্ত-আভার ;
সময় যাবার
শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।
বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্লবসম্ভারে।

নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ,
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ।

—আরোগ্য, ৩১ সংখ্যক কবিতা

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সত্যের স্বরূপ ও আত্মার চরম উপলব্ধি হোক এই কবির কামনা আরোগ্যের শেষ কবিতাটিতে—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।

জীবন ও মৃত্যুকে একাসনে বসিয়ে কবি যে কাব্য রচনা করলেন তা হল জন্মদিনে। এই গ্রন্থটির বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কিন্তু সমগ্র কাব্য জুড়েই মৃত্যুর গাম্ভীর্য-মণ্ডিত পদধ্বনি অনুভব করা যায়। মর্ত্যজীবনের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কবি অন্তরতম সত্তার দূরত্বকে কবিতায় ব্যক্ত করলেন—

আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।

—জন্মদিনে, ১ সংখ্যক কবিতা

৫ সংখ্যক কবিতায় কবি জীবজগতের ক্রমবিবর্তনে নিজের বিবর্তনের কথা স্মরণ করছেন ; আবার প্রকৃতির অমোঘ বিধানে তাঁকে এই পৃথিবী ত্যাগ করে যেতে হবে। কবি মৃত্যুর সেই আবির্ভাব-মুহূর্তটির সাগ্রহ প্রতীক্ষারত—

সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

আয়ুর পশ্চিম সীমায় মৃত্যুর জলন্ত শিখা কবিকে জীবন ও মৃত্যুর অখণ্ডতার পরিচয় দিয়েছে। কবির মধ্যেকার 'অহং' এই মৃত্যুর আলোকে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে,
সে মহিমা উদ্‌বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

—জন্মদিনে, ৮ সংখ্যক কবিতা

১২ সংখ্যক কবিতায় কবি নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু তিনি অনুভব করছেন সকল সংশয়, তর্ক অবশেষে মৌনের গভীরে নিমজ্জিত হয়, যেখানে নাম পরিচয় সবই এক অখণ্ডতায় মিশে আছে। বাহ্য 'আমি'র ধারা পরিপূর্ণ চৈতন্য-সাগরসংগমে বিলীন হয়। সেই অজানার দূত এসেছে তাঁর কাছে—

মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম
... ...
আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল কিছু-মাঝে।

২৬ সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর মৃত্যু-ক্ষণটিকে পরম রমণীয় করে তুলতে চাইছেন। কবির কামনা মৃত্যুর বিকৃতি তাঁর জীবনাবসানের মুহূর্তটিকে বিকৃত না করুক। অসুন্দরের ব্যঙ্গ যেন জীবনকে আঘাত না করে—

জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

জীবন-সন্ধ্যায় কবি বিশ্বধরণীর বিপুল কুলায় সন্ধ্যার একটি নবরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। নিখিল জগতের গতি ধূসরবর্ণ আবরণে-আবৃত সন্ধ্যার দিকে। কবি এই জীবনের সীমা অতিক্রম করতে চাইছেন এবং তাঁর চিরন্তন গৃহে নবজন্মের প্রত্যাশা করছেন। জীবনের জীর্ণ অভ্যাসের বন্ধন ত্যাগ করে সন্ধ্যার নীরন্ধ্র অন্ধকারে নিত্যতার ইঙ্গিত লাভ করেছেন—

জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্যপথে দেয় মুক্ত করি
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে।
নবজন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে।

—জন্মদিনে, ২৭ সংখ্যক কবিতা

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে কবির উপলব্ধির চরম পরিচয় শেষে লেখা কাব্যটি। এটি তাঁর অন্তিমতম প্রয়াস। সমগ্র কাব্য-জীবনের স্বল্পভাষ ফলশ্রুতি এই কবিতাগুলি। মৃত্যুতে জীবনের পরিপূর্ণতা, মৃত্যুর মধ্যেই তিনি পূর্ণ প্রাণের পরিচয় পেলেন। এখানেও কবি মৃত্যুর উর্ধ্বে তাঁর অন্তরতম সত্তাকে অনুভব করলেন। তাই এখানে তাঁর মূর্তি দুঃখবিজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ীর। নিরাভরণ, সংহত, ঋজু, সরল মন্ত্রবৎ কবিতাগুলিতে কবির চরম অভিজ্ঞতা ও প্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে প্রথম কবিতাটিতে—

হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।

২ সংখ্যক কবিতাটিতে রবীন্দ্রমানসে যেন সংশয়ের ছায়াপাত দেখা যায়। শেষ দু বছরের কাব্যগুলিতে বেদনা ও নৈরাশ্য অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। পূর্বের মত অসংশয়িত বিশ্বাস এই সময় যেন টলে উঠেছে। তবু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য মানসিক স্থৈর্যের বলে সকল সঙ্কটের উর্ধ্বে অবিচলিত প্রত্যয়োপলব্ধির বাণীরূপ দান করেছেন—

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

কবি দুঃখ-দাহনের মধ্য দিয়ে একটি স্থির-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। অদৃশ্য কোন্ রূপকার অজানা উৎস হতে জীবনের রূপ পরিকল্পনা

করেন। আবার দিনশেষে সেই উদাসীন চিত্রকর জীবনের বিচিত্র বর্ণের উপর কালি লেপন করেন, কিন্তু জীবনের সত্য চিরতরে বিলুপ্ত হয় না—

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
... ...
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।

—শেষলেখা, ৭ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যের অন্যতম সুর বৈরাগ্য। ৯ সংখ্যক কবিতায় কবির আজীবনের বাণীর সাধনার প্রতি কি গভীর বৈরাগ্য ও অনাসক্তি। মৃত্যুঞ্জয়ী কবি, দুঃখ-বেদনার, অগ্নিপরীক্ষায় আত্মস্বরূপের চরম পরিচয় লাভ করেছেন। তাই তাঁর দৃষ্টি এত মোহমুক্ত—

বাণীর মূরতি গড়ি
একমনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি—
... ...
অসীম বৈরাগ্যে তার দিকবিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
... ...
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।

১১ সংখ্যক কবিতায় বলা হয়েছে মৃত্যুর সত্য স্বরূপের উপলব্ধি হলে কঠোর দুঃখের তপস্যা ও প্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে শান্তির অক্ষয় স্বর্গে উন্নীত হওয়া যায়—

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

যতবার কবি মৃত্যুকে ভীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ততবারই তাঁর জীবনে ঘটেছে অনর্থ পরাজয়। এই সব ভয় ও বিভীষিকা অন্ধকারে মৃত্যুর ছলনা; যে এই ছলনা ভেদ করে সত্তার সত্য-স্বরূপের পরিচয় লাভ করে সেই পায় শান্তির অক্ষয় অধিকার। এই কাব্যের ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক কবিতায় কবি যথাক্রমে মৃত্যুর স্বরূপ—

দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

এবং বিচিত্র ছলনা জালের অন্তরালে সৃষ্টির দুরবগাহ রহস্য উপলব্ধির মাধ্যমে স্থির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
... ...
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এই দুটি কবিতা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"শেষ লেখা-র শেষ দুইটি কবিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্তিম রশ্মি বিস্ফুরণ, মরণের দুর্ভেদ্য জটিলতার মধ্যে বিশ্বাসের পথ রচনার দুঃসাধ্য ক্লেশ-সংকুল প্রচেষ্টার বাণীরূপ।"[১]

শেষ পর্যায়ের কবিতায় আমরা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতে অপূর্ব একটি মিলন অনুভব করি। জীবন বা মৃত্যু কোনটিকেই তিনি বর্জন করতে চান নি। একটি সামগ্রিক অখণ্ড ধারণার মধ্যে উভয়েই বিধৃত হয়ে আছে। তাই শেষ জীবনে অসীম বৈরাগ্যের মধ্যেও জীবনের প্রতি ভালবাসার পরিচয় কবি অকুণ্ঠভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন—

আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে—
মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ॥

—শেষলেখা, ১০ সংখ্যক কবিতা

১. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃ. ২৪৫-২৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও শেষপর্যায়

রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় তিনি কবি। তবু তাঁর কাব্যগুলি পাঠকালে আর একটি পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে, তা হল তাঁর ঋষি-সুলভ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। আজীবন উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কাব্য-ধারায় ভারতাত্মার শাশ্বত বাণীকে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। বিদগ্ধজনের মতে—"রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের পরিণতি এই উপনিষদের ধারায়। ধর্মপ্রেরণা ও কবিপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে এক এবং অবিচ্ছেদ্য।"[১] জীবনের উত্তর ভাগে রবীন্দ্রনাথের এই দার্শনিক চেতনা আরও গভীরতর হয়েছে। এই সময়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-অনুভূতির সঙ্গে উপনিষদের সুরের একটি সার্থক সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের উত্তর পর্বের কাব্যের দার্শনিক জিজ্ঞাসাকে কয়েকটি মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে আলোচনা করা যায়।

১. সূর্যপ্রশস্তি

রাত্রির অন্ধকার যবনিকা ভেদ করে নবীন সূর্যের উদয় রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে শৈশব থেকেই আকৃষ্ট করেছে। এই অনন্ত রশ্মির মধ্যেই বিশুদ্ধ চৈতন্য-প্রবাহকে তিনি অনুভব করেছেন। বাল্যকালে উপনয়ন সংস্কারের পর থেকেই সূর্যের এই মহিমান্বিত রূপটি তাঁকে আকর্ষণ করেছে।

সবিতার স্বরূপ বর্ণনায় আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিও সরব—

সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।

সূর্য সমস্ত সচল এবং অচল পদার্থের আত্মা।[২]

আবার এই ঋগ্‌বেদের ১।৫০ সূক্তে বলা হয়েছে—'সূর্য উদিত হলেই সমস্ত পদার্থকে দেখতে পাওয়া যায়, জানতে পারা যায়। তিনি বিশ্বচক্ষু জাতবেদা।' এই সবিতাই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টিকারক এবং সমগ্র মানব-বুদ্ধির ধারক—

১. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস (১৩৬৮), পৃ. ১৮

২. ঋগ্‌বেদ, ১।১১৫।১ সূক্ত

তৎসবিতুর্ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥[১]

উপনিষদের মধ্যেও নানা স্থানে সূর্যের স্বরূপের বর্ণনা আছে। এখানেও সবিতাকে প্রাণের উৎস বলে অভিহিত করা হয়েছে—

'য এবা সৌ তপতি তমুদ্‌গীথমুপাসীত ; উদ্যন্ বা এষ প্রজাভ্য উদ্‌গায়তি।' তর্থাৎ 'এই যিনি তাপ দিচ্ছেন তাঁকে উদ্‌গীথ (প্রণব ওঁকার) বলে উপাসনা করবে ; ইনি উদয়কালে প্রজাদের জন্য উদ্‌গীথ গানই করে থাকেন।'[২]

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে সমধিক প্রভাবিত করেছিল। তাই সূর্যকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তার মধ্যে এই দার্শনিকতারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূরবী-র 'সাবিত্রী' কবিতায় কবি সূর্যের মধ্যে একটি সর্বব্যাপী শক্তির কথা বলেছেন। আপন অন্তরাত্মার সঙ্গে সূর্যে বিরাজিত অনন্ত আত্মার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করেছেন—

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী
আয়ুস্রোত মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোকে।
তরঙ্গ হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ।

কবি সূর্যের তমোনাশী জ্যোতিঃ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। উপনিষদের ঋষির মত তাঁরও প্রার্থনা—"হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, অপ্রাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো। আমার মধ্যে যে গুহায়িত সত্য, তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃ স্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।"[৩] সূর্যের যে আলোক বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রাণ-স্পন্দন আনে, সেই আলোকই কবি মনের অন্ধকার দূরীভূত করে। এই আলোকের মধ্য

১. ঋগ্‌বেদ, ৩।৬২।১০ সূক্ত
২. ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ১।৩।১
৩. রবীন্দ্ররচনাবলী ১৯ খণ্ড (বি. ভা. ১৩৬৩), পৃ. ৩৭৬

দিয়েই অসীম বিশ্বের সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মার পরিচয় নিবিড় হয়েছে। কবি তাঁর সুরের অভিসারের মধ্য দিয়ে আলোকের দেবতার কাছে আপন সত্য স্বরূপের পরিচয় পাবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন। কারণ আত্মার স্বরূপের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হয় এবং প্রাণে আসে শান্তির স্তব্ধতা—

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।
শান্তি অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
... ...
দিনান্ত-সংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

রবীন্দ্রনাথের এই 'সাবিত্রী' কবিতার সূর্য-বন্দনার সঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচক বৈদিক ঋষিদের চিন্তার সাধর্ম্য লক্ষ্য করেছেন—"বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির বস্তুময় প্রকাশের মধ্যে চৈতন্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেই ভাবের প্রেরণাই কবি রবীন্দ্রনাথের এই 'সাবিত্রী' কবিতাটিকে প্রাণবন্ত করিয়াছে। কিন্তু সবিতার যে সত্তাটি কবির মানস-চক্ষে উদিত হইয়াছে, তাহা মার্তণ্ড নহে, রুদ্রও নহে। তাহা আদিত্যের সংহার-মূর্তি নহে, ভয়ঙ্কর আবির্ভাব নহে—তাহা আলোকদীপ্ত তেজোময়, জগতের সকল ভাব রস-রূপ-গন্ধ শব্দ স্পর্শের মূল উৎস, তাহা জ্যোতিঃ স্বরূপ।"[১] সূর্যের নিকট শেষ পর্যায়ের 'সাবিত্রী' কবিতার অনুরূপ প্রার্থনা করেছেন তাঁর প্রথম যুগের কাব্য প্রভাত-সঙ্গীত-এর 'প্রভাত-উৎসব' কবিতায়—

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণতরী তব পুরবে ছেড়ে দাও,
আকাশ পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে॥

রবীন্দ্রনাথের এই আলোর মন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গেছে একান্ত বাল্যকালেই। তাই বাল্যজীবনের কথা প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন শৈশবে শীতের শেষ রাত্রে

১. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরশ্মি, পশ্চিমভাগ (৫ম সং), পৃ. ২৫২

অন্ধকারের আড়াল থেকে নবীন সূর্যের উদয় কিভাবে তাঁর সমগ্র চৈতন্যকে প্রভাবিত করত একথা তিনি নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন। শেষসপ্তক-এর ছেচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন—

তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরের বেলায় দেখতেম জানালা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন-ফোটা কাঁটালি চাঁপার মতো।

প্রতিটি প্রভাত তাঁর কাছে ছিল স্বতন্ত্র, নূতন। জীবনে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবি অনুভব করেছেন শৈশবের মত আর তেমন করে প্রভাতকে আহ্বান জানানোর অবসর হয় না। তাই জীবনের শেষ পর্বে উপনীত হয়ে তিনি জীবনের বোঝা ফেলে নূতন হয়ে সেই চির-নূতনের কাছে উপস্থিত হতে চেয়েছেন।

পত্রপুট-এর দশ সংখ্যক কবিতায় কবি আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধির কথা বলেছেন। দেহের কামনার আবর্জনারাশি ও আবিল আবরণে আত্মার মুক্তরূপ ঢাকা পড়েছে। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের নির্মল জ্যোতিতে কবি মানুষের অন্তরতম সত্তার অন্বেষণ করেন, তখন দেহ ভার তাঁর তুচ্ছ হয়ে যায়। তিনি অনুভব করেন তাঁর দেহের অণুপরমাণু সূর্যের তেজোময় সূক্ষ্ম অগ্নিকণায় গঠিত। সূর্যের জ্যোতির কেন্দ্রে মানুষের মহৎ স্বরূপকে উপলব্ধি করছেন। এই কবিতাটির প্রেরণার কেন্দ্রে আছে উপনিষদের একটি মন্ত্র—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥[১]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষিকবির প্রার্থনা মন্ত্র,
যে মন্ত্রে বলেছিলেন, হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

—পত্রপুট, ১০ সংখ্যক কবিতা

১. ঈশোপনিষদ্, ১৫

এই প্রার্থনা মন্ত্র স্মরণ করে কবি তাঁর অন্তরের প্রার্থনা ব্যক্ত করেছেন—

বলি, হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন—
... ...
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
আমার অন্তরতম সত্য

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
... ...
বলেছে 'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র'
বলেছে 'দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব।

—পত্রপুট, ১০ সংখ্যক কবিতা

এই কবিতার সঙ্গে ঋষি কবির ঘোষণাটি স্মরণ করা যেতে পারে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যন স্থু
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

পত্রপুট-এর পনের সংখ্যক কবিতায় কবি আপন পুলককম্পিত অন্তরে আলোর মন্ত্রকে উপলব্ধি করেছেন। যে জ্যোতি দেহে সৃষ্টি বিলীন হয়েছিল সেই আদি জ্যোতির সঙ্গে তাঁর সত্তার একাত্মতা অনুভব করেছেন—

প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎসব থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া,
অনাদি কালের কোন অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।

দুঃখে জর্জরিত পথভ্রষ্ট মানুষকে সমস্ত ভেদচিহ্নের ঊর্ধ্বে পরিত্রাণ করতে পারেন সেই মহান পুরুষ, যিনি কোন কাল-পরিধির গণ্ডীতে আবদ্ধ নন, তিনি চিরকালের মানুষ। সূর্যের জ্যোতির আড়ালে কবি তাঁকেই দেখেছেন—

হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে।

অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়ে যায় অজ্ঞানান্ধকারের পারে উপনিষদ্-কথিত সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে।

রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছেন তাঁর মন মোহমুক্ত হোক। প্রভাত-সূর্যের জ্যোতিতে তমঃ-আবরণ ভেদ করে প্রকাশিত হোক সত্য এবং অমৃত। কবির আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি হোক। শ্যামলী-র 'কালরাত্রে' কবিতার মধ্যেও কবি সূর্যের আত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করেছেন—

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাত সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ ;
ডিঙ্গিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,

কবি উত্তর কাব্যের দিকে যত অগ্রসর হয়েছেন, ততই তিনি আত্মোপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করছেন, কবি জীবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারে ঔপনিষদিক জ্যোতির্লোকে নিজেকে বিলীন করে চরম আত্মোপলব্ধি লাভ করতে চেয়েছেন। মৃত্যু-দূতের আগমনে জীবনের নাট্যসাজ তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে। অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায় সমগ্র বিশ্বের উপর যখন নেমে আসে ঘন তমসার আবরণ তখন কবি সেই তামসের পরপারে মহান্ জ্যোতির্ময় পুরুষকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে চেয়েছেন—

হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

—প্রান্তিক, ৯ সংখ্যক কবিত'

রোগশয্যায় ব্যাধির বেদনায় কবির আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা বিশ্বের দৃষ্টি হরণ করছে। তখনও দেখা যায় কবি আপন পুরাতন প্রত্যয়ে দৃঢ়। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় ঋষির ন্যায় প্রার্থনা—

হে প্রভাত সূর্য,
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল ;
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত ;
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও,
পরাভূত রজনীর অপমান-সহ।

—রোগশয্যায়, ১৫ সংখ্যক কবিতা

আজীবন তিনি সূর্যদেবকে আত্মার পরম আত্মীয় রূপে কল্পনা করেছেন। আত্মার লীলাভূমি এই মর্ত্যনিকেতনে জীবন যখন সমাপ্তির প্রহর ঘোষণা করছে তখনও তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে এই বিশ্বকে ভালবাসা জ্ঞাপন করেছেন এবং মহাযাত্রার পূর্বে সূর্যের অমৃত আলোয় দেহ-মনকে অভিষিক্ত করে নিতে চেয়েছেন—

খুলে দাও দ্বার ;
নীলাকাশ করো অবারিত ;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেশে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ;

সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে।

—রোগশয্যায়, ২৭ সংখ্যক কবিতা

ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁর সেই অনিঃশেষ আনন্দেরই প্রকাশ—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ; সেই আনন্দ হতেই সমস্তই উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে। কবি তাঁর সমগ্র প্রাণ মন ভরে এই আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছেন। এই আনন্দসাগরে তাঁর চৈতন্য পরিপূর্ণ মুক্তি পাবে। প্রভাত সূর্যের আলোর উদ্ভাসে তিনি সেই শুদ্ধ আনন্দকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার সঙ্গে আপন আত্মার একাত্মতা অনুভব করেছেন।—

> যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
> প্রভাত-আলোর সাথে
> দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।
> শূন্য তবু সে তো শূন্য নয়।
> তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—
> আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
> জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।
> কোহ্যেবাণ্যাৎ কঃ প্রাণাৎ
> যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

—রোগশয্যায়, ৩৬ সংখ্যক কবিতা

আরোগ্য কাব্যগ্রন্থে কবি মৃত্যু-রাত্রির অন্ধকারে শেষে প্রভাতের প্রসন্ন আলোয় 'দুঃখবিজয়ীর মূর্তি'তে আপনার সত্য স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিগত দিনের অনেক অনুভূতি কবির মনে জাগছে নূতন করে। তাই আত্মোপলব্ধি ঘটেছে নবতররূপে। তিনি ঋষিকবির ন্যায় প্রকাশ শক্তির প্রার্থনা করেছেন—

> আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃতি প্রহরে
> পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা
> সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ
> মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।
> মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
> বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
> মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে;

—আরোগ্য, ৩ সংখ্যক কবিতা

শেষ পর্যায়ে এসে শেষ যাত্রার সঙ্গীতের সঙ্গে কবির পরিপূর্ণ চৈতন্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। তিনি ধরণীর প্রাণের আহ্বান শুনতে পেয়েছেন। ব্যাধিক্লান্ত নিস্তব্ধ প্রহরে তিনি অমৃতের অন্বেষণ করেছেন—

বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।

—আরোগ্য, ৫ সংখ্যক কবিতা

আরোগ্য-এর ৯ সংখ্যক কবিতায় কবির ধ্যানতন্ময় দৃষ্টি সৃষ্টিরহস্যের গভীর তলদেশকে স্পর্শ করেছে। কবি দেখেছেন সৃষ্টির বিরাট প্রাঙ্গণে অজানা নেপথ্য থেকে প্রকাশিত অগনিত গ্রহ-তারকার আলোকোৎসব। কবি অনুভব করেছেন তিনিও ক্ষুদ্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ দেশ-কাল-পরিধির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন।—

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগ-যুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।

মৃত্যুর সিংহদ্বারে উপনীত হয়ে কবি অন্তরে দিব্য আনন্দ লাভ করেছেন। আদি জ্যোতির উৎস তাঁর অন্তরে পূর্ণ চৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে, অনুভব করেছেন তিনি অমৃতের অধিকারী।—

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।
এক আদি জ্যোতি উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্য স্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

—আরোগ্য, ৩২ সংখ্যক কবিতা

আবার ৩৩ সংখ্যক কবিতাটিও কবির ঔপনিষদিক চিন্তার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর দৃষ্টির মোহ-আবরণ ঘুচে গেছে। অন্ধকারের কুহেলিকা ভেদ করে কবি সূর্যমণ্ডলের সর্বব্যাপী জ্যোতিকে উপলব্ধি করেছেন। এক অনন্ত প্রাণ-প্রবাহ যেন সংসারের সর্বত্র বিরাজ করছে। এই নিত্যের সম্যক্ পরিচয় কবি বিদায়ের আগে অনুভব করতে চেয়েছেন—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চির-মানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত।

জন্মদিনে কাব্যটি আত্মার অপরিমেয় রহস্য অনুসন্ধানের কাব্য। ৫ সংখ্যক কবিতায় কবি আপন আত্মার ক্রমাভিব্যক্তির প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের কথা বলেছেন। আবার জীবন ও মৃত্যু একই বিশ্বপ্রবাহের অঙ্গীভূত এই দার্শনিক প্রত্যয়েরও পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষকোটি নক্ষত্রের সূর্য-পরিক্রমার মধ্যে তাঁরও স্থান আছে। কারণ সৃষ্টির আদিযুগে যে আলোকপ্রবাহ অসীম প্লাবিত করেছিল, সেই আলোকের একটি স্ফুলিঙ্গ কবি আপন সত্তায় অনুভব করেছেন ; তাই জন্ম-মৃত্যুর দ্বৈতরূপ তাঁর কাছে অর্থহীন। পৃথিবীর ঋণ স্বীকার করেও তিনি মৃত্যুর জন্য শান্ত চিত্তে প্রতীক্ষা করছেন—

আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ
যে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

১৩ সংখ্যক কবিতায় কবি মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্যকে তমসের পরপারে জ্যোতি বলে অভিহিত করেছেন। এই জ্যোতির উপলব্ধি হওয়ায় কবির দৃষ্টি

হয়েছে মোহমুক্ত। তিনি জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হয়েছেন, তাই তিনি ঘোষণা করেছেন—

স্বষ্টিলীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু,
ভস্মে যার দেহ অন্ত হবে,
যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া
সত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ।

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির পাশাপাশি আমরা উপনিষদের ঋষির উপলব্ধিকে স্থাপন করলে দেখতে পাব উভয়ের চিন্তাধারার মূলে ভেদ সামান্যই—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শারীরম্।
ওম্ ক্রতো স্মর কৃতংস্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

অর্থাৎ 'অনন্তর আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হউক। হে চিন্তাশীল মন! তুমি তোমার কৃত ও কর্তব্য বিষয় স্মরণ কর।'[১]

নবপ্রভাতের নূতন জ্যোতি প্রতিদিনই কবিকে নবচেতনা দান করেছে। মৃত্যুর দ্বার-প্রান্তে উপনীত হয়ে কবির কামনা তাঁর মর্ত্যজীবনের আসক্তির অবসান হোক্; আত্মার সত্য-স্বরূপে উপলব্ধি হোক্। এই আত্মোপলব্ধির কামনা কবি সারা জীবনই করেছেন, তবে শেষ পর্যায়ে এসে এই আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রতর হয়েছে। শুদ্ধ চৈতন্যের আধার স্বরূপ সবিতার উপাসনাও তাই শেষ পর্যায়ের কবিতায় বারে বারেই লক্ষ্য করা যায়—

১. ঈশোপনিষদ্, ১৭

ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্ত্যলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রিসম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

—জন্মদিনে, ২৩ সংখ্যক কবিতা

২৫ সংখ্যক কবিতায় কবি আত্মার মহিমাকে উপলব্ধি করার জন্য সবিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, জাগতিক তুচ্ছতা, পাপ যা আত্মাকে আচ্ছন্ন করে থাকে তা থেকে তিনি যেন মুক্তি লাভ করতে পারেন। সমগ্র চরাচরে যে অন্তহীন শান্তি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে কবি তাকে জীবনে আহ্বান জানাচ্ছেন—

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূ-লোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে।

অনুরূপ প্রার্থনা শুনতে পাই অথর্ববেদ-এর ঋষির কণ্ঠে। তিনিও প্রার্থনা করেছেন সূর্যদেবের কাছে আত্মাকে পাপমুক্ত করার জন্য—

যত্ত আত্মনি তন্বাং ঘোরং অস্তি যদ্বা
কেশেষু প্রতিচক্ষণে বা।
সর্বে তদ্বা চাপ হণ্মো বয়ং দেবস্ত্বা
সবিতা সূদয়তু।

অর্থাৎ 'হে জীব! দ্যোতমান জ্ঞানপ্রেরক সবিতা দেব তোমাকে শ্রেয়োদান করুন; তাতে তোমার হৃদয়ে ও দেহে অনুভূয়মান বা পরিদৃশ্যমান যে পাপ (অজ্ঞাত রূপ যে ঘোর) বিদ্যমান আছে অথবা তোমাকে শিরোভাগে মস্তিষ্কে এবং দৃষ্টি সাধনভূত নেত্রে যে পাপ বিদ্যমান আছে, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সেই

সকল পাপকে ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনাকারী অপহত করি। (দূর করতে সমর্থ হব) অর্থাৎ (জ্ঞান-প্রেরক সবিতা দেবতা কৃপা পরায়ণ হলে মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আমরা আমাদিগের সর্বপ্রকার পাপনাশে সমর্থ হব)।[১]

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই একটি অখণ্ড চিৎপ্রবাহ ও বিশ্বপ্রবাহকে জীবনে ও জগতে অনুভব করেছেন। প্রথম যুগে যে চেতনা ছিল অস্ফুট, শেষ বয়সের কবিতাগুলিতে সেব চেতনা আধ্যাত্মিকতা যুক্ত হয়ে অপূর্ব রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। সূর্যোদয়ের শেষরাত্রির অপসৃয়মান অন্ধকারের সঙ্গে মৃত্যুতে আত্মার দেহবন্ধন মুক্তির তুলনা করেছেন। বন্ধনমুক্ত আত্মা বিশ্বচৈতন্যের অংশীদার, তাঁর এই দার্শনিক উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় সূর্য-প্রশস্তির মধ্যে। আজীবন নবীন সূর্যের উদয় মুহূর্ত তাঁকে নব নব ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং দেশ-কাল-মুক্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিচয় দিয়েছে।

২. বিশ্বৈক্যবোধ, বিশ্বাত্মবোধ এবং উপনিষদের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ একটি সর্বব্যাপী অখণ্ডতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাস উপনিষদের পরম সত্যে বিশ্বাসের অনুরূপ। শেষ পর্যায়ে এসে কবির এই ঔপনিষদিক বিশ্বাস আরও গভীরতর হয়েছে। সমগ্র জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতিতে তিনি অনন্তের পরিচয় পেয়েছেন এবং নিজের অন্তর-সত্তাকে এই অনন্তের সঙ্গে একাত্মরূপে উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যে একটি অখণ্ড ঐক্য বিরাজ করছে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় এবং তা উপনিষদের প্রভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থ প্রভাত সঙ্গীত-এর মধ্যেও এই সুরটি শুনতে পাওয়া যায়—

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।

১ অথর্ববেদ, ১।২।৩

সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা,
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে—
মেশে আসি সেই সিন্ধু 'পরে।

—প্রভাত-সঙ্গীত, অনন্ত জীবন

এই কবিতাটির মূল সুরের সঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদ-এর নিম্নলিখিত শ্লোকটির মিল লক্ষ্য করা যায়—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

অর্থাৎ "প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে সমুদ্রে অস্ত যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ নাম ও রূপ থেকে বিমুক্ত হয়ে পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।"[১]

শেষ পর্যায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথও স্বীয় চৈতন্যকে আনন্দস্বরূপ অখণ্ড চৈতন্যে বিলীন করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। পূরবী-র 'মুক্তি' কবিতায় বলেছেন—

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশ যাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত,
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায়, মোর লীলা,—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

আবার পূরবী-র 'সাবিত্রী' কবিতায় বলেছেন—

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।

১. মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৮

শান্তি-অভিষেক হ'ক, ধৌত হ'ক সকল আবেশ
অগ্নি উৎসধারে।
সীমন্তে, গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার স্নিগ্ধভালে।
দিনান্ত-সঙ্গীত ধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

শুধু শেষ পর্যায়ের কবিতায় নয় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন যুগের বহু কবিতায় এই বিশ্বাত্মবোধ, বিশ্ব সৌন্দর্য ও রহস্যের সুতীব্র অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। কবি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ঐকাত্ম্যবোধের কল্পনা করেছেন। প্রথম যুগের কবিতায় মানসী-র 'অহল্যার প্রতি'-তে কবির এই মনোভাবটির পরিচয় পাওয়া যায়। শাপমুক্তির পর অহল্যাকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি লিখিত। পাষাণময়ী অহল্যা এই পৃথিবীর সঙ্গে মিশে ছিল। এই বসুন্ধরার আপাত চেতনাহীন জড়ত্বের পশ্চাতে আছে মমতাময়ী মাতৃমূর্তি। যিনি জীবকে বিপুল স্নেহে বক্ষে ধারণ করে আছেন।—

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্যতপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা-মাঝে?

সোনারতরী কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। কবি অনুভব করেছেন বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জন্মান্তরের। অতীতে তিনি

এই বিশ্বের সঙ্গে একদেহে লীন হয়ে ছিলেন। এই অনুভূতিই আছে কবির বিশ্বাত্মবোধের মূলে। ছিন্ন পত্রাবলী-র পত্রগুলির মধ্যেও কবির এই অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। 'সমুদ্র'কে তিনি আদি জননী আখ্যা দিয়েছেন। তাই সমুদ্রের কল্লোলে তাঁর পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে,
... ...
সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়,

—সোনার তরী, 'সমুদ্রের প্রতি'

চৈতালি-র 'মধ্যাহ্ন' কবিতার মধ্যেও কবির এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মার মনোভাবটি লক্ষ্য করা যায়। আদি যুগে সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিতে আদিম আনন্দ-রস পানের স্মৃতি তাঁর মনে উদয় হচ্ছে।

প্রথম যুগের এই অনুভূতি শেষ পর্যায়ে এসে আরও গভীরতর ও নিবিড়তর হয়েছে। জীবন থেকে বিদায় যখন আসন্ন তখন তিনি পৃথিবীর ধূলিতে প্রণতি জানাচ্ছেন এবং মাটির সঙ্গে একাত্ম হতে চাইছেন। শেষ জীবনের কবিতায় আক্ষরিক অর্থেই তাঁর মৃত্তিকাশক্তি লক্ষ্য করা যায়। পূরবী-র 'মাটির ডাক' কবিতার মধ্যে এই একাত্মার আকুতি লক্ষ্যণীয়।—

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নিবিড়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিশ্ব-মানবের যোগে সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। বনবাণী কাব্যগ্রন্থে কবির সঙ্গে

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের আত্মীয়তা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে তিনি মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন। তাঁর মুক্তি-চিন্তা জীবনকে অস্বীকারের মধ্যে নয় বরং বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবনের বন্ধন স্বীকার করে। বনবাণী কাব্যগ্রন্থে কবি তাঁর এই মুক্তি চিন্তাকেই রূপায়িত করেছেন। "ওই গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন। ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রানি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই; বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"[১] নিখিল প্রাণের তরঙ্গ এই বনপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। বনের বাণীই আদি প্রাণের বাণী। কবি নিজ সত্তায়ও সেই প্রাণকে অনুভব করেছেন।—

···যে জীবন
মরণ তোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

—বনবাণী, 'বৃক্ষবন্দনা'

সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথ এক নৃত্যচঞ্চল নটরাজের কল্পনা করেছেন। তাঁর এক পদক্ষেপে পুরাতনের ধ্বংস এবং অন্য পদক্ষেপে নূতনের আবির্ভাব। এই নৃত্যের বেগে দুরন্ত যৌবনের আবির্ভাব হবে এবং যৌবনই বয়ে আনবে মুক্তি।—

নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।

১. বনবাণী, ভূমিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫ খণ্ড (বি. ভা. ১৩৬৮), পৃ. ১১৩

তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধন গ্রন্থিগুলি
ছন্দ বেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি;
সর্ব অমঙ্গল সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত লয়ে।

—নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, 'উদ্বোধন'

পরিশেষ-এর 'প্রাণ' কবিতার মধ্যেও কবি এক সর্বব্যাপী প্রাণের উপলব্ধি করেছেন। বহু লক্ষ বর্ষব্যাপী অনন্ত কাল-প্রবাহে প্রাণের যাত্রা। এই ধরণীও সেই প্রাণকে ধারণ করে আছে এবং অসীমের আরতিতে সেই প্রাণকে প্রকাশ করছে; পৃথিবীর এই প্রাণ প্রকাশ ব্যাহত হলে সমগ্র সৃষ্টি হয়ে পড়বে শ্রীহীন। তাই এক অখণ্ড প্রাণবন্ধনে সমগ্র চরাচর বাঁধা।—

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ্;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।

কবি যতই জীবনের উত্তর প্রান্তে অগ্রসর হয়েছেন ততই তাঁর অখণ্ড ঐক্যের ধারণাটি দৃঢ়তর হয়েছে। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে; আবার তিনি নিজ অন্তর সত্তায় অসীমের প্রকাশ অনুভব করেছেন এবং নিজ প্রাণকে তিনি অনন্তের মধ্যে প্রসারিত বলে উপলব্ধি করেছেন। আনন্দ ও অমৃত-স্বরূপ যে অখণ্ড চৈতন্য, তার মধ্যে তিনি তাঁর চৈতন্যকে উৎসর্গ করার জন্য জীবন শেষের দিনগুলিতে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করেছেন।

তাঁর এই অখণ্ডতার ধারণায় কোন ছেদ বা সমাপ্তি স্থান পায় নি। কারণ ছেদ যা আছে তা রূপান্তর মাত্র। তা না হলে সমগ্র সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে পড়ত—

যত গ্রহনক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্তন
মহাকাল সমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে,
সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এধারে।
... ...
অসীমের অসংখ্য যা কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই,
এ কি সত্য হতে পারে।

—পুনশ্চ. 'মৃত্যু'

রবীন্দ্র-কবিমানসের অন্বেষণে শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থের একটি বিশেষ মূল্য আছে। কবি জগৎ ও জীবনকে উপভোগ করেছেন এবং সীমার বন্ধনের মধ্যেই পেয়েছেন অসীমের ইঙ্গিত। অনন্ত লীলাময়ের লীলা তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং নানা রূপে-রসে ও ব্যঞ্জনায় কাব্যে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু শেষ-সপ্তক-এর যুগে পৌঁছে কবির উপলব্ধির পরিবর্তন হয়েছে। "এখন হইতেই এই লীলা-রসিক ভগবান কবির নিকট তাঁহার হৃদয়বিহারী আত্মায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। চঞ্চল লীলারহস্য এখন আর তাঁহার মুগ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করে না, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির শান্ত গাম্ভীর্যে হৃদয় এখন পরিপূর্ণ। আত্মা অসীম ও অনন্ত এবং মানবদেহে আবদ্ধ হইলেও বিশ্বাত্মার অংশ। তাই বিশ্বজগতের সঙ্গে তাহার অন্তরতম যোগ। মানুষের এই অন্তরতম সত্তার—এই আত্মার বিস্মিত উপলব্ধিই নানাভাবে কবি শেষ জীবনের কাব্যে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।"[১] শেষ সপ্তক থেকেই কবির ঔপনিষদিক চেতনা ও

১. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ. ৫৮৩

আত্ম-সমীক্ষা আরও গভীরতর হয়েছে এবং পরবর্তী কাব্যগুলিতে এই চেতনা নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। চার সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে এই জগতের বাহ্যিক সৌন্দর্যে তাঁর মন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল; এখন তাঁর ঘোর-ভাঙা চোখ সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক। যে অস্তিত্বের ধারা সমগ্র জগৎ-ব্যাপী প্রবাহিত, কবি সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে নিজ চৈতন্যকে লীন করে দেবার জন্য উৎসুক—

চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে।
... ...
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।
এর আলোছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু—মহাসাগর সংগম

কবি সৃষ্টির অন্তরালে এক নির্লিপ্ত উদাসীন মহাকালের কল্পনা করেছেন, যিনি জন্ম এবং মৃত্যুতে, ধ্বংস এবং সৃষ্টিতে একই আনন্দ ভোগ করে থাকেন। কবি সেই আনন্দকে উপলব্ধি করতে চাইছেন এবং সেই মহাকালের কাছে আশ্রয় চাইছেন—

হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নি শিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

—শেষ-সপ্তক, সাত সংখ্যক কবিতা

আট সংখ্যক কবিতায় কবি মোহমুক্ত হবার কামনা জানিয়েছেন। কত নামহীন রূপকার তাঁদের স্বাক্ষর রেখে গেছে ভাবীকালের দরবারে কিন্তু

খ্যাতিকে তাঁরা বিস্মৃতির পবিত্র অন্ধকারে সমর্পণ করেছিলেন। কবিও বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দের মধ্যে নিরহংকার মুক্তি কামনা করেছেন,—

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

কবি নিরাসক্ত হয়ে কাজ করার সাধনা করেছেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এই সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়—

কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ সাতং সমাঃ[১]

বা

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।[২]

ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত যে কর্মের আদর্শ, তাকে তিনি জীবনে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিলেন; তাই কর্মেই তিনি মুক্তির স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ সংখ্যক কবিতায় কবি মানব-সত্তার অনন্ত মহিমার কথা ব্যক্ত করেছেন। দেহবদ্ধ সুখ দুঃখময় জীবনে আমরা কখনও কখনও দেহাতীত ও জীবনাতীত রহস্যের ইঙ্গিত পাই। বিশ্ব-প্রকৃতির নানা লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে নিত্য প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করি।—

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত।

—শেষ সপ্তক, পঁয়ত্রিশ সংখ্যক কবিতা

আবার ছত্রিশ সংখ্যক কবিতায় বিশ্ব-প্রকৃতির নানারূপের মধ্যে বিশ্বের নিত্যকালের মর্মবাণী শুনতে পাচ্ছেন। সেই অশ্রুত বাণী যেন সর্ব-চরাচরে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।—

---

১. ঈশোপনিষদ্, ২

২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২।৪৭

কাজ ভোলা এই দিন
উধাও বলাকার মতো
লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায়।
ঝাউগাছের মর্মরধ্বনিতে মিশে
মনের মধ্যে এই কথাটি উঠছে বেজে,
'আমি আছি'।

শেষ সপ্তক-এর প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যে বিশ্ব-রহস্যের মধ্য দিয়ে আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি এবং ক্ষুদ্র খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে অখণ্ড বিরাটের স্পর্শ লাভ করা যায়। বীথিকা কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্র-কবিমানস আত্মোপলব্ধি এবং একাত্ম-বোধ অনুভূতির আরও গভীরে প্রসারিত। সৃষ্টিরহস্য, বিশ্ব-নিসর্গ ও মানবের সত্য পরিচয়, পরিবর্তনের অন্তরালে নিত্য সত্যের লীলা এবং নিজ জীবনের স্বরূপ অন্বেষণ সুগভীর দার্শনিকতার সঙ্গে এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে আত্ম-প্রকাশ করেছে। বিদগ্ধজনের মতে "ইহা কবি-মানসের কাব্য-দর্শন যুগের চরম দান"।[১] এই কাব্যগ্রন্থটির একটি বৈশিষ্ট্য হল গভীর দার্শনিকতার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার সমন্বয়। এই কাব্যে কবির একটি গভীর স্থির প্রত্যয়ের পরিচয় পাই। কবি এই বিশ্বরহস্যের মূলে প্রবেশ করেছেন। এই নিত্য প্রবহমান বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে একযোগে কবি-জীবনের প্রবাহ অনাদিকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। 'অতীতের ছায়া' কবিতাটিতে অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এক হয়ে মিশে গেছে কবির চিত্তে। প্রতিটি মুহূর্ত অতীতের গর্ভে লীন হয়ে যাচ্ছে। অতীত এবং বর্তমানের মিলিত ইতিহাসই হচ্ছে বিশ্ব-ইতিহাস। এখানে কবি অতীতকে সুদক্ষ শিল্পীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে শিল্পী জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলীকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাব্য রচনা করে চলেছেন। কবিও সেই প্রশান্ত মন ও নির্লিপ্ত দৃষ্টি কামনা করেছেন—

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্ত প্রায়
গোধূলির ধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্যতার দৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময়;

১. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ ৫৯২

কবির চিত্তে দ্বৈতাদ্বৈতের দ্বন্দ্ব ঘুচে গেছে। কবি পরম 'এক'-এর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। জীবনের আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ কামনা সমস্তকেই কবি অনন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুভব করেছেন। তাই তাঁর চিত্তরাজ্যে শান্তি বিরাজমান।—

নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব,—
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব,
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
আমি-হীন চিত্তমাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।

—বীথিকা, 'ধ্যান'

'নব পরিচয়' কবিতায় কবি আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করেছেন এবং মানব-জীবনকে নিত্যমুক্ত, নিরাসক্ত এবং অনন্তের অংশরূপে অনুভব করেছেন। মানবজীবনে কবি অনন্ত যৌবনের পরিচয় পেয়েছেন। যে সত্য এ সংসারের সীমা অতিক্রম করে অতীতে অনাগতে বিস্তৃত এবং যে মানবসত্তা মৃত্যু অতিক্রম করে মৃত্যুঞ্জয়, কবি সেই সত্য এবং চিরমানবের অস্তিত্ব আপন অন্তরে অনুভব করেছেন। মানবের প্রাণ সংসারের সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে আনন্দময়ের অভিসারী—

এ সংসারে সব সীমা
ছাড়ায়ে গেছে যে মহিমা
ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব
আছেন চির যে মানব
নিজেরে দেখি সে পথিকের পথে।

পত্রপুট-এর কবিতাগুলিও বিশ্বসৃষ্টির অপরিসীম রহস্য ও মানবসত্তার চিরন্তন মহিমা প্রকাশ করেছে। কোন কোন কবিতায় ক্ষুদ্র জাগতিক সুখ-দুঃখ কি মহিমান্বিত রূপ পরিগ্রহ করে তা অপূর্ব দার্শনিকতার সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ছয় সংখ্যক কবিতায় কবি আত্মাকে বহিরাবরণ-মুক্ত রূপে দেখতে চেয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে কবি প্রার্থনা জানাচ্ছেন তিনি যেন কবির আত্মোপলব্ধির পথে বাধাবিঘ্ন দূর করে দেন। এখানে কবি আপন সত্তাকে পথিকরূপে এবং পরমাত্মাকে অতিথিবৎসল-রূপে কল্পনা করেছেন।

মানুষ নানা উপকরণের দুর্গ গড়ে জীবনের এই পান্থশালাকেই সত্য জ্ঞান করে, কিন্তু এই রূপ তো মানুষের প্রকৃত রূপ নয়। মানুষ ভগবানের অংশ অনন্ত সত্তার অধিকারী—

আপনাকে চেনার সময় পায় নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায়;
পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারই সঙ্গে তার রূপের মিল।
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে
তার জীবনের সুখ দুঃখ আহুতি দাও,
জ্বলে উঠুক তেজের শিখায়,
ছাই হোক যা ছাই হবার।
.. ... .
হে অতিথি-বৎসল
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
সে পাক্ আপনাকে।

আট সংখ্যক কবিতায় কবি সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করেছেন। সৃষ্টির নগণ্য অংশও নিরর্থক নয়, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, তা গভীর ইঙ্গিতময়। একটি নাম-না-জানা ফুলের অস্তিত্বের মধ্যে কবি অনন্তকালের বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্যকে উপলব্ধি করেছেন,—

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে!
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।

তের সংখ্যক কবিতায় কবি আপন হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি কি পরিমাণ তাঁর কবিসত্তাকে রসসিক্ত করেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জীবনধারার সঙ্গে

কিরূপে সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাই ব্যক্ত করেছেন। এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে কবি 'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট' বলে আখ্যাত করেছেন। মনের এই সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিতে ধরা পড়েছে বস্তুর অতীত সত্তা এবং অশ্রুত গানের ছন্দ। কবি অনুভব করছেন জীবনের লীলা সাঙ্গ হয়ে আসছে তাই তাঁর আত্মার সেই সমস্ত দান যা অখণ্ড ঐক্যের প্রকাশক, তা কার হাতে সমর্পণ করবেন ?—

আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।

পনের-সংখ্যক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট কবিতা। পরম আনন্দময়—পরম প্রাণের সঙ্গে একাত্মতার অনুভব এই কবিতায় গভীরতা ও নিবিড় পুলকের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্টির অনন্ত রহস্য, মানবের অপরিমেয় রহস্য, নারীচেতনা, আলোকের বন্দনা এবং সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বজগৎব্যাপী বিরাজমান অখণ্ডতার একটি মনোজ্ঞ কাব্যিক বর্ণনা এই কবিতাটি। পূর্বযুগে 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী) কবিতায় কবি আপন চিত্তে সৃষ্টিরহস্যের যে প্রভাব ও একাত্মতা অনুভব করেছেন, জীবন গোধূলিতে তাই-ই অভিজ্ঞতা ও মনন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তিনি জাতিহীন, মন্ত্রহীন, ব্রাত্য। তিনি কোন বিধিনিষেধে আবদ্ধ নির্দিষ্ট দেবতার পূজা করেন নি। প্রতিদিন প্রভাতে আলোক-স্নানেই তিনি দেবতার আশীর্বাদ লাভ করেছেন। আপন অন্তরে সূর্যের তেজোময় রশ্মির স্পর্শ অনুভব করেছেন এবং সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আবিষ্কার করেছেন। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মানুষকে হারিয়ে তিনি বৃহতের মধ্যে মানুষকে পেয়েছেন। কারণ মানুষ অমৃতের অধিকারী। তমসের পরপারে তিনি মহান্ পুরুষকে দেখে ধন্য হয়েছেন। তিনি নারীর মধ্যেও শক্তির পরিচয় পেয়েছেন, যে শক্তিতে সৃষ্টির সমস্ত কদর্য ও অশুচি ধ্বংস হয়ে যায়। কবি আপন সত্তায় এ সমস্তেরই পরিচয় পেয়েছেন—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকলের মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

কবি জীবনে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করেন নি এবং বাল্যকাল থেকেই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত মহান্ জ্যোতির্ময় পুরুষের সঙ্গে আপন আত্মার অভিন্নতা অনুভব করেছেন। উপনিষদ্-এর ঋষির মত অন্ধকারের পরপারে মহান্ পুরুষের দর্শন পেয়েছেন—আনন্দ স্বরূপকে, অমৃত স্বরূপকে অনুভব করেছেন। এই অনুভূতির প্রকাশে উপনিষদ-এর শ্লোকের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষ সোঽহমস্মি॥

অর্থাৎ 'হে জগতের পোষক সূর্য, তোমার জ্যোতির্ময় মণ্ডলরূপ পাত্র দ্বারা সত্যস্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের মুখ আচ্ছাদিত রয়েছে। সত্যস্বরূপ তোমার উপসনার ফলে সত্যধর্মা আমার উপলব্ধির জন্য তুমি উক্ত আবরণ অপসারিত কর। হে জগতের সূর্য, হে একর্ষি, হে যম (সংযমনকর্তা), হে সূর্য, হে প্রজাপতি-তনয়, তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ সঙ্কুচিত কর, তোমার যে কল্যাণতম অতি শোভন রূপ তাই আমি দর্শন করছি; ঐ যে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ আমি তিনি।'[১]—

১. ঈশোপনিষদ্, ১৫-১৬

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

অর্থাৎ 'মন্ত্রদর্শী ঋষি বলেছেন অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ, মহান পুরুষকে আমি জানি। তাঁকে জেনেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; পরমপদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নেই'।[১]

শ্যামলী-র কোন কোন কবিতায় কবির আত্মোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 'আমি' কবিতায় কবি অনুভব করেছেন সৃষ্টির সর্বত্রই তাঁর আত্মা প্রসারিত। তাই সবই তাঁর সুন্দর বলে মনে হয়। তাঁর চেতনা সুন্দরকে সৃষ্টি করে। সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কবি-আত্মা বিধাতার ন্যায়ই ক্ষমতাসম্পন্ন। মানুষের নিত্য সত্তা—'নিত্য-আমি' অসীমের অংশ। সৃষ্টিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য মানবের আবির্ভাব। মানুষ না হলে বিধাতার এই বিশ্ব শিল্পকর্ম অর্থহীন হয়ে পড়ত। 'কবিত্বহীন বিধাতা একা বসে রইতেন, নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।' মানুষের প্রেমেই বিধাতা আপন মাধুর্য উপভোগ করেন।—

মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
... ...
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো—আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।

প্রাণের রস' কবিতায় কবি প্রকৃতির আনন্দের মধ্যে নিজ চেতনায় বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস অনুভব করেছেন। জীবনসায়াহ্নের অবকাশে কবি তাঁর প্রাণের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের যোগটিকে দ্বিধামুক্ত চিত্তে উপলব্ধি করতে চান।—

আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।

১. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৩-৮

'অকাল-ঘুম' কবিতায় অসমাপ্ত গৃহকর্মের অবকাশে ক্লান্ত নারীর নিদ্রিত মূর্তি কবির চোখে একটি অসামান্য রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। চিরপরিচিত নারী তার পরিচয়ের গণ্ডীর বাইরে অন্তরতম সত্তার প্রকাশে সমুজ্জ্বল। প্রতিদিনের সাংসারিক আবেষ্টনের মধ্যে অতি পরিচিতকেও আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারি না, কোন একটি শুভমুহূর্তে আমাদের চক্ষুর সামনে মানবের অতলস্পর্শ রহস্য ও মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং মানবের সত্যস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়—

ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্বাক্ রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি—
'কে তুমি।
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে'।

রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে প্রান্তিক-এর একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই সময় মৃত্যুর আলোকে জীবনের স্বরূপ কবি সম্যক্ রূপে দেখতে পান। মৃত্যুর আহ্বান কবিকে আত্ম-স্বরূপ আবিষ্কারে আরও আগ্রহী ও একাগ্র করে তুলেছে। সদ্য রোগমুক্ত কবির আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস প্রান্তিক কাব্যে গভীর-ভাবে ব্যক্ত। জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবই ক্ষণস্থায়ী; কেবল মানবের সত্তাই স্থায়ী, অসীম এবং চিরভাস্বর। কবি এই সত্যে আজীবন বিশ্বাস করেছেন তবু তার মধ্যে কিছু জিজ্ঞাসা সংশয় ইত্যাদি মিশ্রিত হয়েছিল। কিন্তু এখন কবি সংশয়লেশহীন, দ্বিধা দ্বন্দ্বহীন স্থির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। আত্মার পরিচয়েই সমগ্র মানুষের পরিচয়। এই আত্মা আবার ব্রহ্ম-স্বরূপ। মৃত্যুর সাহায্যেই মানুষ জীবনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আত্মার নিত্যরূপের পরিচয় পায়, সে অনুভব করে তার আত্মা বিশ্ব-প্রাণ প্রবাহের অংশ। এই চিন্তাধারায় উপনিষদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যদিও তা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কল্পনা, আবেগ এবং কাব্য-কলায় অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রান্তিক থেকে রবীন্দ্রকাব্য শেষ পর্যন্ত ঔপনিষদিক চেতনার পথে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ লুপ্তপ্রায় জীবন-চৈতন্যের অন্তরালে মৃত্যু-দূতের নিঃশব্দ আগমন অনুভব করেছেন। জীবন থেকে বিদায় নেবার সম্ভাবনা কবির চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে পারে নি। তন্দ্রাতুর আচ্ছন্নতা ভেদ করে কবির চিত্তে উদয় হয়েছে এক শুভ্র-চৈতন্যের। ক।ব বন্ধনমুক্ত আপনার পরিচয় পেয়েছেন—

বন্ধনমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

প্রান্তিক-এর অধিকাংশ কবিতাতেই আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক আত্মোপলব্ধি গভীর হয়েছে। কবি অসীম জ্যোতির্লোকের মধ্যে আপনাকে বিলীন করে যথার্থ মুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। ৮ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন বাহ্যিক বর্ণপ্রসাধনের আড়ম্বর নিরর্থক হয়ে গেছে, আপন সত্তার নিগূঢ় পূর্ণতার রূপ কবির চোখে ধরা পড়েছে।

৯ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায় জীবন-গোধূলির অবসন্ন চেতনার উপর একটি কৃষ্ণ তমিস্রার আবরণ নেমে এসেছে, কবি প্রার্থনা করেছেন সেই অরূপ অন্ধকারের পারস্থিত মহান্ জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করুন,—

হে পূষন, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

১০ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, মৃত্যুই চরম পরিণতি নয়। মৃত্যুর পশ্চাতে আছে এক চিরন্তন জ্যোতি। আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের ছায়াই সেই জ্যোতির উপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। সেই আলোকে সৃষ্টির সীমান্ত দর্শন করাই কবির আকাঙ্ক্ষা—

লব আমি চরমের কবিত্ব মর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান।
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি,
তাই ফিরাইয়া দিলে। আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অন্তরের অর্ঘ্যডালি—'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষমূল্য, শেষ যাত্রা শেষ নিমন্ত্রণ।

প্রান্তিক-এর আধ্যাত্মিক চেতনা সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থেও অনুভব করা যায়। মানবসত্তার প্রকৃতরূপ এবং সমগ্র সৃষ্টিধারার সঙ্গে সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে কবিতাগুলিতে।

'জন্মদিন' কবিতায় কবির জীবন-ব্যাখ্যা এবং অন্তরতম সত্তার সত্যরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মানবআত্মাকে কবি চিরযাত্রী রূপে অনুভব করেছেন। জীবন আত্মাকে সহস্র বন্ধনের মধ্যেও ধরে রাখতে পারে না; কারণ আত্মা চিরানন্দময়, অমৃতময়। তবু তিনি মাটির ঋণ অস্বীকার করেন না। কারণ এই মাটির অনিত্য খেলাঘরেই তাঁর চিরন্তন নিত্য সত্তার উপলব্ধি হয়েছে—

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি
উদয় শিখরে তার দেখো আদি জ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা।· ·

... ...

তবু জেনো অবজ্ঞা করি নি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান।

'পত্রোত্তর'-এ কবি নিখিল প্রাণের অন্তবিহীন যাত্রার কথা বলেছেন। তিনিও এই যাত্রায় যোগ দিয়ে, মৃত্যুর দ্বার দিয়ে অমৃতলোকে মুক্তি পাবেন—

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা;
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে;

নবজাতক কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা সংশয়ে, বিশ্বাসে এবং প্রশ্নে একটি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে। 'কেন' এবং 'প্রশ্ন' কবিতা দুটিতে বিশ্ব-জিজ্ঞাসা সংহত হয়েছে। এই দুটি কবিতার বক্তব্যে নূতনত্ব নয়,—নূতনত্ব হল উপস্থাপন-রীতিতে। 'কেন' কবিতাটিতে প্রথমে কবি বিধাতা আপন সৃষ্টির পরে যে নির্মম অন্যায় করেন তার কথা বলেছেন। মহাকাল সঞ্চয়ে ও অপচয়ে সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রবাহ রক্ষা করেন। তাঁর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা হল মানবচেতনার মধ্যে যে দ্বৈধতা আছে সে সম্পর্কে,—

মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূত খেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু কেন।

তাঁর তৃতীয় জিজ্ঞাসা হল মানবসত্তার সত্যমূল্য-সম্পর্কিত। কবি অনুভব করেছেন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর কন্দর থেকে প্রাণ সৃষ্টির আরম্ভ বীজ সংগ্রহ করে যাত্রা শুরু করে এবং নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি সেই প্রাণের অধিকারী হয়েছেন। আবার কি সেই প্রাণ অনির্দেশের পথে যাত্রা শুরু করবে। —

প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে ?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজ-শেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন ?
কিন্তু কেন।

'প্রশ্ন' কবিতাতেও খানিকটা একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এই যে গ্রহ-নক্ষত্রের আকাশপথে অন্তহীন যাত্রা সে কাকে কেন্দ্র করে এবং মানুষের অন্তর-সত্তা যাকে কবি 'আমি' নামে অখ্যাত করেছেন তার উদ্ভবই বা কি করে হল। এই আমি-র সৃষ্টি যেমন অজ্ঞাত তেমনি তার পরিণামও অজ্ঞাত। কোন্ অদৃশ্যে এই আমি লয়প্রাপ্ত হবে। কবি অনুভব করেছেন যে শক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করছে তাঁর সত্তাও তাঁরই দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধির গভীরতম প্রকাশ দেখা যায় তাঁর শেষ চারখানি কাব্যে—রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে ও শেষলেখা-য়। অনাসক্ত দৃষ্টির দর্পণে ধরা পড়ল পরম জ্যোতির্ময় বিরাট পুরুষের অস্তিত্ব যিনি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণুতেও বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত ভাষণে এবং বিরল অলংকারে রচিত এই কাব্যগুলিতে ঋষিবাক্যের মন্ত্রবৎ সংহতি লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ-এর মন্ত্রের ন্যায় কবিতাগুলি গভীর অর্থ-প্রকাশক। প্রাচীন ঋষির বাণীর ন্যায় এই শেষ চারখানি কাব্যে আত্মার অখণ্ডতা এবং সত্য-স্বরূপের উপলব্ধি ঘটেছে কবির। এখানকার তেজোদৃপ্ত বিরলভাষণের স্থানে স্থানে

দেখা গেছে 'অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস'। তবু দৈহিক অসুস্থতাই এই কাব্যগুলির মূল কথা নয়। অসুস্থতার মধ্য দিয়েই তিমিরাবরণ ভেদ করে সত্য দৃষ্টিকে ফিরে পেয়েছেন এবং নবপ্রেরণা ও চৈতন্যের অধিকারী হয়েছেন। রোগশয্যায় কাব্যের ৫ সংখ্যক কবিতায় কবি তীব্র দৈহিক যন্ত্রণার কথা বলেছেন এবং মানবাত্মার অপরাজেয় শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন—

মানবের দুর্জয় চেতনা.
দেহ-দুঃখ হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা···

রোগ, মৃত্যুকে অতিক্রম করেই মানব-চেতনার জয়যাত্রা। ২০ সংখ্যক কবিতায় কবির মানবসত্তার অমরত্ব সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। মনের মধ্যে রাশিকৃত মোহের আবরণ দূরীভূত করে 'আদি-জ্যোতি'-স্বরূপ প্রকাশ করে মানবসত্তার কাছে। তখনই মানবসত্তা বৃহতের জ্ঞান লাভ করে—

রোগ দুঃখ রজনীর নিরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোক-বিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি,
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ।
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান;
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর তীর্থপথে।

এই আদিজ্যোতির ধ্যান রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবী বিমুখ করে নি। গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি পৃথিবীকে পুনর্বার গ্রহণ করেছেন। সদ্য রোগমুক্ত কবি নিখিল বিশ্বের প্রাণের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে আনন্দিত হয়েছেন,—

খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত ;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী,
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;

—রোগশয্যায়, ২৭ সংখ্যক কবিতা

আপন প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায় বদ্ধ যে চৈতন্য, কবি সেই চৈতন্যকেই সমগ্র বিশ্বনিখিলে পরিব্যাপ্ত অনুভব করেছেন। রোগশয্যায়-এর আঠাশ সংখ্যক কবিতায় কবি সেই অখণ্ড চৈতন্যের কথা ব্যক্ত করেছেন—

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তর গগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়,
আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে—
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তারা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।

আরোগ্য কাব্যগ্রন্থ সদ্য রোগমুক্ত কবির এক আশ্চর্য মানস-উদ্ঘাটন। রোগের উত্তাপ এবং উত্তেজনা এখানে প্রশমিত। অপূর্ব প্রশান্তির সঙ্গে বিশ্ব-চরাচরের প্রতি এক নম্র মধুর ভালবাসা ও উপলব্ধির কাব্য আরোগ্য। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কবি সৌন্দর্য ও সত্যের আনন্দ রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর

এই ভাললাগার কাব্যরূপ বৈদিক ঋষির মন্ত্রকাব্যের মতই উপলব্ধির গভীরতায় অনন্য। এক সংখ্যক কবিতাটিতেই এই মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

সমগ্র প্রকৃতি, বিধাতার অফুরন্ত দান এবং সর্বোপরি মানব-প্রেম কবির চেতনাকে ঘনীভূত করেছে। তিনি অমৃতের উৎস-স্রোতের সন্ধান পেয়েছেন এবং এর ফলেই তাঁর চিত্ত বহিরাবরণ থেকে মুক্ত হয়েছে।—

মুক্ত বাতায়ন প্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।

—আরোগ্য, ৫ সংখ্যক কবিতা

শরীর বলহীন, মন সংশয়াছান্ন হয়ে আসে, কিন্তু এ সংশয় দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়। কবি প্রসন্ন আলোকে আপনার জীর্ণ দেহদুর্গশিখরে দুঃখবিজয়ীর মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনের প্রান্তে বসে তিনি দিনান্তের শেষযাত্রার লগ্নে পূর্ণতার ইঙ্গিত পেয়েছেন। কোন কোন কবিতায় তিনি একেবারে সৃষ্টিরহস্যের গভীরে প্রবেশ করেছেন। ৯ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—অনাদি অদৃশ্য থেকে সৃষ্টির বিরাট ক্ষেত্রে আতশবাজীর ন্যায় অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্রের খেলা। কবিও যেন একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকণারূপে দেশ-কালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন সৃষ্টির কেন্দ্রে নটরাজ একাকী চির-রহস্যময়, চিরমৌনী। তিনিই সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করছেন—

দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা—দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক' উপনিষদের-এর এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের মনে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল পূর্বোক্ত কবিতার মূল ভাবটি থেকে তা বোঝা যায়।

দিনরাত্রির আবর্তনের ধারায় কবি জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। দিন যেমন অন্ধকার সাগর-সঙ্গমে আপন সত্য লাভ করতে আপনার অস্তিত্বকে বিসর্জন দেয়, তেমনি মানবও জীবন-পরিক্রমা-শেষে সায়াহ্নে মৃত্যু-অন্ধকারে আপন স্বরূপকে খুঁজে পায়। ৩০ সংখ্যক কবিতায় কবি বাহ্য পরিচয়ের অন্তরালে সত্য লাভের কথাই ব্যক্ত করেছেন। এই সত্য মানবজীবন ও প্রকৃতিতে সমভাবেই বর্তমান। এখানে তিনি এক সর্বব্যাপী অখণ্ড সত্যের কথাই বলেছেন। আরোগ্য-এর অনেক কবিতার সঙ্গে ভারতীয় কাব্য ও সাধনার যোগ সুস্পষ্ট। তাঁর অমৃতত্বের ধারণা উপনিষদ-এর 'এক'-এর সাধনার অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথও 'আদি জ্যোতি' এবং 'পরম-আমি'র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ৩২ সংখ্যক কবিতার উল্লেখ করা যায়—

> এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
> চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
> আমার হয়েছে অভিষেক,
> ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
> জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী
> পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
> বিচিত্র জগতে
> প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে ॥

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যে অনেক প্রার্থনাব্যঞ্জক কবিতা দেখা যায়। অধিকাংশ কবিতাতেই এই মর্ত্যজীবন-অন্তে কবি জীবনের সত্য অর্থ উপলব্ধি করার জন্য আর্তি প্রকাশ করেছেন। যা কিছু মিথ্যা মোহ দূরীভূত হোক এবং চৈতন্য সত্যের সহজ আনন্দের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করুক।—

> এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
> চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
> ভেদ করি কুহেলিকা
> সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।

এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে ॥

—আরোগ্য, ৩৩ সংখ্যক কবিতা

অন্তিম কাব্যগুলিতে কবি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অনুসন্ধানে উৎসুক হয়েছেন। জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে ঘিরে আছে মৃত্যুর 'মহাদূরত্ব' এবং 'অব্যক্তের বিরাট প্লাবন'। মৃত্যুর ছায়ায় বসে জন্মদিনকে তিনি অজ্ঞেয় রহস্যে আবৃত অনুভব করেছেন, তেমনি নিজ অন্তরাত্মায়ও সেই রহস্য উপলব্ধি করেছেন যার সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায় না।—

আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।

—জন্মদিনে, ১ সংখ্যক কবিতা

এই জীবনেই কবির অসীমানুভূতি হয়েছে কিন্তু পরম রূপ ও পরমার্থকে এখনও লাভ করতে পারেন নি। প্রতিদিন সূর্যোদয়-মুহূর্তে তিনি যেন নিজেকে নূতনভাবে আবিষ্কার করেন। একথা তিনি নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন।—

এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
... ...
শুধু করি অনুভব,
চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে ॥

—জন্মদিনে, ২ সংখ্যক কবিতা

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল একটি একাত্মতার বন্ধন। বিশ্ব-প্রকৃতির বিবর্তনের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ নিজ আত্মায়ও বিবর্তন অনুভব করেছেন। এই বিবর্তন তাঁর অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা পরম 'এক'-এর ইচ্ছাকেই অনুভব করেছেন।—

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।

কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।

—জন্মদিনে, ৯ সংখ্যক কবিতা

জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের উপলব্ধি স্থানে স্থানে উপনিষদ্-এর ঋষিগণের উপলব্ধিকে ছুঁয়ে গেছে। তমসের পরপারে মহান্ পুরুষের অস্তিত্বের অনুভব রবীন্দ্র-চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে তিনি একাত্মতা বোধ করেছেন। এই বোধই তাঁর জীবনকে মৃত্যুর অতীত মূল্য দিয়েছে। শেষ পর্বের কবিতায় সমগ্র বিশ্বচরাচরের সঙ্গে এবং চরম সত্যের সঙ্গে তাঁর ঐক্যের কথা নানা স্থানে আভাসিত হয়েছে।—

স্বষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।

—জন্মদিনে, ১৩ সংখ্যক কবিতা

এই একাত্মতা-বোধই তাঁর আপন আত্মাকে মৃত্যুর-অতীত কল্পনা করতে সাহায্য করেছে। অনাদি জ্যোতির স্পর্শ তাঁর জীবনের গ্লানিমার আবরণকে মুক্ত করেছে। সবিতার দিব্য আবির্ভাব তাঁকে অমরতার আশ্বাস দান করেছে। জন্মদিনে-র ২৩ সংখ্যক কবিতায় তাঁর এই উপলব্ধিরই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের যে শান্তি-উৎস-ধারা, তাই কবির দেশ-কালে ধৃত প্রাত্যহিকের আবরণযুক্ত সত্তাকে উৎসাহ দান করে, জীবনকে মহিমা দেয়।—

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি—
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে॥

—জন্মদিনে, ২৫ সংখ্যক কবিতা

শেষ লেখা-য় 'মহা-অজানার বেদীতটে' রবীন্দ্রনাথের অন্তিম প্রণতি। তিনি অনুভব করেছেন, 'এ জগৎ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়'—সত্য। তাই মৃত্যু রাহুর মত জীবনকে গ্রাস করলেও জীবনের স্বর্গীয় অমৃতকে নষ্ট করতে পারে না।—

বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই।
পরম আমির সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

—শেষলেখা, ২ সংখ্যক কবিতা

রবীন্দ্রনাথ আজীবন যে আত্ম-রহস্য এবং 'আমি'র রহস্য ভেদ করতে চেয়েছেন, অন্তিম কাব্যে সে সম্বন্ধে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। শেষলেখা-র ১০ সংখ্যক কবিতায় কবি স্বল্প কথায় ও সংহত প্রয়াসে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাই তাঁর চরমতম এবং পরমতম উপলব্ধি।—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল;
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর॥

অথবা, ১১ সংখ্যক কবিতা—

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের সত্যদ্রষ্টা, আসক্তিহীন বিবাগী কবিচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন ও জগৎকে তিনি অস্বীকার করেন নি বরং জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিকে স্বীকার করে তাঁর কাব্যকে বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতায় গাম্ভীর্য দান করেছেন। তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, তাই কোন প্রবঞ্চনাতেই তিনি ভীত নন। শেষ পুরস্কার-স্বরূপ তিনি লাভ করেছেন শান্তির অক্ষয় অধিকার। এইখানেই তাঁর সঙ্গে ভারতীয় সাধনার মিল। দুঃখকে অস্বীকার করে নয়, দুঃখকে জীবনে স্বীকার করেই তিনি হয়েছেন দুঃখজয়ী।

শেষ পর্বের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন অধিকতর প্রকাশিত হয়েছে এবং এই দর্শনের মধ্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথের অখণ্ডতার আদর্শ, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আপন আত্মার আত্মীয়তা এবং ভারতীয় সাধনার উত্তরাধিকার দেখতে পাই।

৩. মধুমন্ত্র

শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্-এর ঋষিগণের ন্যায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে একটি আনন্দময় সত্তা বিরাজমান, একথা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" আনন্দ থেকেই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট। বৈদিক কবিগণের অনুরূপ পন্থাতেই রবীন্দ্রনাথের সত্যদর্শন হয়েছে। তাই তাঁর প্রকাশভঙ্গীতেও বৈদিক কবিগণের সঙ্গে অনুরূপতা দৃষ্ট হয়। মধুময়, অমৃতময় পরম সুন্দর ব্রহ্মের প্রকাশ এই

জগৎ। তাই তাঁর সৃষ্টিও মধুময়, আনন্দময়। ঋষিগণ এই আনন্দময় সত্তাকে জানতে চেয়েছেন এবং নিজ জীবনে সেই সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছেন। তাই ঋষিগণের প্রার্থনা—

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্।
বাচা বদামি মধুবদ্ ভূয়াসং মধুসন্দৃশঃ ॥
মধোরস্মি মধুতরো মদুধান্ মধুমত্তরঃ।
মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীব ॥

অর্থাৎ—আমার ইহজীবন মধুযুক্ত হোক্, আমার পরলোক মধুময় হোক্, বাক্যের দ্বারা যা বলি তা মধুময় হোক্। এইরূপে সর্ববিষয়ে মধুময় হওয়ায় মধুময় কার্যযুক্ত আমি সকল দর্শকের কাছে মধুময় হই।[১]

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উপনিষদ মধুমন্ত্রের প্রবর্তন করেন এবং ব্যাখ্যা করেন। উপনিষদ্-এ বলা হয়েছে—"ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতনাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥" অর্থাৎ এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু, সমস্ত ভূতও এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময় প্রকাশময় ও চিন্মাত্র নিত্যপুরুষ এবং যিনি অধ্যাত্ম শরীর সম্বন্ধযুক্ত চিন্মাত্র প্রকাশময় পুরুষ—সেই পুরুষই সকল ভূতের মধু—তিনিই আত্মা—তিনিই সর্বময় ব্রহ্ম।[২]

মধুমন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষিরা সর্বচরাচরে সর্বভূতে মধুময় ব্রহ্মের উপস্থিতি অনুভব করেছেন। তাই তাঁরা নানা স্থানে তাঁদের সেই উপলব্ধির কথা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন—"তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্, মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীভূর্ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়ান্মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ স্বঃ স্বাহেতি।..."—অর্থাৎ সেই সবিতার বরণীয়, বায়ুসমূহ ঋতকামীর জন্য মধুক্ষরণ করে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করে, ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুমান হোক্। 'ভূ'র উদ্দেশে স্বাহা। দেবতার ভর্গকে ধ্যান করি। রাত্রি ও দিনসকল

১. অথর্ব বেদ, ১।৩৪।৩-৪
২. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৫।১

মধুমান হোক ; পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডল এবং আমাদের পিতা দ্যৌ মধুমান্ হোক। ভুবের উদ্দেশে স্বাহা অর্থাৎ যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে প্রেরণা দান করেন। বনস্পতি আমাদের নিকট মধুমান হোক, সূর্য মধুম্যান্ হোক এবং গো-সমূহ মধুমান্ হোক। 'স্বঃ'র উদ্দেশে স্বাহা।[১]

এই প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাব্য-রচনার প্রথম যুগ থেকেই তিনি এই জগৎব্যাপী মধু উপলব্ধি করেছেন। তাঁর উন্মেষ-যুগের কাব্য প্রভাত-সঙ্গীত-এর মধ্যেও এই অনুভব লক্ষ্য করা যায়।—

পূরবমেঘ মুখে পড়েছে রবিরেখা,
অরুণ রথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব—
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।

—প্রভাত সংগীত, 'প্রভাত-উৎসব'

এই অনিত্য পৃথিবীর প্রতি গভীর মমতা এবং পৃথিবীর নগণ্য ধূলিকণাতেও অসীমের উপলব্ধির কথা তিনি তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে বারংবার বলেছেন। পত্রপুট-এর 'পাঁচ' সংখ্যক কবিতায় কবি যখন অর্ধ-উদাসীন দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব-জগৎকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তখনও তিনি বলেছেন—

বেদমন্ত্রের ছন্দে আবার মন বললে—
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।

মৃত্যু-রাত্রির বিভীষিকাকে অতিক্রম করে প্রভাতের প্রসন্ন আলোয় আকাশ-বাতাসের মধুময় সৃষ্টি ধরা পড়েছে কবির দৃষ্টিতে আরোগ্য কাব্যগ্রন্থে। তিনি যথার্থ ঋষিদের ন্যায়ই দৃষ্টি লাভ করেছেন। সমগ্র পৃথিবী তাঁর কাছে সুন্দর রূপে, আনন্দ রূপে, অভিব্যক্ত হয়েছে।—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।

—আরোগ্য, ১ সংখ্যক কবিতা

১. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৬।৩।৬

প্রতি প্রভাতের আলোয় ধরণীর বক্ষে অসংখ্য রসমূর্তি কবির বিস্ময়-বিমুগ্ধ মনের কাছে ধরা দেয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায় জীবন ও সংসার হয়ে ওঠে মধুময়।—

সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

—আরোগ্য, ২ সংখ্যক কবিতা

পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু ও প্রাচীন ঋষিগণের শ্রদ্ধার বিষয় হয়েছে, সমগ্র বিশ্ব-চরাচরকে ঋষিগণ প্রণাম জানিয়েছেন—

নমো মহদেভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো
নমো যুবভ্যো নমো আশিনেভ্যঃ
যজান দেবান্ যদি শক্নবাম
মা জ্যায়সঃ শংসমাবৃক্ষি দেবাঃ ॥

অর্থাৎ—'মহৎকে নমস্কার, অর্ভককে (শিশু) নমস্কার, যুবকগণকে নমস্কার, বৃদ্ধগণকে নমস্কার। যদি সাধ্য হয়, দেবগণের অর্চনা করবো; হে দেবগণ বৃদ্ধদের স্তুতি যেন ত্যাগ না করি।'[১] ঋষিগণ জগতের সর্বত্রই ব্রহ্মের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই পৃথিবীর সমগ্র বস্তুকেই তাঁর প্রণাম ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। সূর্যের রশ্মিজালের মধ্যে যে ব্রহ্মস্বরূপ আপন আত্মার প্রতিফলন দেখেছিলেন কবি, তাকেও প্রণাম জানিয়েছেন—

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি
তারে নমো নম।

—পূরবী, 'সাবিত্রী'

জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় মাতৃরূপিণী পৃথিবীকে তিনি প্রণাম জানিয়েছেন। যে পৃথিবী 'ললিত' এবং 'কঠোর' দুই বিপরীত গুণের সংমিশ্রণে বৈচিত্র্যময়—

হে উদাসীন পৃথিবী
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

—পত্রপুট, ৩ সংখ্যক কবিতা

১. ঋগ্বেদ, ১।২৭।১৩

কবি জীবনের অস্ত-মহাসাগরতট থেকে জীবনের প্রথম উন্মেষস্থান উদয়গিরিকে প্রণাম জানিয়েছেন। পৃথিবীতে নানা সুখ-দুঃখের মাঝেই এই ক্ষণিক জীবনে তিনি সুধার সন্ধান পেয়েছেন।—

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয়গিরি শিখর পানে
অস্ত মহাসাগর তট হতে—
নবজীবন যাত্রাকালে
সেখান হতে লেগেছে ভালে
আশিষখানি অরুণ আলো স্রোতে।
. . . .
রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখদুখের খেলা,
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম;
অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা—
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

—বীথিকা, 'প্রণতি'

রবীন্দ্রনাথ মানবাত্মার চিরন্তনতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাছে জীবনের শত উত্থান-পতনেও মানব চিরবিজয়ী। কবি সেই মানবকেও প্রণাম জানিয়েছেন—

দলে দলে যাঁরা
উত্তীর্ণ হন নি লক্ষ্য, তৃষানিদারুণ
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে—
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত-আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার।

—জন্মদিনে, ১৭ সংখ্যক কবিতা

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মহৎ এবং বৃহৎকে উপলব্ধি রবীন্দ্র-কবি মানসের একটি প্রবণতা। প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুতে এবং দৈনন্দিন মানবের মধ্যেও তিনি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তাই জীবনে তিনি যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, যা উপলব্ধি করেছেন, সব কিছুতেই তিনি মধুর সন্ধান পেয়েছেন এবং এই কারণেই সমগ্র চরাচরে প্রতিটি বস্তুই তাঁর প্রণম্য। তিনি প্রকৃতই মধুমন্ত্রের উপাসক।

৪ অখণ্ড মানবতার উপলব্ধি

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যে দার্শনিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মানবানুরাগের মধ্যে। বিদায় বেলায় তিনি জনসাধারণের বন্দনা করেছেন এবং তিনি চিরকালের মানুষ, সাধারণ মানুষকে অনুভবের চেষ্টা করেছেন। যতই দিন অতিবাহিত হয়েছে ততই আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর আধ্যাত্মিকতার সমান্তরালে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে নিখিল মানবকে অবলম্বন করে তাঁর মানবতাবোধ। এই শেষ পর্যায়ের মানবতাবোধ কবি-মনে নিহিত আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তৎকালীন পরিবেশের প্রভাবে তা বাস্তবজীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বিদগ্ধ জনের মতে—"মানুষের সমগ্র ইতিহাস—সেই সমগ্র ইতিহাস জোড়া যে অখণ্ড মানুষ তাহা আর কবিচিত্তে একটা অমূর্ত ভাবমাত্রে পর্যবসিত রহিল না, নিত্যকালের বিশ্বমানবও সত্যকারের ইতিহাসবোধের ভিতর দিয়া মূর্তিলাভ করিল"।[১]

রবীন্দ্রনাথের এই মানবতাবোধ তাঁর সমগ্র জীবনের অনুভূতি ও বিশ্বাস কার্যকর। কোথাও তিনি ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়ে বৃহতের, আবার কোথাও বা বৃহতের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেই তিনি মহামানবের আহ্বান শুনেছেন। 'প্রভাত-সঙ্গীত-এর—মধ্যে 'জগৎ ব্যাপিয়া শোন রে সবাই ডাকিতেছে আয় আয়'—প্রথম যুগের কাব্যের এই আহ্বান শেষের যুগের কাব্যের মধ্যেও দেখি মানবের ভিতর দিয়ে একের চরণে প্রণাম নিবেদনের মধ্যে—

নিখিলের অনুভূতি
সংগীত-সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।

১. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস (১৩৬৮), পৃ.।

এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

—পরিশেষ, 'প্রণাম'

পরিশেষ-এর 'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে যেখানে যাত্রার শেষে জীবনে মৃত্যুর ছায়া গাঢ়তর হয়েছে সেখানে কবি মানবজীবনের মহিমাকে স্বীকার করেছেন। যুগ-যুগান্তরে প্রসারিত যে জীবনধারা, সেই জীবনধারার সঙ্গে নিজ জীবনকে সর্বতোভাবে যুক্ত করে কবি অমরতার উপলব্ধি করেছেন।—

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে অমৃতধারা উৎসারিল যুগে-যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।

মানবকে কবি অখণ্ড সত্যের অংশরূপে দেখেছেন। অসম্পূর্ণ যে দেশকালে বদ্ধ মানুষ, তার মধ্যেও ন্যায়, সত্য এবং সৌন্দর্যে চিরমানবের প্রকাশ সম্ভব। মানবের মধ্যে তিনি অনন্ত সম্ভাবনাকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বরকে মানবের মধ্যে অনুভব করার ইচ্ছায় পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতায় ঈশ্বরপুত্র খ্রীষ্টের নাম দিলেন মানবপুত্র। মৃত্যুর পাত্রে খ্রীষ্ট উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণ রবাহূত অনাহূত মানুষের জন্য। কিন্তু কবি কাতরভাবে অনুভব করেছেন খ্রীষ্টের মৃত্যু আজও শেষ হয় নি কারণ মানুষের অশুভ বুদ্ধির অবসান আজও হয় নি। কিন্তু এই যে খণ্ডতায় বদ্ধ মানুষ, এটাই তার আসল পরিচয় নয়। সকল মানুষই অখণ্ড সত্যের অংশ ; উপলব্ধির অসম্পূর্ণতায় আবির্ভূত হয় ভেদবুদ্ধি। মানবের অন্তরস্থিত নিত্যমানবকে কবি অনুভব করেছেন স্থান-কালের উর্ধ্বে চিরমুক্ত, চিরস্বাধীনরূপে। পুনশ্চ-র 'শিশুতীর্থ' কবিতাটিতে কবি মানবের চরম সার্থকতা লাভের চিরকালীন অভিযানের কথা বলেছেন। বিশ্বসৃষ্টির সমগ্রতার ধারার মধ্যে মহামানবের সমগ্রতাকে দর্শন করেছেন। পশুশক্তির দম্ভ, ঐশ্বর্য, বিলাস ইত্যাদিকে পরাজিত করে মানবের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে মহাপুরুষের অমৃতময় বাণী—

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
ঊষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে:
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
সকলে জানু পেতে বসল রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়;
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে: জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

মানবজীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যেই ঘটে দেবতার আবির্ভাব। তাই কোনো মুহূর্তে সীমার বাঁধন যায় ঘুচে, সত্তায় ফুটে ওঠে নিবিড় আনন্দময় রূপ; প্রত্যহের ধূলি-আবরণ অপসারিত হয়ে নিখিল বিশ্বে প্রতিভাত হয় এক স্বর্গীয় রূপ—

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়।

দেবতা বাহিরি আসে অমৃত আলোতে,
তখন তাহার পরিচয়
মর্ত্যলোকে অমর্ত্যেরে করি তোলে অক্ষুণ্ণ অক্ষয়।

—বীথিকা, 'দেবতা'

বীথিকা-র 'নবপরিচয়' নামে আর একটি কবিতাতে কবি মানবজীবনের আর একটি রূপকে তুলে ধরেছেন। নব নব জন্মের মধ্য দিয়ে খেয়াতরীতে যে 'আমি' এই জগতে বার বার আসা-যাওয়া করে কবি তারই স্বরূপ সন্ধান করেছেন। মানবজীবন অন্তরের অংশ। চিরপথিক মানবাত্মা জীবনমৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে অতীতে ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত। এই চিরমুক্ত চিরস্বাধীন আত্মাকে কবি নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন—

সংসারের ঢেউখেলা
সহজে করি অবহেলা
রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে,
মুক্ত রাখে পাখাটারে,
ঊর্ধ্বশিরে পড়িছে আলো এসে।

বীথিকা-র 'জয়ী' কবিতাটির মধ্যেও মৃত্যু, ধ্বংস, বিপর্যয় ইত্যাদির মধ্যে যুগ যুগ আবর্তিত মানবের চিরন্তন বাণীর জয় ঘোষণা করেছেন—

আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা,—
তরঙ্গ তাণ্ডবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা,
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবিচিত্তের স্বরূপ ও গূঢ় রহস্যের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মানববন্দনা। বাইরের মানুষের সঙ্গে কর্মের যোগে যুক্ত হতে চেয়েছেন কবি এবং সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগকে মিলিয়ে নেবার প্রয়াস দেখা যায় পত্রপুট-এর 'পনের' সংখ্যক কবিতায়। কবি নিজেকে 'ব্রাত্য', 'মন্ত্রহীন' বলেছেন। কোনো নির্দিষ্ট দেবতা তাঁর পূজ্য নন। সমগ্র পৃথিবীতে তিনি মনের মানুষের সন্ধান করেছেন। প্রতি প্রভাতের আলোর মন্ত্রে দীক্ষায় তাঁর পূজা সাঙ্গ হয়েছে। তাই জীবনপথে সঙ্গী কেউ ছিল না তাঁর। তাঁর সঙ্গী ইতিহাসের বীর, তপস্বী, মৃত্যুঞ্জয়, সত্যসন্ধানী এবং অমৃতের উপাসক। মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েও দেশ-বিদেশের সীমানার পারে তাকে পেয়েছেন, তমসের পরপার থেকে মহান্ পুরুষকে দেখে ধন্য হয়েছেন।—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ—
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

কবি অনুভব করেছেন মানুষ অমৃতের অধিকারী। অমৃতত্বের ধারণার সঙ্গে কবির মানবতার ধারণা ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত। আরোগ্য-এর শেষ দুটি কবিতায় এই ধারণার সমর্থন মিলবে।—

এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

—আরোগ্য, ৩২ সংখ্যক কবিতা

সর্বমানবের সঙ্গে তিনি আনন্দের যোগে যুক্ত। চরম আত্মোপলব্ধির জন্য কবির প্রার্থনা ৩৩ সংখ্যক কবিতায়—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত।

রবীন্দ্রনাথের মানবতা বিশ্বজীবনের সঙ্গে মিলিত হবার প্রয়াসে সার্থক হয়ে উঠেছে। বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মানব অমরতা লাভ করে এই ছিল তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস।—

খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম,
দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি
মূল্য যার মৃত্যুর অতীত।

—জন্মদিনে, ১৩ সংখ্যক কবিতা

অমরতা রবীন্দ্রনাথের কাছে বোধ ও বুদ্ধিজাত কোন ধারণা নয়। এটা কবির মনে বহু-লালিত একটি বিশ্বাস মাত্র। তিনি ধ্যানদৃষ্টিতে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরে মহামানবের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। অপরাজিত মানবের জয়যাত্রা অন্তহীন—

ঐ মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে॥
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

—শেষলেখা, ৬ সংখ্যক কবিতা

সপ্তম অধ্যায়

শেষ পর্যায়ের কবিতার রূপকল্প ও বাণীবিন্যাস

শেষ পর্যায়ের কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এর রচনাভঙ্গী। ছন্দ, অলংকার, ভাষারীতি, চিত্রকল্প ইত্যাদি সমস্ত দিক দিয়েই শেষ পর্যায়ের কাব্য বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে। এই সময়ের কাব্যের অবয়ব-সংস্থানে একটা দৃঢ় সংহতি লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব পূর্ব পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরূপে অসীম প্রাণ-প্রাচুর্য ও আবেগের শতধারা প্রস্রবণে শিল্পিমনের অদম্য ভাবোচ্ছ্বাস সীমার বাঁধনকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যলোকে উধাও হয়েছে। সেই প্রবল উচ্ছ্বাস এই পর্বের কাব্যে অনুপস্থিত। সম্পূর্ণ কথ্য ভাষার ভঙ্গী বজায় রেখে কবি অতি গভীর ভাবকে সহজভাবে প্রকাশ করেছেন; প্রকাশভঙ্গীর চেয়ে বক্তব্য বিষয়ই এখানে মুখ্য হয়েছে। উপমা প্রয়োগে বিশিষ্টতা, ছন্দের গদ্যভঙ্গী, অলংকার-বর্জিত তীব্র সংবেদনশীল ভাষা ইত্যাদি এই পর্যায়ের কাব্যগুলির আঙ্গিক বিচারে লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যকলার আলোচনায় একটি বিষয় আমাদের বিস্মিত করে, তা' হল তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিলম্বিত আবির্ভাব এবং জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তার বিস্তার। রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী বিদেশী কবি, বিশেষ করে রোমান্টিক কবিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাঁরা অতি অল্প বয়সেই কবিজীবনের শীর্ষ স্পর্শ করেছেন। এই প্রসঙ্গে Shelley বা Keats-এর নাম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে চরম পর্যায়ের শিল্পকীর্তির নিদর্শন যেমন বিলম্বিত, তেমনি আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল তাঁর কাব্য-জীবনের সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব। একটি বিস্ময়কর ব্যাপার যা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন কবির ক্ষেত্রে হয় নি তা হল তাঁর পরিপূর্ণ বার্ধক্যের, অর্থাৎ ষাট থেকে আশি বছরের মধ্যে যে কাব্যশিল্পের বৈচিত্র্য তা তাঁর যৌবনের সৃষ্টিকেও ম্লান করে দিয়েছে। লিপিকা ও পূরবী-তে যে নতুন প্রকাশরীতির সূচনা হয়েছে তার চরম উৎকর্ষ দেখা যায় কবির প্রায় আশি বছর বয়সে রচিত সানাই কাব্যে। বার্ধক্যে রবীন্দ্রনাথের এই কবিত্বশক্তির জাগরণ আকস্মিক নয় বা আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত কোন উপলব্ধির দ্বারা কোন অভূতপূর্ব সৃষ্টি নয়। পরিপূর্ণ বার্ধক্যের মননজাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির চির-তরুণ হৃদয়ের মিলনেই সৃষ্ট এই কাব্যপ্রবাহ।

এখন শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির বহিরঙ্গ-সজ্জার কিছু পরিচয় নেওয়া যাক্। একটা কথা মনে রাখা উচিত, কাব্যের বহিরঙ্গের গঠনও কবির তৎকালীন মানস-প্রবণতা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। কবি যে ভাব-পরিমণ্ডলে বাস করেন তদনুযায়ীই গড়ে ওঠে কাব্যের সাজসজ্জা। কবির যে কোন পর্যায়ের কাব্য আলোচনা করলেই এই কথার যাথার্থতা উপলব্ধি হবে।

রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের কাব্যে রূপকল্প সর্বত্রই অভিনব। এই সময়ের কাব্যরূপ সচেতন এবং কবিকর্ম রূপদক্ষ। এই যুগের কাব্যগুলিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. গদ্য-কবিতা, ২. অন্যান্য কবিতা। প্রতিভার ধর্ম চির-চাঞ্চল্য ও চির-অতৃপ্তি। রবীন্দ্র-প্রতিভা জীবনের শেষ দিন পযন্ত আশ্চর্যভাবে প্রাণবন্ত, গতিশীল ও নিত্য-আধুনিক।

এক

গদ্য কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বহুদিন পূর্ব থেকেই কবি ছন্দের প্রচলিত রূপকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন। মানসী-র যুগেই তিনি পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডী ভাঙতে শুরু করেন। যেমন, ‘নিষ্ফল কামনা’ কবিতায় কোন কোন চরণে চৌদ্দ মাত্রার বেশি মাত্রা আছে। পরে তিনি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ যুগে গদ্য-কবিতা তথা গদ্য-ছন্দ সৃষ্টি করেছেন।

‘গদ্য-ছন্দ’-এর স্বরূপ নির্ণয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত হল গদ্যে সাধারণতঃ অর্থবান শব্দকে সুশৃঙ্খলরূপে ব্যবহার করা হয় এবং পদ্যে ব্যবহৃত হয় ধ্বনিমান শব্দ। তাই গদ্য-কবিতার পর্ব অর্থানুসারে বিভক্ত এবং মিলযুক্ত কবিতার পর্ব ধ্বনি-অনুসারে বিভক্ত। গদ্য-কবিতার পর্বকে ভাবপর্ব এবং গদ্য-কবিতার ছন্দকে ভাব-ছন্দ বলা যায়। গদ্য-ছন্দের ভাবপর্বের মাত্রাসংখ্যা মিলযুক্ত কবিতার মত অতিনিরূপিত নয়। তবু এর মধ্যে মিলযুক্ত কবিতার ঝংকার অনুপস্থিত নয়। গদ্য-কবিতার ছন্দ মিলযুক্ত কবিতার মত একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে আবদ্ধ নয়। তবে এ ছন্দ একেবারে অনিয়ন্ত্রিতও নয়। কবির ছন্দবোধ এ ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। গদ্য-কবিতার বিষয়বস্তুর পরিধি অতি-বিস্তৃত; কিন্তু যা নিয়ে গদ্য-কবিতা রচনা করা যায় তার সবগুলিই মিলযুক্ত কবিতার বিষয় হতে পারে না।

ছন্দ-অলংকার কাব্যের বহিরঙ্গের সজ্জা। তা কবিকল্পনার সহজ স্বাধীন

গতিকে বাধা দেয়। এর সঙ্গে তিনি নটীর নাচের শিক্ষিত পদক্ষেপের তুলনা করেছেন। আর গদ্য-কবিতার ছন্দের চলন হল স্বাভাবিক চলন। সব রকম বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত বলেই গদ্য-ছন্দের প্রকাশ-শক্তি ও গতি-ক্ষমতা বেশি।

গদ্য-কবিতার রূপ ও রীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা, এবং অনেক কবিতায়ও উল্লেখ করেছেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থে, অনেক কবিতায় গদ্য-কবিতা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন। পুনশ্চ-র 'কোপাই' কবিতায় কবি গদ্য-কবিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের 'কোপাই' নদীর তুলনা করেছেন। গদ্য-কবিতা 'কোপাই' নদীর মতই সরল এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'নাটক' কবিতাটিতে কবি গদ্য ও পদ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। পদ্যকে বলেছেন সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি। গদ্য এসেছে অনেক পরে এবং গদ্যে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র হয়েছে প্রশস্ত। গদ্যে চিরকালের স্তব্ধতার সঙ্গে চলতি কালের চাঞ্চল্যের সমন্বয় হয়েছে। শেষ সপ্তক-এর বিশ সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন তাঁর অতীতের ছন্দের বন্ধনে রচিত কবিতাগুলি খুব স্পর্শকাতর ও কোমল। জীবনের সর্বত্রই এদের গতি সহজ নয়। তাই তিনি শেষ যুগে নূতন রীতিতে কাব্য রচনা করতে চান যা হবে 'কঠিন চিত্ত উদাসীনের গান'। এই নূতন রীতি অবশ্যই গদ্য-রীতি। চব্বিশ সংখ্যক কবিতায় তিনি গদ্য-কবিতার মুক্ত রূপের কথা বলেছেন। এরা যেন 'ছুটি-পাওয়া নটী'। কবি ছন্দের পুরানো পেয়ালা ভেঙে ফেলে নূতন রীতিতে কাব্যরস পরিবেশন করেছেন। পঁচিশ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন, তাঁর অতীত যুগের কাব্য আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা। কিন্তু গদ্য-কবিতা ব্রাত্য, আচারমুক্ত ও সহজ ; বাইরে শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি না থাকলেও সংযম আছে এদের মজ্জার মধ্যে। আকাশপ্রদীপ কাব্যের 'ময়ূরের দৃষ্টি' কবিতায় কবি বলেছেন যে গদ্যে পদ্যের রং ধরানোই গদ্য-কাব্যের রীতি এবং এই আভাস আনা যায় কথ্য-ভঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথ গদ্য-ছন্দ বলতে প্রধানতঃ গদ্য-কবিতার ছন্দ বুঝিয়েছেন। রচনায় ভাব, ভাষা, ধ্বনি ও অর্থ অনুযায়ী মাত্রাগুচ্ছের বিন্যাসে মানুষের মনে যে প্রত্যাশাবোধ জাগে তার পূরণেই ছন্দের অনুভূতি জন্মায়। গদ্য-ছন্দে এই মাত্রাগুচ্ছের বিন্যাস ও সংখ্যা এবং তার পুনরাবর্তনের কোনো সুনির্দিষ্ট আঙ্কিক নিয়ম নেই। এখানে মাত্রাগুচ্ছের বিন্যাস ও আবর্তন অতিনিরূপিত না হলেও একেবারে অনিরূপিত থাকে না এবং তা মনের

প্রত্যাশাবোধকে বিশেষ উপায়ে পূর্ণ করে বলে ছন্দানুভূতি হয়। ছন্দ বিশেষভাবে মৌখিক ভাষার ছন্দ বলে গদ্য-কবিতা প্রধানতঃ চলিত ভাষায় রচিত হয়। গদ্য-কবিতার ছন্দের ভাবপর্ব হচ্ছে কথ্য ভাষার শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, লেখ্য ভাষাও অল্প পরিমাণে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার বই চারটি— পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলী। প্রতিটি গ্রন্থের দু-একটি কবিতা উদ্ধৃত করে গদ্য-কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

পুনশ্চ কাব্যের 'নূতন-কাল' কবিতা—

আমাদের কালে গোষ্ঠে | যখন সাঙ্গ হল ॥
সকাল বেলার | প্রথম দোহন, ॥
ভোরবেলাকার | ব্যাপারীরা ॥
চুকিয়ে দিয়ে গেল | প্রথম কেনাবেচা ॥
(তখন) | কাঁচা রৌদ্রে | বেরিয়েছি রাস্তায়, ॥
ঝুড়ি হাতে হেঁকেছি | আমার কাঁচা ফল নিয়ে— ॥
(তাতে) | কিছু হয়তো | ধরেছিল রঙ, | পাক ধরে নি। ॥
তার পর | প্রহরে প্রহরে | ফিরেছি পথে পথে ; ॥
কত লোক | কত বললে, | কত নিলে, | কত ফিরিয়ে দিলে, ॥
ভোগ করলে | দাম দিলে না | সেও কত লোক— ॥
সেকালের | দিন হল সারা। ॥

এখানে প্রতি চরণের পর্বসংখ্যা দুই থেকে চার-এর মধ্যে। তাই এখানে চরণে পর্ববহুত্ব নেই বলা চলে। সাধারণতঃ ছয়-এর বেশি পর্ব থাকলে পর্ববহুত্ব ঘটে। এখানে পর্বান্তর্গত মাত্রার সংখ্যা দুই থেকে নয়-এর মধ্যে। সাধারণতঃ পর্বের মাত্রাসংখ্যা দশ-এর মধ্যে দেখা যায়। পর্বসমূহের মধ্যে মাত্রাসংখ্যার সমতা না থাকলেও একেবারে অসমতাও নেই। চরণ ও পর্ব-সংখ্যার বিচারে ২॥২॥২॥২॥২॥২॥৩+৩॥৪॥৩॥২ এই ধরনের একটা ছকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ( ) এই চিহ্নের অন্তর্গত পর্বগুলি অতি-পর্ব।

'ফাঁক' কবিতাটির প্রথম স্তবকের ছন্দোলিপি—

আমার বয়সে ॥
মনকে বলবার | সময় এল— ॥
কাজ নিয়ে | কোরো না বাড়াবাড়ি, ॥
ধীরে সুস্থে চলো, ॥

যথোচিত পরিমাণে | ভুলতে করো শুরু ॥
(যাতে) | ফাঁক পড়ে | সময়ের মাঝে মাঝে । ॥
বয়স যখন | অল্প ছিল ॥
কর্তব্যের বেড়ায় | ফাঁক ছিল | যেখানে সেখানে । ॥
(তখন) | যেমন-খুশির ব্রজধামে ॥
ছিল বালগোপালের লীলা । ॥
মথুরার পালা এল মাঝে, ॥
কর্তব্যের রাজাসনে । ॥

এখানে প্রতি চরণের পর্বসংখ্যা এক থেকে তিন-এর মধ্যে। এখানেও চরণে পর্ববহুত্ব নেই। এখানে পর্বান্তর্গত মাত্রার সংখ্যা দুই থেকে দশ-এর মধ্যে। পর্বসমূহের মধ্যে মাত্রাসংখ্যার মোটামুটি একটা সমতার ভাব লক্ষ্য করা যায়।

শেষ সপ্তক-এর এক সংখ্যক কবিতার প্রথম স্তবকের ছন্দোলিপি—

স্থির জেনেছিলেম, | পেয়েছি তোমাকে, ॥
মনেও হয় নি ॥
তোমার দানের মূল্য | যাচাই করার কথা । ॥
তুমিও | মূল্য করনি দাবি । ॥
দিনের পর দিন গেল, | রাতের পর রাত, ॥
দিলে ডালি উজার ক'রে । ॥
আড়চোখে চেয়ে ॥
আনমনে নিলেম | তা ভাণ্ডারে ; ॥
পরদিনে | মনে রইল না । ॥
নব বসন্তের মাধবী ॥
যোগ দিয়েছিল | তোমার দানের সঙ্গে, ॥
শরতের পূর্ণিমা | দিয়েছিল তাকে স্পর্শ । ॥

এই স্তবকের প্রতি চরণে পর্ব আছে একটি বা দুটি করে। এখানেও চরণের পর্ববহুত্ব নেই। এখানে পর্বান্তর্গত মাত্রার সংখ্যা তিন থেকে নয়-এর মধ্যে।

পত্রপুট-এর পাঁচ সংখ্যক কবিতা—

সন্ধ্যা এল | চুল এলিয়ে ॥
অস্ত সমুদ্রে | সদ্য স্নান ক'রে । ॥

মনে হল, । স্বপ্নের ধূপ
নক্ষত্রলোকের দিকে। ॥
মায়াবিষ্ট নিবিড় | সেই স্তব্ধ ক্ষণে— ॥
তার নাম করব না— ॥
সবে সে | চুল বেঁধেছে | পরেছে | আসমানি রঙের শাড়ি, ॥
খোলা ছাদে | গান গাইছে একা। ॥
আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম | পিছনে ॥
ও হয়তো জানে না, | কিম্বা হয়তো জানে। ॥
ওর গানে বলছে | সিন্ধু-কাফির সুরে— ॥
চলে যাবি | এই যদি তোর | মনে থাকে ॥
ডাকব না ফি | রে ডাকব না, ॥
ডাকি নে তো | সকালবেলার | শুকতারাকে।— ॥

এই স্তবকের প্রতি চরণের পর্বসংখ্যা এক থেকে চার-এর মধ্যে। এখানেও চরণে পর্ববহুত্ব নেই। এখানে পর্বান্তর্গত মাত্রার সংখ্যা দুই থেকে নয়-এর মধ্যে।

শ্যামলী কাব্যের 'শ্যামলী' কবিতার প্রথম স্তবকের ছন্দোলিপি —

ওগো শ্যামলী, ॥
আজ শ্রাবণে তোমার | কালো কাজল চাহনি ॥
চুপ-করে-থাকা | বাঙালি মেয়েটির ॥
ভিজে চোখের পাতায় | মনের কথাটির মতো। ॥
তোমার মাটি আজ | সবুজ ভাষায় | ছড়া কাটে | ঘাসে ঘাসে ॥
আকাশের | বাদল ভাষার জবাবে। ॥
ঘন হয়ে উঠল | তোমার জামের বন | পাতার মেঘে, ॥
বলছে তারা | উড়ে-চলা মেঘগুলোকে | হাত তুলে, ॥
'থামো, থামো— ॥
থামো তোমরা | পুব-বাতাসের সওয়ারি।' ॥

পুনশ্চ-এর কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ অমিল যৌগিক-মুক্তক ও অমিল স্বরবৃত্ত-মুক্তক ছন্দে রচনা করেছেন। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মিলযুক্ত কবিতায় ব্যবহৃত শব্দবর্জন ও কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গী ব্যবহার করেছেন। এই কাব্যের 'বাঁশি', 'পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'খেলনার মুক্তি', 'উন্নতি', 'মৃত্যু' ও 'ভীরু' প্রভৃতি

কবিতাগুলি অমিল যৌগিক-মুক্তক ছন্দে লেখা। 'কোমল-গান্ধার', 'ছুটি', 'গানের বাসা', 'পয়লা আশ্বিন', 'শালিখ', 'অস্থানে' ও 'ঘরছাড়া' প্রভৃতি কবিতাগুলি অমিল স্বরবৃত্ত-মুক্তক ছন্দে লেখা।

গদ্য-কবিতার ভাবপর্ব কথ্যভাষার শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিয়ে সাধারণতঃ গঠিত হয়। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ, সর্বনাম প্রভৃতি এবং শুধু বা প্রায়শ মিলযুক্ত কবিতায় ব্যবহার্য শব্দাবলী যথাসম্ভব গদ্য-কবিতায় বর্জন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতায় এর কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন স্থানে স্থানে মিলযুক্ত কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। পুনশ্চ-র 'স্নানসমাপন' কবিতায়—

'শিষ্য **শুধালো**, 'বিলম্ব কেন প্রভু,…'

শেষ সপ্তক-এর এক সংখ্যক কবিতা—

বলতে বলতে তোমার চোখ এল **ছলছলিয়ে**

পত্রপুট-এর পাঁচ সংখ্যক কবিতা—

আমি ওকে দেখলেম—
যেন **নিকষবরন** ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরন পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,…

শ্যামলীর 'বাঁশিওয়ালা' কবিতা—

মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।

সাধুভাষার বিশেষ্য প্রভৃতির প্রয়োগ, পুনশ্চ-র 'শিশুতীর্থ' প্রভৃতি কবিতায় দেখা যায়।—

'**মাতা**, দ্বার খোলো!'

কোন কোন কবিতায় উত্তমপুরুষে নিত্যঅতীতের সাধারণ রূপ '**লাম**' ছাড়াও কলকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষার রূপ বা সাহিত্যের চলিত ভাষার বহু প্রচলিত '**লুম**' এবং কবিতায় ও নাটকে সমধিক ব্যবহৃত 'লেম'-এর, '**নু**'-র প্রয়োগ আছে। যেমন—পুনশ্চ-র 'শাপমোচন' কবিতা—

মহিষী বললে,—'**দেখলাম** নাচ'।

পুনশ্চ-র 'খোয়াই' কবিতা—

এসেছিনু বালককালে

পুনশ্চ-র 'ক্যামেলিয়া' কবিতা—

কাছে এসে **বললুম**, 'ফেলো চুরোট।'

শেষ সপ্তক-এর এক সংখ্যক কবিতা—

স্থির **জেনেছিলেম**, পেয়েছি তোমাকে,

শেষ সপ্তক-এর আট সংখ্যক কবিতা—

মনে মনে **দেখলুম**
সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা।

পত্রপুট-এর পাঁচ সংখ্যক কবিতা—

হাসলেম, **দেখলেম** অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,

শ্যামলী-র 'শেষ পহরে' কবিতা—

পড়লেম ঘুমে ঢলে
তুমি যাবার কিছু আগেই।

শ্যামলী-র 'আমি' কবিতা—

আমি চোখ **মেললুম** আকাশে,

কোন কোন কবিতায় সংস্কৃত ছন্দের প্রভাবে আ, ঈ, ঊ ইত্যাদি স্বর এবং শব্দ মধ্যবর্তী হলন্ত অক্ষর দুই মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। শব্দের যেসব স্বর বা অক্ষর দুই মাত্রা তাদের উপরে '২' চিহ্ন দিয়ে দেখান হয়েছে। পুনশ্চ-র 'চিররূপের বাণী' কবিতা—

২
বায়ুসমুদ্রে | ঘুরে ঘুরে চলে | অশ্রুতবাণীর | চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।

২ ২ ২
আশীর্বাদ | এই আমার, | সার্থক হবে | মনের সাধনা ;

২ ২ ২ ২
জীর্ণকণ্ঠ | মিশবে মাটিতে | চিরজীবী কণ্ঠস্বর | বহন করবে বাণী।

পত্রপুট-এর তিন সংখ্যক কবিতা—

২
আজ | আমার প্রণতি | গ্রহণ করো, | পৃথিবী,

২ ২
শেষ নমস্কারে অবনত | দিনাবসানের | বেদিতলে |

২ ২
মহাবীর্যবতী, | তুমি বীরভোগ্যা

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাবলীর ছন্দ ছাড়াও আরও কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে, তা হল ভাষা, শব্দ, অলংকার এবং চিত্রকল্প।

গদ্য-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই চলিত ভাষা কিন্তু জনসাধারণের ভাষা নয়। এই ভাষা আয়ত্ত করা শিক্ষা-সাপেক্ষ। এই ভাষা পরিশীলিত ও মার্জিত। গদ্য-কবিতাগুলিতে কবি আধুনিক কথ্য ভাষা ও ভঙ্গীকে ব্যবহার করেছেন, ফলে এগুলি জীবনের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হতে পেরেছে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অনভিজাত ও অভিজাত সব রকম ভাব-প্রকাশে এই ভাষা সক্ষম।

শব্দ-ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ রীতি মানেন নি। দেশী, বিদেশী, তৎসম, তদ্ভব, ভগ্নতৎসম ইত্যাদি নানা শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। কথ্য ভাষারীতি ব্যবহার করার জন্য তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কবিতাগুলি অনেকাংশে আধুনিক জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ইংরেজি শব্দের ব্যবহারও প্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার বহুস্থানে শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়েছে। পুনশ্চ-এ কবি 'গৃহস্থ পাড়া'র ভাষা রচনার সংকল্প করলেও তাঁর গদ্য-কবিতাগুলির ভাষা জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ছন্দে রচিত কাব্যগুলির ভাষারীতি ও বিষয়বস্তুই এর প্রমাণ। সোনার তরী কাব্যের 'বসুন্ধরা' এবং পত্রপুট-এর 'পৃথিবী' কবিতায় বক্তব্যের বিশেষ তারতম্য নেই। তবে অনুভূতি এবং প্রেরণার দিক থেকে পার্থক্যের জন্য এদের প্রকাশভঙ্গী পৃথক। পত্রপুট কাব্যের 'পৃথিবী' কবিতাকে গদ্য-ভঙ্গী দেওয়ার জন্য কবি অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন করেছেন; কিন্তু শ্রুত্য, বৃত্ত্য প্রভৃতি অনুপ্রাসের ধ্বনি সম্পদে কবিতাটি সমৃদ্ধ। অনুপ্রাসের প্রাধান্য ও অন্যান্য অলংকার কবিতাটির ভাবস্বরূপ হয় নি বরং কবিতাটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে।

পুনশ্চ কাব্যের ৩৩টি কবিতায় কবি অনুপ্রাস-অতিরিক্ত মোট ৯৮টি উল্লেখযোগ্য অলংকার ব্যবহার করেছেন এবং এগুলির মধ্যে সাদৃশ্যমূলক ৮৫টি অর্থালংকারই প্রধান। শেষ সপ্তক-এর ৪৬টি কবিতায় ব্যবহৃত ৭৭টি উল্লেখযোগ্য অলংকারের মধ্যে ৬৯টি সাদৃশ্যমূলক অলংকারই প্রধান। পত্রপুট এবং শ্যামলী প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত। পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যে

যথাক্রমে ১৯ ও ২২টি কবিতা স্থান পেয়েছে। দুটি কাব্যেই সাদৃশ্যমূলক অলংকারই প্রধান। পত্রপুট-এর ৬৩টি উল্লেখযোগ্য অলংকারের মধ্যে সাদৃশ্য-মূলক অলংকার হচ্ছে ৫৯টি। শ্যামলী কাব্যের মোট অলংকার-সংখ্যা ৬৬টি, এর মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলংকার হচ্ছে ৫৯টি।

পুনশ্চ কাব্যের সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের মধ্যে সর্বত্রই রূপকের অসামান্য উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় না। এই কাব্যের উৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলি গুণবিচারে এবং অভিনবত্বে রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'খোয়াই' কবিতায়—

> পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়,
> তারি এক ধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে,
> মাটি গেছে ক্ষয়ে,
> দেখা দিয়েছে
> ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড় ;
> মাঝে মাঝে মর্চে-ধরা কালো মাটি
> মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।

'দেখা' কবিতায়—

> মোটা মোটা কালো মেঘ
> ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
> সমস্ত রাত বর্ষণের পর
> আকাশের এক পাশে এসে জমল
> ঘেঁষাঘেঁষি করে।

'প্রথম পূজা' কবিতায়—

> আকাশে উঠছে জ্বলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
> জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে।

পূর্বোক্ত অলংকারগুলিতে কল্পনার অভিনবত্ব এবং নূতনত্ব থাকলেও রবীন্দ্রনাথোচিত কোমল মাধুর্য এখানে অনুপস্থিত, বরং মনন-কর্ষণার সজ্ঞান প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আবার কোন কোন উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কাব্যধর্মী কোমল সৌন্দর্যের দর্শন পাওয়া যায়,—

'ছুটির আয়োজন' কবিতায়—

হাওয়া উঠছে শিশিরে শির্‌শিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।

বা, 'শাপমোচন' কবিতায়—

আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন
তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।

পুনশ্চ কাব্যের উপমা অলংকারগুলি স্বচ্ছন্দ সজীব এবং প্রাণবন্ত। এখানে উপমাগুলি প্রয়োগ-কুশলতার জন্য আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। যেমন, 'খোয়াই' কবিতায়—

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়সওয়ার বর্গিসৈন্যের মতো—

'ছেলেটা' কবিতায়—

ঐ সবুজ স্বচ্ছ জল
সাপের চিকণ দেহের মতো।

'শিশুতীর্থ' কবিতায়—

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।

পুনশ্চ কাব্যের কয়েকটি 'দৃষ্টান্ত' এবং 'নিদর্শনা' অলংকার সৃষ্টি অনবদ্য। যেমন, দৃষ্টান্ত অলংকার 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায়—

'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়?'

'নিদর্শনা' অলংকার 'দেখা' কবিতায়—

শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি,
হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে পালায়।

'পয়লা আশ্বিন' কবিতায় নিদর্শনা অলংকার—

পুব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে,

পুনশ্চ কাব্যের ন্যায় শেষ সপ্তক-এর উপমা অলংকারগুলিতেও অপূর্ব লাবণ্য ফুটে উঠেছে। যেমন, আট সংখ্যক কবিতায়—

তার কাঁপনে আমার মন ঝল্‌মস্ করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।

তেইশ সংখ্যক কবিতায়—

যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

ছেচল্লিশ সংখ্যক কবিতায়—

ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন ফোটা কাঁটালি চাঁপার মতো।

সাত সংখ্যক কবিতায় ব্যবহৃত একটি মালোপমা অলংকারের উল্লেখ করা যায়—

অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলির সাহায্যে কবি স্বল্প পরিসরে এক একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। চার সংখ্যক কবিতায়—

বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগ্‌নি রঙের আঁচ্‌লা।

উনত্রিশ সংখ্যক কবিতায়—

চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্ষের খেতে
কবির লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।

ত্রিশ সংখ্যক কবিতায়—

কচি শ্যামল তার রঙটি

গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা !

শেষ সপ্তক-এর সমাসোক্তি এবং স্বভাবোক্তির চিত্রগুলিও মনোজ্ঞ, যেমন, ছেচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় ব্যবহৃত সমাসোক্তি অলংকার,—

তখন প্রতি দিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,
সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,
হাসত আমার মুখে চেয়ে।
আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে।

চার সংখ্যক কবিতায় স্বভাবোক্তি অলংকার—

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল
রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগ্‌নি রঙের আঁচলা।
গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।
মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে।
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ।

পত্রপুট এবং শ্যামলী দুটি কাব্যেরই রূপক অলংকারগুলি সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। অবশ্য স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, পত্রপুট-এর তিন সংখ্যক কবিতায় একটি রূপক—

সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।

রূপক অলংকারের তুলনায় পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যের উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলি শ্রেষ্ঠ। পত্রপুট-এর দুই সংখ্যক কবিতায় ব্যবহৃত একটি উপমা—

আমার ছুটি চার দিকে ধু ধু করছে
ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।

তিন সংখ্যক কবিতায় অপর একটি উপমা—

হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

পত্রপুট-এর উৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলি অভিনবত্ব দাবি করতে পারে। যেমন, পাঁচ সংখ্যক কবিতায়—

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্ত সমুদ্রে সদ্য স্নান ক'রে।
মনে হল, স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।

পত্রপুট-এর কবিতাগুলিতে অলংকারের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে তীব্র গতি ও উত্তপ্ত আবেগ সঞ্চার করে এক একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। যেমন, তিন সংখ্যক কবিতার অংশ বিশেষ—

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

এখানে রূপক, উপমা এবং বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের সমন্বয় হয়েছে। পত্রপুট-এর স্বভাবোক্তি অলংকার প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক। যেমন, দুই সংখ্যক কবিতায়—

দেখলেম বর্ষা গেল চলে
কালো ফরাসটা নিল গুটিয়ে।

ব্যতিরেক অলংকারেও কবির নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে ষোলো সংখ্যক কবিতায়—

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।

শ্যামলী কাব্যের অলংকারগুলিও ভাবসমৃদ্ধ। এখানে ব্যবহৃত উপমাগুলি চিত্রধর্মী এবং বর্ণবহুল। যেমন, 'হঠাৎ-দেখা' কবিতায়—

আগে ওকে বার বার দেখেছি
লালরঙের শাড়িতে
দালিম ফুলের মতো রাঙা;

উৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলিও সৌন্দর্যে ও অভিনবত্বে শ্রেষ্ঠ। যেমন, 'উৎসর্গ' কবিতায়—

জামরুলগাছে ধরে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল।

'তেঁতুলের ফুল' কবিতায়—

ভোরের বেলায় আকাশের রঙ
যেন পাগলের চোখের তারা।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলির সাহায্যে কবি চিত্র ও ধ্বনি-রূপকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। যেমন, 'কালরাত্রে' কবিতায়—

পাখিদের ছোট কোমল তনুতে
দুরন্ত হয়ে উঠল প্রাণের উৎসুক ছন্দ।
চলল তাদের সুরের তীরখেলা
কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, শাখা থেকে শাখায়।
সেতারের দ্রুত তালের বাজন যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।

স্বভাবোক্তি অলংকারের সাহায্যেও কবি নিপুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন, 'স্বপ্ন' কবিতায়—

ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া,
এলোমেলো ঝাপট দিচ্ছে চার দিকে।
মেঘ ডাকছে গুরুগুরু,
থরথর করছে দরজা,
খড়্ খড়্ করে উঠছে জানলাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি,
সারবাঁধা সুপুরি-নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা-ঝাঁকানি।
দুলে উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
দল-পাকানো প্রেতের মতো।
রাস্তার থেকে পড়েছে আলোর রেখা
পুকুরের কোণে—
সাপ-খেলানো, আঁকাবাঁকা।

শ্যামলী-র সমাসোক্তি অলংকারগুলির মধ্যে কবির সঙ্গে প্রকৃতির সহজ সম্পর্কের রূপটি ধরা পড়েছে। যেমন, 'হারানো মন' কবিতায়—

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে,
দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্দুর
চুরি করেছে তোমার ছায়া,
ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের 'পরে।

'অকাল ঘুম' কবিতায়—

ক্লান্ত জগৎ চলেছে পা টিপে
ওর খোলা জানালার সামনে দিয়ে
ওর শান্ত-নিশ্বাসের ছন্দে।

এবার গদ্য-কবিতার 'ইমেজ' সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। যখন অলংকারগুলি সর্বতোভাবে কবির মনোভাবকে প্রকাশ করতে সক্ষম

হয় না, তখনই 'ইমেজে'র সাহায্য নিতে হয়। এই 'ইমেজে'র মধ্যে আবার এক বা একাধিক অলংকার থাকতে পারে। নানারূপ মতবিরোধ থাকলেও সাধারণভাবে 'ইমেজ' কথাটিকে বাংলায় বলা হয় চিত্রকল্প। কবির মনে বাস্তব জগৎ যে রূপ গ্রহণ করে, তা প্রকাশিত হয় চিত্রকল্পে। এজন্যই এই চিত্রকল্পের সাহায্যেই পাঠক বাস্তব সম্পর্কে কবির মনোজগতের খবর জানতে পারেন। মানুষের ইন্দ্রিয়ের কাছেই এই চিত্রকল্পগুলির আবেদন। এই চিত্রকল্পগুলির সাহায্যেই পাঠকের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। চিত্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য কাব্যিক সত্যের প্রকাশ। আবেগ ও মননের তারতম্যের জন্য চিত্রকল্পগুলিরও প্রকার ভেদ ঘটে। চিত্রকল্প সাধারণতঃ সরল জটিল এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক হয়।

সরল চিত্রকল্পগুলিতে অভিজ্ঞতার সরল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে অভিজ্ঞতার মধ্যে গভীরতা বা জটিলতা থাকে না। এগুলি সাধারণতঃ স্বভাবোক্তি অলংকারের মতো। যেমন—পুনশ্চ-র 'কোপাই' কবিতা—

হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন-পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

শেষ সপ্তক-এর চার সংখ্যক কবিতা—

গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।
মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে।

পত্রপুট-এর পাঁচ সংখ্যক কবিতা—

নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাক-সবজির ঝুড়ি-চুপড়িতে,
আঁটি বাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি-মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।

শ্যামলী-র 'অমৃত' কবিতায়—

বেগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা—
টেলিগ্রাফের তারে বসে লেজ তুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে।

কবি যখন তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশে জড়বস্তুর উপর সজীবতা এবং মানসিক গুণ আরোপ করেন অথবা চেতনাসম্পন্ন বস্তুতে বা প্রাণীতে বিমূর্ততা আরোপ করেন তখনই সৃষ্টি হয় জটিল চিত্রকল্প। এই ধরনের চিত্রকল্পে অলংকরণের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি এই ধরনের চিত্রকল্পের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

পুনশ্চ-র 'অপরাধী' কবিতা—

মনটা ওর হাল্কা ছিপ্‌ছিপে নৌকো,
হু হু করে চলে যায় ভেসে,

পুনশ্চ-র 'বালক' কবিতা—

জটাধারী বুড়ো বট মোটা মোটা শিকড়ে
আঁকড়ে ধরেছে পুব ধারটা।

শেষ সপ্তক-এর চৌদ্দ সংখ্যক কবিতা—

স্বচ্ছ রাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লিঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

শেষ সপ্তক-এর চৌত্রিশ সংখ্যক কবিতা—

বিরাট অহংকার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধূলায় প্রণত—

পত্রপুট-এর তুই সংখ্যক কবিতা—

আমার ছুটি চার দিকে ধূ ধূ করছে
ধান-কেটে-নেওয়া ক্ষেতের মতো।

শ্যামলী-র 'প্রাণের রস' কবিতা—

আমার এই একটুখানি অবসর
উড়ে চলেছে
ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতো
সূর্যাস্তবেলার আকাশে
রঙিন ডানার শেষ খেলা চুকিয়ে দিতে—

গূঢ়ার্থব্যঞ্জক চিত্রকল্পে ভাবের একটি নিগূঢ় সংহতি লক্ষ্য করা যায়। সব সময় এই চিত্রকল্পগুলির অর্থ সুপরিস্ফুট হয় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল।—

পুনশ্চ-র 'চিররূপের বাণী' কবিতা—

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে।
জয়ধ্বনি উঠল মর্তলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণতরঙ্গিনীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।

শেষ সপ্তক-এর সাত সংখ্যক কবিতা—

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি,
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।

পত্রপুট-এর তিন সংখ্যক কবিতা—

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার চিত্রকল্পগুলি সর্বত্রই সংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় সার্থক হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে এগুলি সর্বত্রই সজীব এবং যথার্থ ইঙ্গিতবাহী।

দুই

অন্যান্য কবিতা— গদ্য কবিতা ব্যতীত শেষ পর্যায়ের যে আরও অন্যান্য বিপুল সংখ্যক কবিতা আছে, যেখানে সর্বত্রই ছন্দ ও বাগৈশ্বর্যের নিদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে। ছন্দের দিক থেকে শেষ পর্যায়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পরীক্ষামূলক। পুনশ্চ-র আগে পর্যন্ত এবং শ্যামলীর পর থেকে অন্যান্য কাব্য-

গুলিতে কবি মোটামুটিভাবে সর্বত্রই অন্ত্যমিল রক্ষা করে তাঁর পুরনো ছন্দরীতির অনুবর্তন করেছেন। তাঁর গদ্য-কবিতা রচনার যুগের মধ্যবর্তী কাব্য বীথিকা-তেও কবি অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। গদ্য-কবিতা অতিরিক্ত অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যেও আবার সূক্ষ্ম দুটি ভাগ করা যায়।

ক. রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে ও শেষ লেখা প্রভৃতি কাব্যে ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার ও আবেগ আছে, কিন্তু অধিকাংশ কবিতায় অন্ত্য অক্ষরের মিল নেই এবং সর্বত্রই প্রায় অসমপঙ্‌ক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। মানসী বা তারও পূর্ব থেকে কবি কবিতাবলীর মধ্যে চরণে অসম সংখ্যক পর্ববিন্যাস ও ছন্দের প্রবহমানতার চর্চা করে আসছিলেন। এরই চরম স্ফূর্তি হয়েছে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে। এই সব কাব্যে চরণের মধ্যে তিনি তিন, চার, ছয়, আট ও দশ মাত্রার পদ বা পর্ব ব্যবহার করেছেন। অবশ্য পর্বে পয়ারের যুগ্ম-মাত্রিকতা অক্ষুণ্ণ আছে। এগুলিকে মোটামুটিভাবে অমিল যৌগিক মুক্তক ছন্দ বলা যেতে পারে। অন্ত্য অক্ষরের মিলহীন কবিতাগুলির প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি পরবর্তী পঙ্‌ক্তি থেকে স্বতন্ত্র। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে যেমন একটি পঙ্‌ক্তি আর একটি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে মিলিত হয়, এখানে সেরকম হয় নি। যেমন, আরোগ্য-এর ৩ সংখ্যক কবিতা—

নির্জন রোগীর ঘর।
খোলা দ্বার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থর গতি
শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।
মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
শস্যহীন মাঠে॥

কবিতাগুলিতে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় করা হয়েছে। পয়ারের যুগ্ম-মাত্রিকতা স্বতঃই লক্ষ্যগোচর হয়। যেমন, আরোগ্য-এর ৯ সংখ্যক কবিতা—

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা। আকাশে আকাশে

এখানে আট, আট ও ছয় মাত্রার এক একটি পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে; সুতরাং এই ছন্দকে পয়ার জাতীয় বলা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পর্ব যত ক্ষুদ্র হয়েছে আভ্যন্তরীণ গতিও ততই স্পষ্ট হয়েছে। কোন কোন স্থানে অসম (তিন মাত্রা) ও বি-সম (দুই-তিন মিলিত) মাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সমস্ত কবিতায় ছন্দের গতি চঞ্চল। যেমন, আরোগ্য-এর ১৮ সংখ্যক কবিতা।—

ফসল কাটা হলে সারা মাঠ হয়ে যায় ফাঁক—
অনাদরের শস্য গজায়, তুচ্ছ দামের শাক।

এই সমস্ত কাব্যে ছন্দের ঝংকার সুস্পষ্ট, তবু ছন্দের নিয়মের ব্যতিক্রম খুব বেশি। এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে প্রায় প্রত্যেকটিতে অসম পঙক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। কতকগুলি কবিতায় মিল থাকলেও পঙ্‌ক্তিগুলি এত অসম যে মনে হয় মিলের ধ্বনিসঙ্গতি অনেকটা ব্যাহত হয়ে যাবে। জন্মদিনে কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতা—

ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সম্পর্কিত পরীক্ষা রোগশয্যায়, আরোগ্য ইত্যাদি কাব্যে বিশেষভাবে উত্তীর্ণ। এখানে ছন্দের গতি যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছে। তবু যতির বহুল প্রয়োগের জন্য এবং ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও মাত্রার সাম্যের জন্য মিলযুক্ত কবিতার ছন্দের স্বকীয়তা নষ্ট হয় নি। এই জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য হল কবি এখানে তিন, চার, ছয়, আট বা দশ মাত্রার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে দুই মাত্রার মধ্যে আছে স্থৈর্য। দুই মাত্রার পরই যদি 'যতি' পড়ে তাহলে ছন্দের গতি হয় হাল্‌কা। তিনি এই সকল কবিতা প্রধানতঃ পয়ার জাতীয় ছন্দে রচনা করেছেন। কবি যুক্ত অক্ষরের পূর্ব-স্বরকে একমাত্রার মূল্য দিয়েছেন। যেমন, 'বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে' চরণটির 'সৃষ্টি'র কথাটির 'ষ্টি' অংশ একটি সমগ্র ধ্বনি।

আলোচ্য কবিতাগুলির ছন্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি বা চরণের রূপ। প্রতি পঙ্‌ক্তিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনেক স্থানে মাঝে

মাঝে সামান্য 'ছেদ' থাকলেও সমগ্র পঙ্‌ক্তিটির ঐক্যে বাধা সৃষ্টি হয় না। মাঝের ঐ সামান্য 'ছেদ'কে পূর্ণ যতি বলে গ্রহণ করা যায় না। আরোগ্য প্রভৃতি কাব্যের কবিতায় ছোট ছোট পঙ্‌ক্তিগুলি—কোন কোন স্থলে দীর্ঘতর পঙ্‌ক্তি ও একটি যতিহীন পদের মতো একটি একক ধ্বনি-সমষ্টি। এই সমগ্রতা এই সকল পঙ্‌ক্তিগুলিকে গাম্ভীর্যমণ্ডিত করেছে।

পয়ারের যতিমাত্রার বহুল ও অভিনব প্রয়োগ করা হয়েছে শেষের যুগের অনেক কবিতায়। এক একটি ছোট পঙ্‌ক্তি যেখানে থেমেছে সেখানে দীর্ঘ বিরামের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য ছোট পঙ্‌ক্তিও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কবি যখন এই কাব্যপরিমণ্ডলটি রচনা করেন তখন তিনি জীবনের বহু-বিচিত্র লীলা থেকে সরে এসে শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত। তাঁর স্বচ্ছ চেতনা যেন জীবনমৃত্যুর মধ্যে এক গভীর অর্থময় সেতু রচনা করতে চেয়েছে। কবিতাগুলিতে কোন সচেতন শিল্প-প্রয়াসের চিহ্ন মাত্র নেই। আরোগ্য কাব্যের 'সংসারের প্রান্ত জানালায়', জন্মদিনে কাব্যের 'ধূসর গোধূলি লগ্নে' বা শেষ লেখা কাব্যের 'রূপ নারাণের কূলে', 'প্রথম দিনের সূর্য', 'দুঃখের আঁধার রাত্রি', 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত অচেতন অলংকরণ এবং এক আশ্চর্য অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্ততা যেন মন্ত্রবৎ রহস্য-নিবিড় আবেদনের সৃষ্টি করেছে। সচেতন শিল্পপ্রয়াস ব্যতীতই এই পর্যায়ের কবিতাগুলি আর্টের পরম সার্থকতায় উত্তীর্ণ। মহুয়া পর্যায়ের পর থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় পদ্য-ছন্দ ও গদ্য-ছন্দের ক্রম-পরিবৃত্তি। শেষ পর্যায়ের এই মন্ত্রোপম রচনাগুলিতে যেন গদ্য ও পদ্য-ছন্দের মিশ্রণ হয়েছে এক স্বতোৎসারিত শান্ত গম্ভীর ভঙ্গীতে। এদের মধ্যে মিলহীন অসম দৈর্ঘ-সমন্বিত গদ্যপঙ্‌ক্তির মধ্যেও মিলযুক্ত কবিতার নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়।

শেষ পর্যায়ের এই অন্তিম কাব্য কয়টিতে তাঁর উপনিষদ্‌পুষ্ট মানসকে উচ্চভাবধারণক্ষম বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করেছেন। কাব্যগুলিতে 'মগ্ন', 'চৈতন্য' ইত্যাদি শব্দ একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে। রোগশয্যায় কাব্যের 'অনিঃশেষ প্রাণ', 'চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে', 'আদি মহার্ণব গর্ভ হতে', 'চৈতন্যসাগর তীর্থপথে', 'আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ', আরোগ্য কাব্যের —'নিত্যের জ্যোতি', 'চিরমানবের সিংহাসন', 'অমৃতের উৎসস্রোতে', 'অসীম

চৈতন্যলোকে', 'হিরণ্ময় লিপি', জন্মদিনে কাব্যের 'নীহারিকা জ্যোতির্বাষ্প মাঝে', 'অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো', 'পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে', 'আত্মার অমৃত অন্ন করিবারে দান', শেষলেখা কাব্যের 'অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার', 'পরম আমির সত্যে সত্য তার', 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' প্রভৃতি মন্ত্রবৎ শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্‌-লালিত-মনটিকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছে।

এই চারটি কাব্যের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ স্থানে অলংকারগুলি গতানুগতিক হয়েছে। কবি রোগশয্যায় কাব্যে মোট ৪৩টি, আরোগ্য কাব্যে ২৭টি, জন্মদিনে কাব্যে ৩৮টি এবং শেষ লেখা কাব্যে ৯টি অলংকার ব্যবহার করেছেন।

রোগশয্যায় কাব্যের ২০ সংখ্যক কবিতায় কবি দুটি রূপক ও একটি উপমা অলংকারের সাহায্যে তাঁর তৎকালীন অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।—

সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার।
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে॥

২৩ সংখ্যক কবিতায়ও একটি উপমার সাহায্যে কবির জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে।—

······এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোকসম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা॥

১০ সংখ্যক কবিতায় একটি সভঙ্গ শ্লেষ অলংকার বিশেষ ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত—

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু
মিশাইলে মূলতানে—
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন,
ভুলে যাবে তার মানে।

আরোগ্য কাব্যের কোন কোন উপমা অলংকারে বর্ণনীয় চিত্রের মধ্যে গতির ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, ৩ সংখ্যক কবিতায়—

শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থরগতি
শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।

এই কাব্যের রূপক অলংকারগুলির স্থানে স্থানে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ৬ সংখ্যক কবিতায়

মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে
বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।

স্মৃতিচারণমূলক ৪ সংখ্যক কবিতাটিতে ব্যবহৃত স্বভাবোক্তি অলংকার উল্লেখযোগ্য। আবার ২৮ সংখ্যক কবিতায় একটি নিশ্চয় অলংকারও অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।—

গাছে গাছে জোনাকির দল
করে ঝলমল;
সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে আঁধারেতে
টুকরো আলোক গেঁথে গেঁথে।

জন্মদিনে-র ১ সংখ্যক কবিতার স্বভাবোক্তি অলংকারটি অনুভূতির গভীরতায় স্নিগ্ধ ও ভাস্বর—

সেদিন আমার জন্মদিন।
প্রভাতের প্রণাম লইয়া
উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁখি,
দেখিলাম সদ্যস্নাত উষা
আঁকি দিল আলোকচন্দনলেখা
হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।

১০ সংখ্যক কবিতায় একটি বিরোধাভাস অলংকারের সাহায্যে কবি তুষারগিরির নৈশব্দ্যের অনুভূতিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন—

> দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
> অশ্রুত যে গান গায়
> আমার অন্তরে বার বার
> পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।

২৪ সংখ্যক কবিতায় একটি প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলংকারের সাহায্যে কবি বর্ণসুষমার সৃষ্টি করেছেন—

> গোধূলির সিঁদুর ছায়ায় ঝ'রে পড়ে
> পাগলা আবেগের
> হাউই-ফাটা আগুন ঝুরি।

শেষ লেখা কাব্যে কয়েকটি রূপক, উপমা ও সমাসোক্তি অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। একটি উপমায় মৃত্যুর সর্বগ্রাসী রূপটি অপূর্বভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ২ সংখ্যক কবিতায়—

> রাহুর মতন মৃত্যু
> শুধু ফেলে ছায়া,

শব্দ, ছন্দ ও অলংকার আলোচনার পরে আসে চিত্রকল্প রচনার কথা। চিত্রকল্প সাধারণতঃ কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য দ্যোতনা করে। কাব্যের আবেদন প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের কাছে। চিত্রকল্পের মধ্য দিয়েই এই আবেদন পৌঁছায়।

কাব্যগুলির মধ্যে কয়েকটি সরল চিত্রকল্প উজ্জ্বল দ্যোতনাময়। আরোগ্য ৪ সংখ্যক কবিতায় কতকগুলি সাধারণ দৃশ্য আশ্চর্য সরলতা এবং নিরলংকার ভাষণে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে। দৃশ্যগুলি শুধুমাত্র উল্লেখের সাহায্যে ধরা পড়েছে, কোন বিশেষণে এগুলিকে বিশেষিত করা হয় নি।—

> গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে
> নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।
> প্রাচীন অশথতলা,
> খেয়ার আশায় লোক ব'সে
> পাশে রাখি হাটের পসরা।

গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি—
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর,
ভিড় করে মাছি।

জন্মদিনে-র ১৯ সংখ্যক কবিতায় কবির স্মৃতিতে পুরনো নীলকুঠি জেগে উঠেছে।—

আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠেছে
বেতগাছ ঝোপঝাড়ে
পুকুরের পাড়ে
সবুজের আল্পনায় রঙ দিয়ে লেপে।
সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে
নীলচাষ-আমলের প্রাচীন মর্মর
তখনো চলিছে বহি বৎসর বৎসর।

অন্তিম কাব্য শেষ লেখা-র মধ্যেও বিরল ভাষণে ও স্বল্প আয়োজনে স্থানে স্থানে চিত্র অঙ্কন করেছেন। যেমন, ৪ সংখ্যক কবিতায়—

রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।

এই কাব্যগুলিতে জটিল এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক চিত্রকল্পেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নীচে কয়েকটি জটিল চিত্রকল্পের উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন, রোগশয্যায় ২ সংখ্যক কবিতা—

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,
পদে পদে সংকটে সংকটে
নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশবিহীন কোন্ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া,

২৪ সংখ্যক কবিতার একটি চিত্রকল্প মহান গাম্ভীর্যের আবেদন এনে দিয়েছে-

প্রত্যূষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি-অভিষেক ;
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।

আরোগ্য ৬ সংখ্যক কবিতা—

অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা,
অরণ্য তাহারি তলে ঊর্ধ্বে বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।

জন্মদিনে ১২ সংখ্যক কবিতায়—

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা,
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ
চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।

গূঢ়ার্থব্যঞ্জক চিত্রকল্পের কয়েকটি নিদর্শন—

রোগশয্যায় ৫ সংখ্যক কবিতা—

উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত
দিক্‌বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে।

ঐ কাব্যেরই ২৩ সংখ্যক কবিতা—

প্রভাত-আলোয় মগ্ন ওই নীলাকাশ
পুরাতন তপস্বীর
ধ্যানের আসন,
কল্প-আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে ;

আরোগ্য ১৭ সংখ্যক কবিতা—

প্রাণলক্ষ্মী-ধরিত্রীর গভীর আহ্বানে
মা দাঁড়ায় এসে
যে মা চিরপুরাতন নূতনের বেশে ॥

জন্মদিনে ৯ সংখ্যক কবিতা—

প্রবাহের পটে
মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা।
কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে ॥

খ. আর এক শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ আছে, যেখানে কবি ছন্দ বজায় রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ কাব্যে কথ্য ভাষার তুচ্ছতা, স্বচ্ছতা, বিস্তৃতি ও উন্মুক্ত গতিভঙ্গী আছে। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে পূরবী, মহুয়া, পরিশেষ, বীথিকা, আকাশ-প্রদীপ, নবজাতক, সানাই ইত্যাদির নাম করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগৎ উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ এবং অবারিত ছন্দ-সঞ্চালনের পর পলাতকা-র পরই শেষ হয়ে যায়। তারপর কিছুদিনের নীরবতার পর ভাষার আশ্চর্য সূক্ষ্ম কারুকার্য, অপূর্ব ধ্বনির সমাবেশ, অপরূপ ব্যঞ্জনাময় স্বল্পভাষণ এক কথায় অসাধারণ রচনা-সৌকর্যের স্বাক্ষর বহন করে লিপিকা আবির্ভূত হল। এই আবির্ভাব নূতন ও অভাবনীয়। এই একই দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রকাশরীতির পরিচয় আছে পূরবী কাব্যে। এই কাব্যে পদ্য-ছন্দের বহু বিচিত্র রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকাশরীতি মহা শক্তিশালী অথচ অপূর্ব কোমল ও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময়। লিপিকা ও পূরবী-তেই রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা এক নূতন ধরনের পূর্ণতা লাভ করল। এই মৌলিক শিল্পরীতির বহুবিচিত্র পরিণতি লক্ষ্য করা যায় তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলিতে।

পূরবী কাব্যে কবি মর্ত্যধরণীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর। তাই কাব্যটি আদ্যন্ত বিরহের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ। প্রেমের শান্ত মধুর স্মৃতি গুঞ্জনে, বিগত যৌবনের স্তুতিবাদে জীবনের পরপারে মহারহস্যের অনুভবে

কবি এই কাব্যে নিবিড় সৌন্দর্যময় শিল্পরূপ সৃষ্টি করেছেন। পূরবী-তে কবি অতীতের সৌন্দর্য মাধুর্যময় দিনগুলিকে স্মৃতিতে জাগ্রত করে আবার সেই পরিমণ্ডলে ফিরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু বলাকা-র সেই আকস্মিক উচ্ছ্বাস পূরবী-তে অস্তমিত। এখানে ভাষা শান্ত, গভীর এবং মধুর। ভাবের ক্ষেত্রে যেমন অতীতের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছেন, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি যেন সেই অতীতের রোমান্টিক সৌন্দর্যময় ভাষার দ্বারস্থ হয়েছেন।

পূরবী-তে কবি আবার বহুবিচিত্র পদ্য-ছন্দের মধ্যে ফিরে এসেছেন। বলাকা-তে কবি একটি নূতন ছন্দ সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে বিপুল শক্তি, উদ্দাম গতিবেগ এবং বন্ধনহীন আবেগ কল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পূরবী-র ছন্দে স্মৃতি-চিন্তায় বিষণ্ণ, শান্ত ও গভীর জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বলাকা-র অধিকাংশ কবিতা স্তবকহীন, অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তির সমাবেশে গঠিত। পূরবী-তে তিনি ছন্দের কাঠামোকে অনুসরণ করেছেন। পূরবী-র কবিতায় স্তবকগুলি ভাবানুযায়ী রচিত। অধিকাংশ কবিতাই সমিল যৌগিক ছন্দে রচিত। মানসী কাব্য থেকেই তিনি পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীকে ভেঙে ফেলেন।

মহুয়া-তে কবি এক অপরূপ প্রাণোচ্ছল লীলাচপল ছন্দের সৃষ্টি করেছেন। অধিকাংশ কবিতারই ভাষা সৌন্দর্যময়ী, কিন্তু শিল্পগ্রন্থনা একটু শিথিল ও অসতর্ক। এই শৈথিল্য কিন্তু বলাকা-পর্বের কবিতার মত আবেগ-আতিশয্যে নয়, এ শুধু কবির ইচ্ছা অনুযায়ী। প্রেমই এই কাব্যের উপজীব্য হওয়ায়, প্রেমের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রহস্য প্রকাশের জন্য ভাষা হয়েছে রোমান্টিক সৌন্দর্যময়ী। কোন কোন কবিতার ভাষায় শিল্পগুণের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। 'নাম্নী' অংশের রচনাগুলিতে কবি নারী-ব্যক্তিত্বের যে রসঘন চিত্র এঁকেছেন সেখানে ভাষা স্থানে স্থানে প্রতীক ধর্মী হয়েছে। এখানে কাব্যিক ক্রিয়াপদের অধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

এখানেও কবি পুরনো রীতির সমিল ছন্দই ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ কবিতাতেই প্রত্যেক চরণের শেষে অন্ত্যমিল বজায় রেখেছেন। মিলগুলির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। স্তবকগুলির আকার সর্বত্র এক নয়, ভাব অনুযায়ীই স্তবকগুলি গঠিত হয়েছে।

পরিশেষ-এ নিগূঢ় আত্ম-অন্বেষণের সুর শোনা গেছে। স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের শিল্পরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'বিচিত্রা', 'বিস্ময়',

'প্রতীক্ষা', 'প্রশ্ন', 'প্রবাসী' ও 'নূতন' প্রভৃতি কবিতাগুলির উল্লেখ করা যায়। পরিশেষ-এ কবি যৌক্তিক মুক্তক ছন্দ এবং স্থানে স্থানে সমিল মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের ব্যবহার করেছেন। সমিল মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দের দৃষ্টান্ত হল 'প্রশ্ন' কবিতা।—

ভগবান, তুমি | যুগে যুগে দূত | পাঠায়েছ বারে | বারে
দয়াহীন সং | সারে—
তারা বলে গেল | 'ক্ষমা করো সবে,' | বলে গেল 'ভালো | বাসো—
অন্তর হতে | বিদ্বেষবিষ | নাশো'।
বরণীয় তারা, | স্মরণীয় তারা, | তবুও বাহির | দ্বারে,
আজি দুর্দিনে | ফিরানু তাদের | ব্যর্থ নমস্ | কারে।

বীথিকা-য় কবির দার্শনিক মনন ও জীবনজিজ্ঞাসা রূপায়িত হয়েছে। এখানে কবি আবার রোমান্টিক রীতিকে গ্রহণ করে সমিল ছন্দ ব্যবহার করেছেন। দার্শনিকতার সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে। বর্ণনীয় বিষয় বা অনুভূতিকে কবি অপূর্ব বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে চিত্ররূপ দিয়েছেন। বীথিকা কাব্যের আগে ও পরে রয়েছে গদ্য-ছন্দে লিখিত কবিতা, কিন্তু বীথিকা-র কবিতাগুলি সমিল। তাই আঙ্গিকের দিক থেকে বীথিকা-র কবিতাগুলিকে পৌর্বাপর্যহীন বলে মনে হতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ রোমান্টিক কবি, তাঁর আবেগ উচ্ছ্বাসকে সব সময় গদ্য-কবিতার সংযম এবং পরিমিতি বোধের আধারে পরিবেশন করা যায় না। গদ্য-কবিতায় যতখানি মুক্তি ও পরিমিতি বোধ আছে ততখানি উচ্ছ্বাস বা আবেগপ্রবণতা নেই। কবির তৎকালীন অনুভূতিগুলি গদ্য-ছন্দে প্রকাশের উপযোগী নয় বলেই হয়ত কবি এই নৃত্যচপল পদ্য-ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। কল্পনাকে গতিশীল করতে কবি এখানে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার করেছেন। বীথিকা-র 'নিমন্ত্রণ' একটি শিল্প-সার্থক অবিস্মরণীয় কবিতা।

জীবনান্ত সম্মুখীন শান্ত চেতনায় এবং আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারে কবি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারই প্রকাশ প্রান্তিক-এর কবিতাগুলিতে। কবিতাগুলি অন্ত্যমিলহীন, কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত। কবি গদ্য-কবিতার ছন্দোরীতি এই কাব্য থেকেই ত্যাগ করেছেন। বলাকা-য় কবি যে নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট ছন্দ-বন্ধনের রীতি ভেঙে মুক্তক ছন্দের সৃষ্টি করেছিলেন, এখন থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রতিটি কাব্যেই কবি এই ছন্দের ব্যবহার

করেছেন। প্রান্তিক-এর সর্বাপেক্ষা রসোত্তীর্ণ কবিতা হল 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের' ইত্যাদি কবিতাটি। এটি সাত জোড়া মহাপয়ারের সমষ্টি।

সেঁজুতি-র অধিকাংশ কবিতা নিজের জীবন-সন্ধ্যাকে কেন্দ্র করে। সেদিক থেকে কাব্যটি সার্থকনামা, সেঁজুতিও প্রান্তিক-এর ন্যায় একই ছন্দে লিখিত। এই কাব্য দুটির শিল্পরূপ স্থানে স্থানে নিষ্প্রভ এবং বৈশিষ্ট্যহীন।

আকাশ-প্রদীপ-এ আবার কবির শিল্পরূপ-সৃষ্টির একটি উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কবির ক্ষণ-আচ্ছন্ন শিল্পচেতনা আবার জীবনের রস-রহস্যের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের 'বধূ' ও 'শ্যামা' দুটি অনবদ্য সৃষ্টি। এখানে ভাষা স্নিগ্ধ, সহজ ও ব্যঞ্জনাময়। এখানে শব্দ-সমাবেশ সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় এবং ধ্বনি-সৃষ্টি অভিনব। আকাশ-প্রদীপ-এর অধিকাংশ কবিতা স্মৃতিমূলক। আকাশ-প্রদীপ জ্বালিয়ে স্মৃতির আকাশে চেনা মুখের অন্বেষণ করলেও প্রতিটি কবিতাই কবির পরিণত জীবনের মনন-কল্পনায় সমৃদ্ধ।

ছন্দোময় বাকৃরীতির প্রতি কবির চিরকালীন আকর্ষণ। আকাশ-প্রদীপ-এর সর্বত্রই অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়েছে। 'ময়ূরের দৃষ্টি' এবং 'কাঁচা আম' নামক কবিতা দুটি কেবল গদ্য-ছন্দে লেখা।

এর ঠিক পরবর্তী কাব্য নবজাতক-এ কবির শিল্পচেতনার কোন মহৎ পরিচয় পাওয়া যায় না। কবির অস্তাচলগামী স্তিমিত চেতনায় বিশ্বজীবনের যে রহস্য রূপ ফুটে উঠেছে, কবিতাগুলিতে তা শান্ত সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কবির অন্যান্য কবিতার মত সূক্ষ্ম আভাসন-শক্তি নেই। নবজাতক-এর কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিরলংকার স্বল্প-ভাষণ। এখানে কল্পনাশক্তির উপর রবীন্দ্রনাথের মনন ও বক্তব্যের স্পষ্টতা জয়লাভ করেছে।

সানাই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক শিল্পচেতনার এক বিস্ময়কর পরিচয় পাই। এখানে যেন সেই রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ আবার ফিরে এসেছেন। এই কাব্যে ছন্দের সূক্ষ্ম রণিত স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপে অতিগভীরের দ্যোতনা এবং কল্পনায় সূক্ষ্ম বর্ণালির সৃষ্টি হয়েছে। অশীতিপর কবির এই কল্পনা-তারুণ্য বিস্ময়কর। রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয় এই সানাই-এ।

এই কাব্যগুলির অলংকারগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পূর্ববর্তী পর্বগুলি অপেক্ষা এখানে অলংকারের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। পূরবী-তে মোট [illegible]টি কবিতায় ২৫৬টি অলংকার ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে

সাদৃশ্যমূলক অলংকার ২৩৩টি। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় অতীতচারণার ভাবটি প্রধান, তাই চিত্ররচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যমূলক অলংকারের প্রাধান্য। এদের মধ্যে আবার সমাসোক্তির বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। অন্যান্য কাব্যের তুলনায় এখানে স্বভাবোক্তি অলংকারও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

একটি সমাসোক্তির উদাহরণ 'বিজয়ী' কবিতায়—

ভাবল তারা, এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রাণীর দুর্গপ্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি ;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

স্বভাবোক্তি অলংকারের উদাহরণ 'আহ্বান' কবিতায়—

নিঃশব্দচরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে ;
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্তহস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে।

মহুয়া কাব্যের অলংকারগুলিও সুন্দর। এখানে কবি ৮৩টি কবিতায় ১৪৭টি প্রধান অলংকার ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ১৩৯টি সাদৃশ্যমূলক অলংকার। সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে অন্যান্য কাব্যের তুলনায় এই কাব্যে উৎপ্রেক্ষা অলংকার বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। মহুয়া কাব্যে প্রণয়ের সাধনবেগের ন্যায়, প্রণয়ের প্রসাধনকলার চিত্রও কবি অঙ্কন করেছেন এবং এক্ষেত্রে প্রকৃতির একটি বড় ভূমিকা আছে। এইটিই মহুয়া-য় সমাসোক্তি অলংকারের বহুল প্রয়োগের কারণ বলে মনে হয়।

একটি সমাসোক্তির উদাহরণ 'বোধন' কবিতায়—

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন-ভরে—
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয়সংগীতস্বরে।

নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে ॥

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল—
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরী।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী ॥

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার 'বরযাত্রা' কবিতায়—

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন দুর্গম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে ॥

বনবাণী উদ্ভিদ্-জীবনের বন্দনা ও প্রশস্তি কাব্য। স্বভাবতই এখানে সমাসোক্তি অলংকারের সংখ্যা অন্যান্য অলংকারের তুলনায় বেশি। এই কাব্যের ১৪টি কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অলংকারের সংখ্যা ৩৫টি। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রূপক অলংকার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায়—

ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা,·····।

পরিশেষ-এ প্রৌঢ় কবি কবিতায় আত্ম-বিশ্লেষণ করেছেন। দূর শৈশবের দিকে স্বপ্নমুগ্ধ দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়েছেন। এই কাব্যে সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি

এবং ভাবিক অলংকারের বেশি ব্যবহার হয়েছে। এই কাব্যে মোট ৯৭টি কবিতায় ১৪২টি প্রধান অলংকার আছে; তার মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারের সংখ্যা হল ১২৮টি। 'প্রণাম' কবিতায় ব্যবহৃত একটি রূপক অলংকার—

··· মহামৌন পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে,
তুলিল হিল্লোলদোল। ··

একটি অপূর্ব সমাসোক্তির উদাহরণ 'আহ্বান' কবিতায়—

পাষাণ ভিত টলিছে যেথা, ক্ষিতির বুক ফাটি
ধূলায়-চাপা অনলশিখা কাঁপায়ে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি,
সেথায় ভেরি বাজাও বারে বারে।

'পুরানো বই' কবিতায় সার্থক 'ভাবিক' অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

বীথিকা-য় কবি গদ্যছন্দের চর্চার পর আবার তাঁর পূর্বযুগের কাব্যের ন্যায় ছন্দ ও রূপের জগতে প্রবেশ করেছেন। অলংকরণেও এই বর্ণসমাবেশ চোখে পড়ে। বীথিকা-র ৭৮টি কবিতায় ৮২টি উল্লেখযোগ্য অলংকার ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলংকার ৭১টি। শেষ পর্যায়ের কাব্যে কবি বর্ণ-সৌন্দর্যে মনোহর বহু উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করেছেন যেগুলি তাঁর সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি যুগের উৎপ্রেক্ষার সমতুল। কিন্তু বীথিকা-য় উৎপ্রেক্ষার সংখ্যা কম। রূপক অলংকারগুলিতেও খুব নূতনত্ব নেই। তবে কোন কোন স্থানে উপমান কল্পনার নূতনত্বে রূপক অলংকারগুলি বিশেষত্ব অর্জন করেছে। যেমন, 'নাট্যশেষ' কবিতায়—

সেই সুখ দুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুমকির কাজে বিঁধে আলোকের সূচি;

উপমা সৃষ্টিতে কবির অপূর্ব নৈপুণ্য দেখা যায়। অতি সাধারণ উপমানের সাহায্যে কবি বর্ণনীয় বিষয়কে উপভোগ্য করে তুলেছেন 'নিমন্ত্রণ' কবিতায়—

পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিকণ চুলে।

'গীতচ্ছবি' 'ছুটির খেলা' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে উপমাগুলি এবং 'কাঠবিড়ালি' ও 'গরবিনী' কবিতার মালোপমা অলংকারগুলি উল্লেখযোগ্য। বীথিকা-রূ

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারটির মধ্যে কবির তীব্র অনুভূতি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে 'নিমন্ত্রণ' কবিতায়।—

আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা।

এই কাব্যের স্বভাবোক্তি অলংকারগুলিও উল্লেখযোগ্য। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন, 'মুক্তি' কবিতায়—

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কচি ধান খেতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে দুলিয়াছে ঊষার অলক।

প্রান্তিক কাব্যের কবিতার সংখ্যা মাত্র ১৮টি। মোট অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে ৩৫টি, তার মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারের সংখ্যা ৩১টি। প্রান্তিক রচনাকালে কবির চৈতন্যলোকে এক বিরাট পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে। এখানে মনন প্রাধান্য পাওয়ার জন্য অলংকরণ গৌণ হয়ে গেছে। তবে কোন কোন উপমায় সৌন্দর্যের চকিত-চমক লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৫ সংখ্যক কবিতায়—

··· অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।···

সেঁজুতি কাব্যটিও বৃহৎ নয়। এখানে ২৩টি কবিতায় উল্লেখযোগ্য অলংকারের সংখ্যা ৩৩ এবং সাদৃশ্যমূলক অলংকার ৩১টি। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে কবির অস্তাচলমুখী ম্লানচেতনার ছায়া পড়ছে। অলংকরণের ক্ষেত্রেও তাই কবি গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তবু কোন কোন উপমা বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। যেমন, 'জন্মদিন' কবিতায়—

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন ; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে ;
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা-সম—
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা॥

আকাশ-প্রদীপ-এর কবিতাগুলি মূলতঃ স্বপ্নময় ও স্মৃতিবহ। গভীর

মননশীলতা এবং পরিণত অভিজ্ঞতার ছাপ কবিতাগুলির সর্বত্র। ২২টি কবিতায় মোট ২৭টি উল্লেখযোগ্য অলংকার ব্যবহার করা হয়েছে। এদের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারের সংখ্যা ২৫টি। এই কাব্যের কয়েকটি রূপক এবং উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টির দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যায়। যেমন, 'জল' কবিতায় ব্যবহৃত একটি রূপক অলংকার—

গান নাই, শব্দের তরণী হোথা ডোবা,
প্রাণ হোথা বোবা।

'শ্যামা' কবিতায় ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষা—

কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা।···

'সময়হারা' কবিতায়—

সময় আমার গেছে বলেই জানার সুযোগ হল
কলুদ ফুল যে কাকে বলে, ঐ যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে।

নবজাতক কাব্যকে কবি নিজেই তাঁর প্রৌঢ় ঋতুর ফসল বলে উল্লেখ করেছেন। কবিতাগুলিতে মননজাত অভিজ্ঞতাই প্রধান হয়েছে বলে অলংকরণে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় না। ৩৫টি কবিতায় উল্লেখযোগ্য অলংকারের সংখ্যা ৪২টি। এদের মধ্যে 'রাতের গাড়ি' কবিতার রূপক-কল্পনা বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে—

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

সানাই শেষ পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট কাব্য। এই কাব্যের ৫৯টি কবিতার উল্লেখযোগ্য অলংকার-সংখ্যা হল ৭৮টি। এর মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলংকার ৬৮টি। এই কাব্যে কবির রোমান্টিকতা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; তাই অলংকারগুলিরও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। অলংকারগুলির স্থানে স্থানে কবির আধুনিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'বাসাবদল' কবিতার একটি উপমা অলংকার—

যেতেই হবে।
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা।

একাধিক স্থানে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক রূপসৌন্দর্য সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'হঠাৎ-মিলন' কবিতায় ব্যবহৃত একটি উপমা অলংকার—

দ্বিধায়-ছোঁওয়া তোমার মৌনীমুখে
কাঁপতেছিল সলজ্জ কৌতুকে
আঁচল-আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি,
নিবিড় সুখের বেদন দেহে উঠছিল নিশ্বাসি।

সানাই কাব্যে উৎপ্রেক্ষা-সৃষ্টিও পরম রমণীয়। যেমন, 'আসা-যাওয়া' কবিতায়—

তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন—
দূরপথে তার দীপশিখা,
একটি রক্তিম মরীচিকা।

এই কাব্যের স্বভাবোক্তির চিত্রও অতি উজ্জ্বল। 'অনসূয়া' এবং 'অপঘাত' কবিতায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এই বিভাগে যে কাব্যগুলিকে স্থাপন করা হয়েছে সবগুলি সমধর্মী না হলেও ছন্দের দিক থেকে প্রত্যেকেরই অন্ত্যমিল বজায় আছে; সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য এগুলিকে একত্র করা হয়েছে। কাব্যগুলির প্রবণতা ভিন্ন হওয়ায় চিত্রকল্পগুলির মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কবি এই কাব্যগুলির মধ্যে তিন ধরনের চিত্রকল্পেরই প্রয়োগ করেছেন। সর্বত্রই স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। নীচে কয়েকটি সরল চিত্রকল্পের উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন, পূরবী কাব্যের 'আশা' কবিতা—

গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।

মহুয়া কাব্যের 'শ্যামলী' কবিতা—

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে ;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে ;
নুয়ে-পড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে
ছোটো ক'রে রাখে আকাশেরে।

বীথিকা কাব্যের 'ছুটির লেখা' কবিতা—

মর্মরিত শ্যামল বনের কাঁপন থেকে
চমকে নামে আলোর কণা আলগা চুলে ;
তাকিয়ে দেখে নদীর রেখা চলেছে বেঁকে—
দোয়েল-ডাকা ঝাউয়ের শাখা উঠছে দুলে।
সম্মুখে তার বাগান-কোণায় কামিনী ফুল
আনন্দিত অপব্যয়ে পাপড়ি ছড়ায়।
বেড়ার ধারে বেগনিগুচ্ছে ফুল্ল জারুল
দখিন-হাওয়ার সোহাগেতে শাখা নড়ায়।

সেঁজুতি কাব্যের 'চলতি ছবি' কবিতা—

দেখে গেলেম গ্রামের মেয়ে কলসি-মাথায়-ধরা,
রঙিন-শাড়ি-পরা,
দেখে গেলেম পথের ধারে ব্যাবসা চালায় মুদি,
দেখে গেলেম নতুন বধূ আধেক দুয়ার রুধি
ঘোমটা থেকে ফাঁক ক'রে তার কালো চোখের কোনা
দেখছে চেয়ে পথের আনাগোনা।
বাঁধানো বট গাছের তলায় পড়তি রোদের বেলায়
গ্রামের কজন মাতব্বরে মগ্ন তাসের খেলায়।
এইটুকুতে চোখ বুলিয়ে আবার চলি ছুটে,
এক মুহূর্তে গ্রামের ছবি ঝাপসা হয়ে উঠে।

আকাশ-প্রদীপ কাব্যের 'ধ্বনি' কবিতা—

বটগাছ হতে বাঁকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সাঁতার-কাটা জলে

সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাতো আলোর কিলিবিলি।

সানাই কাব্যের 'স্মৃতির-ভূমিকা' কবিতায়—

সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা-অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায়।
হোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইশারা
পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষার। নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক্।

এই কাব্যগুলিতে জটিল চিত্রকল্পেরও প্রচুর সার্থক সৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়

পূরবী কাব্যের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায়—

দিগন্তে আরক্ত রবি ;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যানভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

মহুয়া কাব্যের 'বরযাত্রা' কবিতা—

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন্ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে॥

বনবাণী কাব্যের 'শাল' কবিতা—

··· স্নান করি আলোকের স্রোতে
শুনি নিলে নীল আকাশের শান্তিবাণী ; তার পরে

আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি,—বৎসরে বৎসরে
বিশ্বের প্রকাশযজ্ঞে বারম্বার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হতে অফুরান
পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল উর্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দূর শতাব্দীরে
শুনাতে মর্মর আশীর্বাণী।···

পরিশেষ কাব্যের 'প্রণাম' কবিতা—

··· ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে,···

বীথিকা কাব্যের 'নিঃস্ব' কবিতা—

আরেক দিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে।
দখিনবায়ে তরুণ ফাল্গুনে
শ্যামল বনবল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন দিল পাতি ;
মর্মরিত প্রলাপবাণী কহিল সারারাতি।

প্রান্তিক কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতা—

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু ; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার ;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমি-পানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চির প্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা—
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বদ্ধপ্রায়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ। তাই কাব্যগুলির স্থানে স্থানে গূঢ়ার্থব্যঞ্জক চিত্রকল্পের অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি এই পর্যায়ের চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হল।

পূরবী কাব্যের 'তপোভঙ্গ' কবিতা—

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।

পরিশেষ কাব্যের 'জন্মদিন' কবিতা—

রবিপ্রদক্ষিণ পথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
লহো মালাখানি।

প্রান্তিক কাব্যের ৫ সংখ্যক কবিতা—

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেমভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন্ গুন্ গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে।

সেঁজুতি কাব্যের 'জন্মদিন' কবিতা—

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম

আকাশ-প্রদীপ কাব্যের 'কাঁচা আম' কবিতা—

সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে

নবজাতক কাব্যের 'কেন' কবিতা—

কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তরে দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—

রবীন্দ্রনাথের অলংকার-প্রয়োগ নৈপুণ্য অসাধারণ, তাই প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর চিত্রকল্পগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে। এগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু জটিল বা দুর্বোধ্য নয়, তাই পাঠকের কাছে কবিতাগুলির আবেদন অব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকীর্তির গুণগত উৎকর্ষ অতুলনীয়। বিভিন্ন ভাবানুভূতির সার্থক প্রকাশ দেখা যায় বিচিত্র কাব্যরূপের মধ্যে। তাঁর কাব্যের আঙ্গিকের আলোচনায় কিছু কিছু বিস্ময়কর অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ে। যে সময় তাঁর কাব্য রূপরীতির দিক থেকে সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করেছে, সেই একই সময় কিছু কিছু অনৈপুণ্যের ছাপও রয়ে গেছে স্থানে স্থানে। গুণগুলির পাশাপাশি ত্রুটিগুলিকে উল্লেখ না করলে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে না। রচনাগত অসাফল্যের অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে একথা সত্য, সৃষ্টিশীল কুলপ্লাবী আবেগ সব সময় form-এর বশ্যতা স্বীকার না-ও করতে পারে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আঙ্গিকে যে অসঙ্গতিগুলি দেখা যায় তার কারণ এই-ই। কবির জীবনের সব পর্যায়ের কাব্যেই এগুলি বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য—যেখানে তিনি শিল্পরূপ সৃষ্টির চরম সিদ্ধিলাভ করেছেন, সেখানেও রচনাগত অসাফল্য বিরল নয়।

রবীন্দ্রকাব্যের গঠনসৌষ্ঠবে স্থানে স্থানে যে দুর্বলতাগুলি দেখা যায় তার মধ্যে একটি হল প্রয়োজনাতিরিক্ত বিস্তার। শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির একটি মহৎ গুণ হল এর দৃঢ় সংহত রূপ। কিন্তু কবি সর্বত্র গঠনের এই সংহতি বজায় রাখতে পারেন নি। স্থানে স্থানে কবির এই প্রবণতা কাব্যের শিল্প-সার্থকতা লাভের পথে বাধাস্বরূপ হয়েছে। কবির সব পর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে এই অবাঞ্ছিত বিষয়টি বর্তমান। পূরবী কাব্যের শিল্পগত উৎকর্ষ অনস্বীকার্য, তবুও অনেক মহৎ কবিতায় কবি যথার্থ সংহতি বজায় রাখতে পারেন নি। গদ্য-কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি, কিন্তু এগুলিও এই ত্রুটিমুক্ত নয়। গদ্য-কাব্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় দুর্বলতা পুনশ্চ-এ সর্বাধিক। নীচে কয়েকটি কাব্য থেকে উদাহরণ দেওয়া হল।—

পূরবী কাব্যের 'আহ্বান' কবিতা—

> অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
> নিতে হল তুলে।
> রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
> মরণের কূলে।

স্তবকটিতে কবির বক্তব্যের যথাযথ গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে পরের চারটি পঙ্‌ক্তি। কাব্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তিতেই ধরা পড়েছে কিন্তু পরবর্তী অংশের বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়। স্তবক বিন্যাসে পঙ্‌ক্তি কয়টির প্রয়োজন থাকলেও আর্টের বিচারে কিছু দুর্বলতা দেখা যায়। পঙ্‌ক্তি কয়টি হল—

সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নবজন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী।

পূরবী কাব্যের 'দান' কবিতাটিতেও কবির এই অতিবিস্তারের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। 'দেওয়া' এবং 'নেওয়া' সম্বন্ধে কবির অভিমত দুটি স্তবকের পরিবর্তে একটি স্তবকেই সংহত রূপে প্রকাশ করা যেত। কবিতাটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তবক দুটি পড়লেই এই মন্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে। মহুয়া কাব্যের 'প্রকাশ' কবিতা—

প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার।
বহিতেছি অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে।

উদ্ধৃত অংশটির শেষ চার পঙ্‌ক্তি অনাবশ্যক বলেই বোধ হয়। সমগ্র কবিতাটিতে কবির আত্মপ্রকাশের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত তা সম্পূর্ণতা পেয়েছে শেষ চার পঙ্‌ক্তির আগেই।

গদ্য-কবিতার মধ্যে পুনশ্চ-র কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কাব্যের অনেক কবিতায় এই অতিবিস্তারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ 'কোপাই', 'ছেঁড়া কাঁথা' ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। শেষ সপ্তক-এ কবি গদ্যছন্দ রচনায় অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, কিন্তু অতিভাষণ এখানেও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি। যেমন, শেষ সপ্তক-এর এক সংখ্যক কবিতা—

আজ তুমি গেছ চ'লে,

দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

কবিতাটির এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেই কবির উদাসীন বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরবর্তী দুটি পঙ্‌ক্তির সংযোজনে বক্তব্যের আবেদন লঘু হয়ে গেছে। পঙ্‌ক্তি দুটি হল—

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।

এই পঙ্‌ক্তি দুটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় হয়ত পাওয়া যায়; কিন্তু আর্টের বিচারে এগুলিকে বাহুল্য বলেই মনে হয়। এই কাব্যেরই তের এবং আটাশ সংখ্যক কবিতার শেষ স্তবক সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। পত্রপুট এবং শ্যামলী কাব্যের শিল্পসাফল্য অসামান্য তবু কোন কোন স্থানে এই অসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন, শ্যামলী কাব্যের 'দ্বৈত' কবিতাটির প্রথমার্ধ দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ এবং শেষার্ধ অতি বিস্তৃত এবং পুনরাবৃত্তিতে পূর্ণ।

চিত্রকল্পের (ইমেজ) ব্যবহারও সর্বত্র ত্রুটিমুক্ত নয়। রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম ঐশ্বর্য হল এর বহুবিচিত্র চিত্রকল্প। কিন্তু স্থানে স্থানে এই চিত্রকল্পের অত্যধিক ব্যবহার রচনার ভারস্বরূপ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পূরবী কাব্যের 'যাত্রা' এবং 'সাবিত্রী' কবিতা দুটিতে চিত্রকল্পের অত্যধিক ব্যবহারে কবিতার আবেদনে আড়ষ্টতা এসেছে। আবার 'ক্ষণিকা' কবিতার শেষ স্তবকে ব্যবহৃত চিত্রকল্প একটু কষ্টকল্পিত মনে হয়। 'আনমনা' কবিতাটির লালিত্য যদিও অসামান্য তবুও একটি চিত্রকল্প রচনায় অত্যধিক অলংকার প্রবণতার প্রভাব দেখা যায়। যেমন,

ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল-বিছানো ভূঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে;

পুনশ্চ কাব্যের 'নাটক' কবিতাতে অত্যধিক চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—

এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ-বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেইরকমটা।
তবুও ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে টলমল ক'রে কলম চলছে,
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।
তবু শেষ করব এ চিঠি,
কুয়াশার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে,
কল বন্ধ করে না।

বীথিকা কাব্যের একটি কবিতা 'মাটিতে-আলোতে'। এটি শেষ পর্যায়ের কাব্যে একটি উজ্জ্বল সংযোজন। কিন্তু এখানেও একটি দীর্ঘ চিত্রকল্পের ব্যবহার ছন্দোগত শৈথিল্য সৃষ্টি করেছে।—

অপরাহ্ণ কাল
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পাণ্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্বী তরী গতির বিদ্যুতে
হেলে পড়ে যে রহস্য সে ভঙ্গীটুকুতে.

শেষ পর্যায়ের কাব্যে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথ আঠারো অক্ষরের দীর্ঘতর পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। পূরবী ইত্যাদি কাব্যে এই জাতীয় ছন্দবিন্যাস দ্বারা তিনি অনেক শিল্পসার্থক কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি রয়ে গেছে কিছু অসাফল্য। পূরবী কাব্যের 'সমুদ্র' কবিতা—

রাত্রিবেলা ; মনে হল, গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার

পরিশেষ কাব্যের 'প্রণাম' কবিতা—

আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে

বলাকা কাব্যে কবি মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করেন। এই ছন্দে রচিত কবিতায় অসম দৈর্ঘ্যের পঙ্ক্তি ব্যবহৃত হয়। বলাকা পর্বের পরেও কবি এই রীতি অনেক কাব্যে প্রয়োগ করেন। শেষ পর্যায়ের কাব্যে কোন কোন স্থানে এই

ধরনের পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে কবি সার্থক শিল্পরূপ সৃষ্টি করেছেন। যেমন, আকাশ-প্রদীপ কাব্যের 'বধূ', 'শ্যামা' প্রভৃতি কবিতা। কিন্তু কোন কোন স্থানে অতিখণ্ডিত পঙ্‌ক্তির অত্যধিক ব্যবহার কাব্যের আঙ্গিকগত ত্রুটির কারণ হয়েছে। যেমন, পূরবী কাব্যের 'লিপি' কবিতা—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন।

পূরবী কাব্যের 'শেষ' কবিতা—

হে ভীষণ, তব স্পর্শঘাত
অকস্মাৎ

মহুয়া কাব্যের 'প্রত্যাশা' কবিতা—

প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি
'এসেছে কি'।

বীথিকা কাব্যের 'ধ্যান' কবিতা—

তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।
নাই সৃষ্টিধারা,
নাই রবি শশী গ্রহতারা ;

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে বহু জায়গায় পঙ্‌ক্তি বিভাগের অযৌক্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। মুক্ত ছন্দে রচিত কবিতাগুলির পঙ্‌ক্তি বিভাগে যে সূক্ষ্ম বিরতি আসে অর্থাৎ ভাবানুযায়ী পঙ্‌ক্তি শেষ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রে এটা মানেন নি। ফলে স্থানে স্থানে ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়েছে। এটা বেশি দেখা যায় গদ্য-কবিতার ক্ষেত্রে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল বিভিন্ন কাব্য থেকে।—

পরিশেষ কাব্যের 'শূন্যঘর' কবিতা—

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই
না-থাকার ফিলজাফি

এখানে 'তাই' শব্দটি পরের পঙ্‌ক্তিতে বসালে অধিকতর যুক্তিযুক্ত হত। এই কাব্যেরই 'মিলন' কবিতা—

যত ব্যথা আঘাত করিছে তব পরম সত্তারে
অহরহ।

এখানে 'অহরহ' শব্দটিকে একই পঙ্‌ক্তিতে বসানো যেত।

শেষ সপ্তক কাব্যের ষোলো সংখ্যক কবিতা—

হাজার মনিবের পিণ্ড-পাকানো
ফরমাশটাকে বেদী বানিয়ে স্তূপাকার করে রাখে

এখানে পঙ্‌ক্তিটি শেষ হওয়া উচিত ছিল 'ফরমাশটাকে'-র পর। এই কাব্যেরই উনিশ সংখ্যক কবিতায়—

ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে
ভর-সন্ধেবেলায়,

একুশ সংখ্যক কবিতায়—

নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির
অগোচরে।

পূর্বোক্ত দুটি উদাহরণেই পরের পঙ্‌ক্তির শব্দটিকে আগের পঙক্তিতে বসানো যেত।

রবীন্দ্রকাব্যের স্থানে স্থানে আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, তা হল একই সঙ্গে সাধু ও চলিতের বিসদৃশ মিশ্রণ। গদ্য-কবিতায় এটা বেশি দেখা যায়। মুক্ত ছন্দে রচিত কবিতাগুলি এই ত্রুটি থেকে প্রায় মুক্ত। এই জাতীয় পঙ্‌ক্তির কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।—

পূরবী কাব্যের 'চাবি' কবিতা—

শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী,

পরিশেষ কাব্যের 'অন্তর্হিতা' কবিতা—

ব্যথার ছায়া পড়িত ছেয়ে
কালো চোখের কোণে।

শেষ সপ্তক কাব্যের পনের সংখ্যক কবিতা—

রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে;

বীথিকা কাব্যের 'মুক্তি' কবিতা—

দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে দুলিয়াছে উষার অলক।

পত্রপুট কাব্যের এক সংখ্যক কবিতা—

বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হল অট্টহাস্য।

শ্যামলী কাব্যের 'আমি' কবিতা—

বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার।

সেঁজুতি কাব্যের 'পত্রোত্তর' কবিতা—

শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রঙ অস্তরবির দেশে,

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যের ব্যাপক শিল্প-সাফল্যের পাশে এই অসমতা বিস্ময়কর। সব জাতীয় ছন্দেরই তিনি সুদক্ষ রূপকার। কিছু অসঙ্গতি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে এই পর্যায়ের কাব্যের শিল্প-সংগঠন অনবদ্য। অবিশ্রান্ত ভাবোচ্ছ্বাস এবং পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় রবীন্দ্রকাব্য বার বারই নূতন নূতন প্রকাশ রীতিকে আশ্রয় করেছে। শেষ পর্যায়ের স্বল্পভাষী দৃঢ় রচনাভঙ্গী ক্লাসিকাল সংহতির পরিচয় দেয়।

অষ্টম অধ্যায়

কাব্য-পরিচিতি

পূরবী

পূরবী কাব্য ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে পেরু গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন। প্রায় চার মাস পরে কবি দক্ষিণ আমেরিকা ও সেখান থেকে ইতালি হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পূরবী-র অধিকাংশ কবিতা এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ থেকে ২৪শে জানুয়ারী ১৯২৫-এর মধ্যে রচিত। 'শিলংয়ের চিঠি' থেকে 'বকুল বনের পাখি' পর্যন্ত সবগুলি কবিতাই ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে ফাল্গুনের ভেতর লেখা। কবি এই সময়ে রচিত কবিতাগুলির একত্রে নামকরণ করেছেন "পূরবী"। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে রচিত কবিতাগুলির নামকরণ করেছেন "পথিক"।

পূরবী গ্রন্থটি কবি 'বিজয়া'র করকমলে উৎসর্গ করেন। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে কবি স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য পেরু যেতে পারেন নি। আর্জেণ্টিনার কাছে Sam-Isidore নামে একটি বাগানবাড়িতে কবি অবস্থান করা মনস্থ করেন। এখানে Signore Vittoria de Estra da (ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো) নাম্নী একটি বিদূষী মহিলার সঙ্গে কবির আলাপ হয় এবং কবি এঁর সান্নিধ্যে সুস্থ ও আনন্দিত হয়ে ওঠেন। এই মহিলাও কবির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন। কবি এঁরই নামকরণ করেন 'বিজয়া'। পূরবী-তে এই 'বিজয়া'কে উপলক্ষ করে কয়েকটি কবিতা আছে। 'অতিথি' কবিতাটি তার মধ্যে অন্যতম—

> প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করে দিলে, নারী,
> মাধুর্য সুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি
> দূরদেশী পথিকেরে;

পূরবী রবীন্দ্রনাথের ষাটবৎসর উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর রচিত হয়। তাই এখানে সর্বত্রই বিদায়ের করুণ সুর শোনা গেছে। পূরবী-তে একদিকে কবি

নবরূপে সর্বজরানাশী যৌবনকে আহ্বান করেছেন, অন্যদিকে এই পরিচিত সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার চিন্তা তাঁকে বিষণ্ণ করেছে। এখানে অধিকাংশ কবিতাই বেদনাবিধুর। কিন্তু এই দুঃখ ও বেদনা শান্ত গাম্ভীর্য ও স্থৈর্যে মহিমান্বিত হয়েছে। কবি ফেলে-আসা যৌবনের দিনগুলির মধ্যে আবার প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই অনুভব করেছেন পূরবী-তে শেষ রাগিণীর বীণা বেজে উঠেছে।

পলাতকা-র শেষ কবিতাটির সঙ্গে পূরবী-র প্রথম কবিতাটি একই সুরে গাঁথা। পলাতকা-য় কবি কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায় ডুব দিয়ে 'আপন মানুষগুলির' স্পর্শ অনুভব করতে চেয়েছিলেন। পূরবী-র আরম্ভেও কবি দিনের আলো থাকতে থাকতে তাদের হাতে হাত দিয়ে গান গেয়ে নিতে চেয়েছেন।—

এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে, এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ-তরুর সনে।

দীর্ঘদিনের অধ্যাত্ম-সাধনা ও অতীন্দ্রিয় ভাবনা কবির সম্মুখে—মানবজীবন ও সৃষ্টির নিয়ত পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে কবি সচেতন, তবু ক্ষণিক জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখকে তিনি ভুলে যেতে পারেন নি। পূরবী কাব্যের প্রারম্ভিক কবিতা হিসাবে 'পূরবী' কবিতাটি গভীর অর্থবহ এবং সমগ্র কাব্যটির ভাবধারার ইঙ্গিতবাহী।

কবি জীবনকে আবার গভীর আবেগের সঙ্গে গ্রহণ করলেন ; কিন্তু কবির আয়ু শেষ হয়ে আসছে এবং জীবনে মৃত্যুদূতের অলক্ষ্য পদসঞ্চার তিনি অনুভব করেছেন। অতীতে বিগত যৌবনের দিনগুলিকে যে আর ফিরে পাওয়া যাবে না একথা তিনি স্পষ্ট অনুভব করে অতীত দিনের স্মৃতির মধ্য দিয়ে তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চাইলেন। আসন্ন সমাপ্তির পটভূমিকায় এই স্মৃতিচিত্র সৌন্দর্য ও বেদনায় মনোহর।

পূরবী-র কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়।
১. অতীত জীবনকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা, পৃথিবীর প্রতি নিবিড় আকর্ষণ : এই আসন্ন বিদায়ের পটভূমিকায় জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য উপভোগে

অনিবার্য পরিসমাপ্তি জনিত গভীর বেদনা। ২. আসন্ন মৃত্যুর ক্রম-অগ্রসরমান পদধ্বনির অনুভব।

১. এই ধারার কবিতাগুলির মধ্যে—'মাটির ডাক', 'পঁচিশে বৈশাখ', 'তপোভঙ্গ', 'লীলাসঙ্গিনী', 'শেষ অর্ঘ্য', 'বকুলবনের পাখি', 'ক্ষণিকা', 'খেলা', 'কৃতজ্ঞ', 'আগমনী', 'দোসর', 'আহ্বান', 'অপরিচিতা', 'আনমনা', 'বিস্মরণ', 'স্বপ্ন', 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়।

জীবনের নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ও নানা চিন্তায় কবির মন আবদ্ধ ছিল। তিনি প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য ও মাধুর্যময় জীবনকে পরিত্যাগ করে কৃত্রিম জীবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ জীবন-সায়াহ্নে কবি অনুভব করেছেন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর বন্ধন অচ্ছেদ্য—'মাটির ডাক'-এ বলেছেন—

বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।

কবি এতদিন 'দূরে ইঁটকাঠের পুরে বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে' দিন কাটিয়েছেন, 'নানা মতে নানান হাটে' হারানো আশ্রয়কে খুঁজেছেন। আজ আবার মাকে ফিরে পেয়েছেন—

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ ;
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।

এই সময়ে কবির দ্বি-ষষ্টিতম জন্মদিন নূতন তাৎপর্য বহন করে আনে। জীবন-সন্ধ্যায় 'পঁচিশে বৈশাখ' নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে—

পীত উত্তরীয়-তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে-সজ্জিত উপহার—

নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

'তপোভঙ্গ' কবিতাটি শেষ পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট কবিতা। কবিতাটি ভাবে আঙ্গিকে ধ্বনিমাধুর্যে অপূর্ব। কবি চিরকালই যৌবনের উপাসক। আজ জীবন-সায়াহ্নে তিনি সেই যৌবনের রসোচ্ছল দিনগুলিকে ফিরে পাওয়ার জন্য মহাকালের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

কালের অধীশ্বর মহেশ্বর সর্বত্যাগী ভোলা সন্ন্যাসী। তিনি কি কবির 'যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল দিনগুলি'র কথা ভুলে গিয়েছেন? বসন্তের কিংশুক মঞ্জরীর মত সেই দিনগুলি কি অযত্নে শূন্যে ভেসে গিয়েছে? 'স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায় নির্মম হেলায়' কি সেই যৌবন স্মৃতি-বিস্মৃতির ঘাটে ডুবে গেছে? একদিন এই যৌবনের দিনগুলিই ভোলানাথের রুদ্র রিক্ত রূপকে সৌন্দর্যে সাজিয়েছিল, ডম্বরু শিঙা কেড়ে নিয়ে হাতে মন্দিরা বাঁশি তুলে দিয়েছিল। সেদিন ভোলানাথের তপস্যা গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে শূন্য পানে ভেসে গেল। তাঁর ধ্যানের মন্ত্রটি ধরণীকে পুষ্পগন্ধে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। সন্ন্যাসের অবসানে মহেশ্বর আপন সৌন্দর্যের পরিচয় পেলেন এবং বিশ্বের ক্ষুধার জ্যোতির্ময় সুধাপাত্রটি আপন হাতে ধারণ করলেন। মহেশ্বরের এই নব সৌন্দর্যময় রূপই কবিহৃদয়ে রূপ রস ও সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু আজ সেই সুধার পানপাত্র কি মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল? কবির যৌবনের সেই লুপ্ত দিনগুলি কি 'নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিঃশ্বাসে' বিষণ্ন হয়ে গেল। কবির বিশ্বাস সে দিনগুলি লুপ্ত হয় নি; কারণ—

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।

কবিই মহেশ্বরের তপস্যা ভঙ্গ করবেন। কবি রিক্ততা ও শুষ্কতা দূর করে জীবনকে নব নব রূপ ও আনন্দে ভরিয়ে তোলেন।—

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

মহেশ্বরের তপস্যা ভেঙে যায়; অস্থিমালা খুলে যায়। চিতাভস্ম মুছে গিয়ে

ভালে পুষ্পরেণু মাখা, শুভ্রতনু রক্তাংশুকে ঢাকা হয়। বহুদিন বিচ্ছেদের পর আবার উমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়।—

কৌতুকে হাসেন উমা, কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-প্রাণে ;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরাণে !

এর মধ্য দিয়ে কবির মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কবি তারুণ্য ও যৌবনের নিত্য সাধক।

'আগমনী' কবিতায় কবি জীবন-সায়াহ্নে আবার যৌবনের আগমন অনুভব করেছেন। মাঘের শীতে পৃথিবী যখন ছিল শুষ্কপ্রায় জরাগ্রস্ত, তখন হঠাৎ তার বুকে বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। দক্ষিণ হাওয়ায় সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে বসন্তের আগমনবার্তা ঘোষিত হল। দোয়েল, শ্যামা, কোকিল কপোতের কণ্ঠে শোনা গেল বসন্তের গান, আমের বোলে দেখা দিল সুবাসের উচ্ছ্বাস, মাধবী, শিরীষ, কনকচাঁপা, বনমল্লিকা আনন্দে আকুল হয়ে উঠল। কবিও বার্ধক্যের জরাগ্রস্ত জীবনে যৌবন-বসন্তের উন্মাদনা অনুভব করলেন—

ওদের সাথে জাগ্‌ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্‌ সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর।
বনের তলে নবীন এল মনের তলে তোর।

জীবনের শেষ লগ্নে কবি সংসারের বিচিত্র কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রেম-সৌন্দর্যের আহ্বানে সাড়া দিতে চান—

আলোতে তোরে দিক-না ভরে ভোরের নবরবি,
বাজ্‌ রে বীণা বাজ্‌।
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্‌ রে দুলে কবি,
ফুরালো তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর-বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে, বাঁধন যাক টুটি।

'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটিতেও অনুরূপ ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। কবি বিগত জীবনের হারানো দিনগুলির স্পর্শ অনুভব করছেন। যৌবনের নিরুপমা

প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতা আজ জীবন-গোধূলিতে কবির দ্বারে উপস্থিত হয়ে আহ্বান জানিয়েছেন। জীবনের যে প্রিয়তমা তিনি কবিকে একা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, আজ আবার তাঁর পুরানো বন্ধুকে মনে পড়েছে, কিঙ্কিণী বাজিয়ে পূর্ব পরিচিত কণ্ঠে কবিকে আহ্বান করেছেন। তাঁর এলোচুল ও অঞ্চল হতে সেদিনের পরিমল কবিকে উতলা করেছে। এই লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে বিচিত্র লীলার কথা কবির মনে পড়েছে। কখনও তাঁর কঙ্কণঝংকারে কবির বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে, কখনও বাতাসে তাঁর ইশারা ভেসে এসেছে, কখনও আমের নব মুকুলের বেশে, কখনও নব মেঘভারে, বিচিত্র রূপে কবিকে ভুলিয়েছে। কিন্তু আজ অপরাহ্ণ বেলায় জীবনের দিন ফুরিয়ে এসেছে, বার্ধক্য কবিকে আচ্ছন্ন করেছে তবু আজ আবার নূতন করে লীলাসঙ্গিনীর প্রেম উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জাগছে। কবির হৃদয়ের এই সুতীব্র বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে কবিতাটিতে—

> দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
> সারা হয়ে এল দিন।
> বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
> শেষ রাগিণীর বীন।
> এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
> হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
> আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
> গানহারা উদাসীন।

তবে কবি এই চিন্তায় স্থিতি লাভ করেছেন যে মৃত্যুর নিশীথ অন্ধকারে গোপন-রঙ্গিণী, রস-তরঙ্গিণী, লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে—

> এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
> নিশীথ-অন্ধকারে।
> মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
> অমাবস্যার পারে ?

'শেষ অর্ঘ্য' নামে এই সনেটকল্প কবিতাটিতেও এই কথা। যে কবিকে প্রত্যুষের মাহেন্দ্রক্ষণে শান্তকণ্ঠে প্রথম নিশান্তের বাণী শুনিয়েছিল, নিখিলের আনন্দমেলায় স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডেকে এনেছিল সে আজ কবির জীবন থেকে

কোথায় আত্মগোপন করেছে। এই জীবন-সন্ধ্যায় তার জন্য কবির মন উতলা হয়েছে—

এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

'বকুল-বনের পাখি' কবিতার মধ্যেও সেই অতীত জীবনের স্মৃতির কথা। অতীতে যারা কবির জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, আজ তারা 'কাজের কক্ষকোণে' কবিকে ইঙ্গিত করছে। 'বকুল-বনের পাখি'কে কবি জিজ্ঞাসা করছেন যে একদিন তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু—তাঁর গানের সাথী ছিল। আজ কবির জীবন শেষ হয়ে এসেছে, কবিকে কি তার মনে আছে—

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে নাকি।
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার
খেয়ালখেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও হে আমার
সুরের সুরার সাকী।

'আহ্বান','কৃতজ্ঞ','খেলা','ক্ষণিকা' ইত্যাদি কবিতায়ও একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এই কবিতাগুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখা যায় কবি অতীত যুগের প্রেমে সৌন্দর্যে উচ্ছল দিনগুলিকে ফিরে পেতে চেয়েছেন। সেই পুরানো দিনের স্মৃতি কবিকে ব্যথিত করেছে, আনন্দিত করেছে। আজ বার্ধক্যের দ্বারে উপস্থিত হয়ে কবি বুঝেছেন সেই দিনগুলিকে ফিরে পাবার উপায় নেই। এই বেদনার রেশ প্রতিটি কবিতাতেই উপস্থিত।

২. এই গুচ্ছে কবিতাগুলিতে কবি মৃত্যুকে নানাভাবে অনুভব করেছেন। মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। এই বিদায়ের চিন্তা নানা কবিতায় নানাভাবে উপস্থিত। 'যাত্রা', 'উৎসবের দিন', 'ঝড়', 'পদধ্বনি', 'শেষ', 'অবসান', 'মৃত্যুর আহ্বান', 'সমাপন', 'বৈতরণী', 'কঙ্কাল', 'অন্ধকার', প্রভৃতি কবিতায় তাঁর মৃত্যু-চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিটি কবিতাতেই কবি মহাযাত্রার কথা বলেছেন। সমগ্র প্রকৃতি জগতেও দেখেছেন 'তারা মরণকূলের উৎসবে ছুটেছে দলে দলে'। কবি উৎসবের মধ্যেও 'অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি' শুনেছেন আজ। কবি যাত্রার জন্ম প্রস্তুত। তাঁর কোন ভয়, কোন সংশয় নেই, কারণ তিনি জানেন অখণ্ড জীবন-

প্রবাহে বার বারই আসে পরিবর্তন। পুরাতন ভেঙে যায়, সৃষ্টি হয় নূতনের। 'পদধ্বনি' কবিতায় বলেছেন—

হোক তাই,
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার!
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা,
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা;

'শেষ' কবিতাতেও বলেছেন মৃত্যুই শেষ নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পরিবর্তন ও নব নব সৃষ্টি সম্ভব হয়। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরপারে তারা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই ধারণার প্রকাশ 'বৈতরণী' কবিতায়।

'কঙ্কাল' কবিতাটির মধ্যে সুন্দরভাবে কবির মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। একটা পশুর কঙ্কাল দেখে কবির মনে হয়েছে মানুষের পরিণাম বুঝি এরই মতো। কিন্তু কবি তা বিশ্বাস করেন না। তিনি তো শুধুমাত্র জড়দেহধারী পশু নন, তিনি জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তিনি কবি সুন্দরের উপাসক। তাঁর এই অসীম সৌন্দর্য সাধনার বিনাশ তো দেহের বিনাশের সঙ্গে হবে না।—

যা পেয়েছি, যা করেছি দান,
মর্তে তার কোথা পরিমাণ?
আমার মনের নৃত্য কতবার জীবনমৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চির সুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল-তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে।

... .

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।

পূরবীর-কবিতাগুলি আনন্দে বেদনায় একটি ভিন্ন স্বাদের সৃষ্টি করেছে। পূরবীর-ছন্দে কবি শেষ রাগিণীর বীণা বাজালেও আমরা তাঁর চির-সন্ধানী,

চির নবীন প্রতিভার পরিচয় এখানেই পাই। এই বিষণ্ণতার মধ্যেও কবির নবসৃষ্টি ও নবরূপে জীবনকে অনুভব লক্ষ্য করা যায়।

মহুয়া

এই কাব্যগ্রন্থটি ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। মহুয়া কাব্যটি রচনার একটি ইতিহাস আছে। পাঠ-পরিচয়ে এর উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন—"অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। সেই সময়ে কথা হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষে উপহার দেওয়া যায় এরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল। এইসব কবিতাই এখন 'মহুয়া' নামে বাহির হইতেছে। ইহার কিছু পূর্বে, ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে 'শেষের কবিতা' নামে উপন্যাসের জন্য কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও এইসঙ্গে ছাপা হইল।··· বইয়ের আরম্ভে বসন্তের আগমনী সম্বন্ধে ৫টি কবিতা আর বইয়ের শেষে বসন্তের বিদায় সম্বন্ধে ৪টি কবিতা ১৩৩৩-১৩৩৪ সালের লেখা। এই সময়ের আর একটি মাত্র কবিতা 'সাগরিকা' এই বইতে স্থান পাইয়াছে।"

একটি ফরমাশকে উপলক্ষ করে কবিতাগুলি রচিত হলেও কবির মূল কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা যায়। পূরবী-র মধ্যে যে নূতন বসন্ত ও নব-যৌবনের আবেগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল মহুয়া-র মধ্যে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। মহুয়া-র কবিতাগুলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন—"···ফরমাশ ব্যাপারটা মোটর গাড়ির স্টার্টার-এর মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে।···নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তারা পূর্ব দলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না, নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না। ক্ষণিকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।

"আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতি কাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

"মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুইধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ······ একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য, তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষার ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

"এই দুয়ের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে, নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকত না।······কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার মন থেকে যে-ঋতু যায়, সে আর এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা করে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না, এ হতেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলনের মতো, মনের যে ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, ফরমাশের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। ... মনের মধ্যে রচনার একটি বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে—তাকে পূরবীর ঋতু বা বলাকার ঋতু বললে চলবে না।"[১]

মহুয়া সম্বন্ধে এই বিবৃতির অধিক আর কিছু বলার থাকতে পারে না। বহুদিন আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডলে বাস করার পর বলাকা-র মধ্য দিয়ে পূরবী-তে কবি যে জগৎ ও জীবন-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন মহুয়া-তে তারই নবতর রূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রেম ও প্রণয় সংক্রান্ত কবিতাগুলিই মহুয়া-র মূল বৈশিষ্ট্য। এই প্রেম দেহ-কামনা নিরপেক্ষ আদর্শ প্রেম। মহুয়া-র প্রেমের কবিতাগুলিতে প্রেমের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য এবং মানবজীবনে প্রেমের প্রভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মহুয়া-র কবিতাগুলিতে তিনটি শ্রেণী দেখা যায়—১. প্রেমের নূতনতর প্রকাশ, ২. প্রেমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং ৩. প্রেমের সাধনা।

১. এই ধারার মধ্যে 'বোধন', 'বসন্ত', 'বরযাত্রা', 'মাধবী', 'বিজয়ী', এবং 'উজ্জীবন' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'উজ্জীবন' কবিতায় কবি মহাদেবের রোষবহ্নিতে দগ্ধ মদনকে পুনরুজ্জীবিত

১. রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড. (বি. ভা. ১৯৬৮), পৃ ৫২৬-৫২৮

করার কথা বলেছেন। মদনের মধ্যে যে স্থূলতা, রূঢ়তা ছিল তা মহাকালের রোষে ভস্মীভূত হয়ে নির্মলরূপে নূতনভাবে জাগরিত হোক্ এই-ই কবির কাম্য। সেই প্রেম হবে সর্বকলুষ মুক্ত, বীর্যবান, দীপ্তিময় এবং ঘাতসহ। পুষ্পধনুর এই নবজন্ম ও নবরূপ কবিতাটিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে—

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,
অমৃত সে মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
... ...
দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমিরতোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্র-নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্‌বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

২. দ্বিতীয় ধারার কবিতাতে প্রেমের প্রসাধন-কলার রূপ বৈচিত্র্য। 'অর্ঘ্য', 'দ্বৈত', 'সন্ধান', 'শুভযোগ,, 'মায়া', 'নির্ঝরিণী', 'শুকতারা', 'প্রকাশ', 'বরণডালা', 'অসমাপ্ত' ইত্যাদি কবিতায় প্রেমের নানা রূপ ও নানা অবস্থার বর্ণনা। 'নাম্নী' পর্যায়ের কবিতাগুলিও এই ধারার অর্থাৎ প্রণয়ের প্রসাধন-কলার অন্তর্গত। প্রণয়ের প্রসাধন-পারিপাট্যে নারীর বিচিত্র রূপের বর্ণনা এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু। কোন কোন কবিতায় প্রণয়ের প্রসাধনকলার সঙ্গে সঙ্গে সাধনবেগও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—'শুভযোগ' কবিতায়—

যে বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে,
পলাশের কুঁড়ি
এক রাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি,
শিমুল পাগল হয়ে মাতে
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে—
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা,

উচ্ছ্বসিত সে এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে ॥

মহুয়া-র কোন কোন কবিতাতে দেহকামনার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সব স্থানেই রবীন্দ্রনাথের লেখনী সংযত এবং শুদ্ধ।

৩. এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমের দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'লগ্ন', 'বরণ', 'মুক্তরূপ', 'স্পর্ধা', 'আহ্বান', 'নির্ভয়', 'প্রতীক্ষা', 'সবলা'কে এই শ্রেণীর কবিতা বলা যায়। এখানে প্রেমিক-প্রেমিকা গ্লানিহীন, দুঃখজয়ী, ত্যাগী ও মহৎ রূপযুক্ত। 'সবলা' কবিতা তাই নারীর তেজোদৃপ্ত ভাষণ যা তার প্রেমের শক্তি এবং সাধনার কথাই ব্যক্ত করেছে—

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।

প্রেমের চিরন্তন, বন্ধনহীন, অমৃতময়, আনন্দময় রূপ প্রকাশিত হয়েছে 'দায়মোচন', 'প্রত্যাগত', 'অন্তর্ধান' এবং শেষের কবিতা থেকে উদ্ধৃত 'বিদায়' এবং 'পথের বাঁধন' কবিতায়। যদিও এগুলি মহুয়া-র কবিতাগুলির একেবারে সগোত্র নয় তথাপি প্রেমচিন্তায়, অনুভূতির তীব্রতা ও মাধুর্যে এগুলি প্রণয়মূলক কবিতার একটি রসদীপ্ত রূপ বলা যায়।

'সাগরিকা' এই কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা। এটি যথার্থ প্রেম-কবিতা না হলেও এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্বন্ধকে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির যে বিজয়-অভিযান, সেই ইতিহাসকে কবি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ও ভাব-বিনিময়ের রূপকচ্ছলে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসের শুষ্ক তত্ত্বকে কবি ভাষার ঔজ্জ্বল্যে ও কল্পনার প্রসারতায় অপূর্ব রূপদান করেছেন। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করবার সময় কবি বলীদ্বীপকে উপলক্ষ করে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

বনবাণী

১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে বনবাণী প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির রূপ ও রহস্যকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে অনুভব করেছিলেন। জীবনের উন্মেষ-যুগ থেকেই তাঁর প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বনবাণী উদ্ভিদ্-জগতের প্রশস্তিকাব্য। এই কাব্যে তাঁর নিসর্গচেতনার বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। কবির অনুভূতিতে বিশ্বব্যাপী একটি অখণ্ড প্রাণতরঙ্গ ধরা পড়েছে যা সমভাবে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে প্রবাহিত।

কবি বৃক্ষের মধ্যে আদি প্রাণের প্রকাশ দেখেছেন। বৃক্ষের মধ্যেই প্রথম প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছিল। বৃক্ষই সূর্য থেকে রশ্মি আহরণ করে পৃথিবীকে নব নব রূপে সজ্জিত করে। 'বৃক্ষ বন্দনা'-য় বলেছেন—

> ... সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
> মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
> টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
> আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
> ... ...
> আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
> সাজাইলে বসুন্ধরা।

বনবাণী গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন—"আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে ; হাজার হাজার বৎসরে ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয় ; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়,—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।......আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' ; শুনেছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে।......সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নব-নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।"

কবির পূর্বোক্ত মন্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় নিসর্গ তাঁর কাছে জড় মাত্র ছিল না। নিসর্গের মধ্যে কবি একটি গভীর আধ্যাত্মিকতা আরোপ করেছেন।

বনবাণীর কবিতাগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. বনবাণী—এখানে বিশ্ব-নিসর্গের বন্দনা ও তাদের প্রতি শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন। এই অংশে কবির নিসর্গ ও বিশ্ব-চেতনার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

২. নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা—এই ধারার কবিতাগুলিতে যৌবনের প্রশস্তি ও বন্দনা। কবি ভগবানকে নটরাজ শিবের মূর্তিতে কল্পনা করেছেন। এঁর নৃত্যের তাণ্ডবে পুরাতন ধ্বংস হয়ে যায়, নূতনের হয় আবির্ভাব। এই নৃত্য-লীলায় চিরন্তন প্রাণপ্রবাহের গতি অব্যাহত থাকে। জীবনমৃত্যু সৃষ্টি-ধ্বংস একই সত্যের প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের শিব-কল্পনাকে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও কালিদাসের চিন্তাধারা বিশেষ পরিপুষ্টি দান করেছে। তবে কবিমন শুধুমাত্র ঐতিহ্য-অনুসারী নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজস্ব মনন-কল্পনা।

৩. বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষ-রোপণ উৎসব—ঋতুবন্দনা ও বৃক্ষ জগতের প্রশস্তি-মূলক কবিতা এই ধারায়।

৪. নবীন—এখানে যৌবন ও বসন্তের বন্দনা করেছেন কবি।

পরিশেষ

এই কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের ভাদ্রমাসে। এই গ্রন্থ রচনার সময় কবি সত্তর বছর অতিক্রম করেছেন। দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় বার বারই কবির মনে হয়েছে পৃথিবীতে তাঁর দিন বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর যা কিছু দেবার ছিল সবই দেওয়া হয়েছে। তাই বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তিসূচক নামকরণ বার বারই দেখা যায়। কখনও চৈতালি, কখনও খেয়া, কখনও পূরবী; পরিশেষ-ও সেই সমাপ্তিসূচক নাম। কারণ কবি মনে করেছেন—

> যাত্রা হয়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
> ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
>
> —পরিশেষ, 'বর্ষশেষ'

আবার পরক্ষণেই তিনি 'বিচিত্রা' কবিতায় বলেছেন—

তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে—
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব করা দানে।

পরিশেষ কাব্যে আমরা কবির মনোজগতের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই। এই সময় সমসাময়িক পৃথিবী ও কবির ব্যক্তিগত জীবনে নানা ঘটনা ঘটেছে। কবি নানা স্থান পরিভ্রমণ করে নানা অভিজ্ঞতায় তাঁর ঝুলি ভরেছেন। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা গভীরতর হয়েছে। মৃত্যু-চিন্তার আলোকে তাঁর চোখের সামনে জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করেছে। এতদিনে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর একটি স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে মৃত্যু বিনাশ নয়, রূপ-পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন অনন্ত শান্তি ও চিরমুক্তির দিকে অগ্রসর হয়।

এই কাব্যের কবিতাগুলিতে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউদ্‌ঘাটনই প্রধান কথা। মৃত্যুর দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর সত্তর বছরের জীবনের হিসাব-নিকাশ করেছেন। তিনি যেমন নিজের কবিকর্ম ও কবিসত্তার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি জগৎ ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে অন্বেষণ করেছেন।

এই কাব্যখানির কবিতাগুলিকে প্রবণতা অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় কবিকৃতির বিচার ও আত্মবিশ্লেষণ। ২. সৃষ্টি ও মানব-জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ। ৩. সমসাময়িক ঘটনাকে উপলক্ষ করে রচিত কবিতা। ৪. গদ্য-কবিতার সূচনা।

১. 'প্রণাম', 'বিচিত্রা', 'পান্থ', 'জন্মদিন', 'বালক', 'চিরন্তন', 'তে হি নো দিবসাঃ', 'অগ্রদূত', 'সাথি', 'আলেখ্য' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর সমগ্র জীবনের কবি-স্বরূপের বিচার ও বিশ্লেষণ রয়েছে।

'প্রণাম' পরিশেষ-এর প্রথম কবিতা। এখানে কবি তাঁর আপন কাব্যকৃতির বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম জীবন থেকেই তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর সহযাত্রী কত লোক খ্যাতি ও অর্থের আকাঙ্ক্ষায় এবং বিভিন্ন কর্মের প্রচেষ্টায় নানা দিকে ধাবিত হয়েছে, কিন্তু তিনি বিশ্বসত্তার রহস্যে আকুল হয়ে বিচিত্র সুরে তাঁর কাব্য-বাঁশরীতে আলাপ করেছেন। সমগ্র সৃষ্টির বেদনাকে তিনি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতি ও মানবের অন্তরের সৌন্দর্য,

মাধুর্য ও আনন্দ-বেদনার তিনি বাণীরূপ দান করেছেন। আজ যাত্রা-সমাপ্তিকালে তিনি মানব ও ঈশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করেছেন—

... নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা-মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম।

'বিচিত্রা' কবিতায় কবি আত্মানুসন্ধান করেছেন। এখানে কবি পূরবী যুগের লীলাসঙ্গিনীর কথাই উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়। কবি তাঁর অন্তর-জীবনের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তাঁর কাব্যপ্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী জীবন-দেবতা লীলাসঙ্গিনী জীবনের দীর্ঘপথে বিচিত্র আনন্দবেদনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এতদিন তিনি জীবনে যে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের স্পর্শ পেয়েছেন এবং সুখদুঃখের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় তাঁর চিত্ত ভরে উঠেছে কবি এখানে সেই কথাই প্রকাশ করেছেন—

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।

আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জীবন ও পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া চুকিয়ে দিতে চান। 'জন্মদিন' কবিতায় কবি তাঁর কবিসত্তার অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। বিশ্বের প্রতি গভীর প্রীতি ও ভালবাসা আবার নূতন করে জাগ্রত হল। বিশ্বসত্তার আনন্দময় স্পর্শ কবির একান্ত কাম্য। তিনি কর্মখ্যাতি ইত্যাদি কিছু চান না, বিশ্ব-রসসাগরে ডুব দিয়ে ভালবাসা রেখে যেতে চান।

এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে—
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,

জাগরণে ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরসসরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা—
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালোবাসা।'

১. 'ধাবমান', 'অগ্রদূত', 'দীপিকা', 'বিস্ময়', 'বর্ষশেষ', 'মুক্তি', 'অপূর্ণ', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'যাত্রী', 'সান্ত্বনা', 'আমি', 'তুমি', 'নিরাবৃত', 'আছি', 'আহ্বান', 'কানামাছি', 'আরেকদিন,, 'দীপশিখা', 'রাজপুত্র', 'প্রতীক্ষা', 'শূন্যঘর', 'দিনাবসান', 'পুরানো বই', 'অগোচর', 'ছোটো প্রাণ', 'আগন্তুক', 'প্রাণ', 'শান্ত' এবং 'আতঙ্ক' প্রভৃতি কবিতায় মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবন ও জগতের প্রতি কবির জিজ্ঞাসা সংহত হয়েছে।

'অপূর্ণ' কবিতাটির মধ্যে কবির দার্শনিকতা প্রকাশিত হয়েছে, মানবজীবনের স্বরূপ সম্পর্কে কবির একটি গভীর জিজ্ঞাসা এখানে।

কবিতাটির নাম প্রথমে 'জন্মদিন' ছিল, পরে প্রথম ও শেষ স্তবক বাদ দিয়ে পরিশেষ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংসারের মাঝে আমাদের যে অস্তিত্ব এর কি কোন অর্থ নেই? এই প্রশ্ন জেগেছে কবির মনে। পার্থিব বস্তু ও মনের কল্পনা মিশিয়ে আমরা জীবন ও জগৎকে সৃষ্টি করে নিই আমাদের মানসলোকে। কত সংশয়-বিশ্বাস, কত প্রেম ও ত্যাগ, কত সার্থক সাধনা, কত ব্যর্থ বিড়ম্বনা এবং ভালো মন্দ, বস্তু ও ছায়ায়-গড়া মূর্তি নিয়ে আমাদের জীবন। সার্থকতা ও ব্যর্থতা ব্যক্তিরূপে পুঞ্জীভূত হয়ে কদিন পূর্ণ করে শেষে কোথায় গিয়ে মেশে। এই সহসা উদ্ভূত চৈতন্যধারা সে কি অকস্মাৎ গতিহারা হবে? মানুষের এই অপূর্ণতাই কি সত্য? তাহলে সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়? নিখিলের এই ব্যর্থতাই কবির কাছে একান্ত সত্য নয়; কারণ জীবনের মধ্যেই আছে পূর্ণতার সাধনা—

ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

'বর্ষশেষ' কবিতাটি একটি বিশিষ্ট কবিতা। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কবি ফেলে-আসা জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। জীবনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন শেষ হয়ে এসেছে, মৃত্যুর আলোকে তাঁর চোখের সামনে জীবনের আনন্দরূপ ও মহিমা প্রকাশিত হল। যাঁরা মানবশ্রেষ্ঠ তাঁদের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেছেন। জীবলোকে গৌরবময় মানবজীবনের অধিকারী হয়ে তিনি ধন্য। বিশ্বে যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কর্মধারা প্রসারিত তার সঙ্গে কবির যোগ নিবিড়। এই সীমিত জীবনের মধ্যেই তিনি অসীমকে অনুভব করেছেন—

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান, মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

'দীপিকা' কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর প্রতি কবির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবন এগিয়ে চলেছে। পুরাতনকে ধ্বংস করে জীবন নূতনকে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু শাশ্বত প্রাণপ্রবাহ এই নশ্বরতার মধ্য দিয়ে, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মহাজীবনের দিকে বয়ে চলেছে—

জানি পথশেষে আছে পারাবার,
প্রতিখনে যেথা মেশে বারিধার
নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে
ছুটিছে পথিক তটিনী।
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান,
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণনটিনী।

জীবন ও মৃত্যুর প্রতি কবির এই দৃষ্টিভঙ্গী বলাকা থেকেই স্পষ্ট হতে থাকে। পরিশেষ-এর মধ্যে আমরা এর একটা পরিপূর্ণ রূপ পাই। বলাকা-য় সৃষ্টিরহস্য কবির মনকে বিশেষভাবে অধিকার করে এবং জীবনের অমৃতত্ত্বের ধারণা সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ফুটে ওঠে। পূরবী-তে এসে তিনি এই কাম্য-

হাসি ভরা অনিত্য জীবনকে নূতনভাবে ভালবেসেছেন। পরিশেষ-এ এসে কবি এই জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহহীন, এখানে কবির জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধি পূর্ণতা পেয়েছে। মৃত্যু স্বাভাবিক পরিণাম জেনেও এই সীমিত-জীবনে তিনি নিত্যের উপলব্ধি করেছেন। জীবনকে কবি অসীম অনন্ত প্রাণপ্রবাহের অংশ বলে জেনেছেন। তাই জরা মৃত্যুর কাছে মানবাত্মা পরাজিত হয় না। সে শাশ্বত, অপরাজেয় ও মহান। শেষ পর্যায়ের কাব্যে যে ঔপনিষদিক চেতনা দেখা যায় তা এই পরিশেষ থেকেই সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

৩. সমসাময়িক ঘটনাকে উপলক্ষ করে রচিত, কবিতাগুলির মধ্যে 'বক্সা-দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' ও 'প্রশ্ন' কবিতাটির উল্লেখ করা যায়।

১৩৩৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ বক্সাদুর্গের রাজবন্দীরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। কবি তখন দার্জিলিং-এ, তাঁর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি 'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' কবিতাটি লিখে পাঠান ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সালে।

এই কবিতাটিতে কবির বক্তব্য হল প্রাণকে কখনও আবদ্ধ করা যায় না। মানুষের প্রাণের সাধনা কখনও নষ্ট হয় না; কারণ—

'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

সমসাময়িক ঘটনায় কবিমনের বিক্ষোভ ফুটে উঠেছে 'প্রশ্ন' কবিতাটিতেও। মহাত্মা গান্ধীর অকস্মাৎ গ্রেপ্তারে কবিমন ব্যথিত ও সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধীজী লণ্ডন থেকে দেশে ফিরলেন। ভারতীয়দের প্রতি রাজরোষ তখন চরম পর্যায়ে উঠেছে। ১৯৩২ সালে ৪ঠা জানুয়ারী মহাত্মাজী কারারুদ্ধ হন। এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ মানবতার অপমানে দুঃখ বোধ করে এই কবিতা রচনা করেন। কবির জিজ্ঞাসা মানবতা-ধ্বংসকারী অত্যাচারীদের কি ঈশ্বর ক্ষমা করেছেন বা ভালবেসেছেন?

৪. এই কাব্যে কতকগুলি কথিকা এবং গাথা-জাতীয় কবিতা আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার ছন্দোবদ্ধ গদ্যে রচিত। এই রচনারীতির সূচনা

হয় লিপিকা থেকে। পরবর্তী কালে কবি যে গদ্য-কবিতা লিখেছেন পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী-তে তার আরম্ভ হয় এই পরিশেষ-এ।

'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি', 'আগন্তুক', 'জয়ন্তী', 'সাথী', 'বোবার বাণী', 'আঘাত', 'ভীরু', 'আতঙ্ক' প্রভৃতিতে এই আঙ্গিকের নিদর্শন দেখা যায়। ভাব এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে গদ্য-কবিতার সঙ্গে এদের সাদৃশ্য আছে।

এ ছাড়াও পরিশেষ-এ 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী', 'সিয়াম', 'বোরোবুদুর' প্রভৃতি দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে কয়েকটি কবিতা আছে।

পুনশ্চ

এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে। আঙ্গিকের পরিবর্তনই পুনশ্চ-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পুনশ্চ কাব্যে গদ্য-কবিতার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য গদ্য-কবিতা রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল লিপিকা-র কয়েকটি কবিতায়। বলাকা থেকেই কবি ছন্দের উপর বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন। বলাকা থেকেই কবি সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দের বন্ধন ত্যাগ করে, পঙ্‌ক্তির মাত্রা-সংখ্যার নিয়মকে অগ্রাহ্য করে ভাব ও চিন্তা অনুযায়ী এক নূতন ছন্দ প্রবর্তন করেছেন, যার নাম দিয়েছেন 'মুক্তক' ছন্দ। কিন্তু পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে কবি ছন্দের সর্বপ্রকার বিধি, স্তবকবন্ধন এবং অন্ত্যমিল পরিত্যাগ করে নূতন রীতিতে কবিতা রচনা করেছেন।

পরিশেষ-এ এসে কবি মনে করেছিলেন এই তাঁর শেষ রচনা, কারণ সে সময় তিনি তাঁর জীবনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছেন। পরিশেষ-এও তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা ও বিশ্ব-জিজ্ঞাসার সম্পূর্ণ উত্তর পেলেন না। তাই তাঁকে রচনা করতে হল পুনশ্চ। কাব্য-জীবন থেকে কবির বিদায় নেওয়া হল না। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর কাব্য-প্রেয়সী নূতন কালের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছেন। 'নূতন কাল' কবিতায় ঘোষণা করলেন—

তাই ফিরে আসতে হল আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।

পুনশ্চ-তে কয়েক শ্রেণীর কবিতা দেখা যায়। ১. গদ্য-কবিতার রূপ ও রীতি-বিষয়ক কবিতা। ২. ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনামূলক কবিতা। ৩. সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতা। ৪. মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিমূলক কবিতা। ৫. অস্পৃশ্যতা আন্দোলন-সম্পর্কে লেখা কবিতা। ৬. প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় কবিতা। ৭. অমৃত-চেতনা, মানবসত্তার প্রকৃত পরিচয় ও মৃত্যুর রহস্য-বিষয়ক ভাবপ্রধান ও রূপক জাতীয় কবিতা। ৮. স্মৃতি-অনুধ্যানমূলক কবিতা। ৯. আখ্যায়িকামূলক কবিতা।

১. এই ভাবধারার কবিতাগুলি হল 'কোপাই', 'নাটক', নূতন কাল', ও 'পত্র'।

'কোপাই' কবিতায় কবি তাঁর নবসৃষ্ট গদ্য-ছন্দের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কোপাই নদীর তুলনা করেছেন। কারণ—

ওর ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জলস্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।

গদ্য-কবিতার মধ্যে পদ্য-ছন্দের আভিজাত্য ও স্পর্শকাতরতা অনুপস্থিত। গদ্য-ছন্দের মধ্যে সব কিছুই অবাধে আশ্রয় পেতে পারে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকেও কবি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্বযুগের কবিতা অর্থাৎ পদ্য-ছন্দে গাঁথা কবিতা লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়,

তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।

আভিজাত্যের অহংকারে সে নিজেকে সঙ্গীহীন একক করে রেখেছে। পদ্মা কবির পূর্বেকার কাব্যজীবনের প্রতীক।—

বিশুদ্ধতার আভিজাতিক ছন্দে _

এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি; আর এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।

কিন্তু গদ্য-কবিতার প্রতীক 'কোপাই'-এ যেমন ঐশ্বর্যের গর্ব নেই, তেমনি দৈন্যের মালিন্যও নেই। ঐশ্বর্য এবং নম্রতা যেন একই সঙ্গে মিশে গেছে—এ হল জনজীবনের নদী; কবিও এখন থেকে জনজীবনের কাব্যই রচনা করবেন—

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি,

'নাটক' কবিতাটিতে কবি গদ্য ও পদ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তপতী নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২৩শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সালে রাণী মহলানবিশের কাছে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আলোচ্য 'নাটক' কবিতার সাদৃশ্য আছে। যদিও এই কবিতাটি ঐ পত্রের তিন বছর পরে লেখা। পত্রটি কবির 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। পত্রটিতে গদ্য-পদ্যের তুলনামূলক বিচার করে তিনি বলেছেন—"পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো—তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের—কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়—অরণ্য পাহাড় মরুভূমি সমতল অসমতল প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি।...সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন—গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে—তাকে ব্যবহার করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না—নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর দিয়ে চলতে হয়—ক্ষমতা অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই, ধীরে চলা, ছুটে চলা, লাফিয়ে চলা, নেচে চলা, মার্চ করে চলা, তার পরে না চলারও কত আকার, কত রকমের শোওয়া বসা দাঁড়ানো। বস্তুত গদ্য রচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত।......মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ।"[১]

'নাটক' কবিতার মধ্যে আমরা এরই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই—

পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি ক'রে।

১. রবীন্দ্রনাথ, পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৫৬), পৃ. ৯৬-৯৭

বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

এখানে গদ্য বলতে কবি গদ্য-ছন্দের কথাই বলেছেন। এই কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা বলা যায় যে, নাটকের কথা বলতে গিয়ে এখানে কবি গদ্যরীতির কথাই বেশি বলেছেন এতে কবিতাটির পারম্পর্য রক্ষার ব্যাপারে ঈষৎ ত্রুটি লক্ষিত হয়।

'নূতন কাল' কবিতাটিতেও কবির নবযুগের কাব্যসৃষ্টির আঙ্গিকের এবং প্রবণতার বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়েছে। জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব সেরে কবি কাব্যজীবন থেকে বিদায় নেবার ইচ্ছা করেছিলেন. কিন্তু একালের আঙিনায় তাঁর কাব্য-প্রেয়সীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি আবার নূতন করে কাব্য রচনা শুরু করলেন। গদ্যরীতির কাব্য রচনান্তে আত্মতৃপ্ত কবি দেখলেন তাঁর প্রেয়সী চলে গেছেন পুরানো কালের সেই চিরন্তন গানের মধ্যে এবং তিনি নূতনের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়াচ্ছেন—

এমন সময় পিছন ফিরে দেখি, তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

এখানে আমরা কবির মনে নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করতে পারি।

'পত্র' কবিতাতে সেকাল ও একালের কাব্য-আস্বাদনের ক্ষেত্রে তারতম্যের কথা বলা হয়েছে। কবিতা আজ মুদ্রিত হয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশিত হয়, কবির আবেগময় আবৃত্তির মাধ্যমে নয়। এতে পাঠক ও কবির সম্পর্কে উত্তপ্ত সান্নিধ্যের মাধুর্য থাকে না। কিন্তু সেকালে কবিরা কবিতা আবৃত্তি করতেন

আর পাঠক তা শুনতেন, একালের তুলনায় সেকালের কবিদের ভাগ্য ছিল ভাল।

২. এই পর্যায়ে 'বিশ্বশোক' ও 'ফাঁক এই দুটি কবিতার উল্লেখ করা যায়।

'বিশ্বশোক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত দুঃখকে সকলের অগোচরে সহ্য করার কথা বলেছেন। কবির একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ ২২শে শ্রাবণ ১৩৩৯ সাল (৭ই আগষ্ট ১৯৩২ সাল) জার্মানীতে মারা যান। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করেই 'বিশ্বশোক' কবিতাটি রচিত।

কবি ব্যক্তিগত দুঃখকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চান না। যে ব্যথা সকলের তিনি তারই বাণীরূপ দিতে চান। নিজের শোককে তিনি বিশ্বজনীন শোকপ্রবাহের মধ্যে মিশিয়ে দিতে চান। তার সাহিত্যের মধ্য দিয়েই তিনি মানসিক স্বস্তি পাবেন। নিজের বেদনাকে সর্বজনীন করে তুললে তবেই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব। তাই তিনি লেখনীকে বলেছেন—

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে—
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে।

'ফাঁক' কবিতাটি 'বিশ্বশোক' কবিতাটি রচনার দিনেই লেখা হয়। 'বিশ্বশোক' কবিতায় কবির যে দুঃখজয়ী মনোভাব দেখা গিয়েছিল তা এখানে অনুপস্থিত. এখানে কবি মনকে যথোচিত পরিমাণে ভুলতে বলছেন। কর্তব্য-কর্মের বন্ধন থেকে মনকে কিছু পরিমাণে মুক্তি না দিলে জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে বাধা ঘটে। বার্ধক্যে কবি এই বিস্মৃতি, এই ফাঁকের কথা বলেছেন, যা না থাকলে স্মৃতির ভারে জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখো জীবনে ;
মনে রাখার মানহানি কোরো না
তাকে দুঃসহ করে।

৩. শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই ভাবের কবিতাগুলিতে উপস্থিত। সেটি হল সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, বেদনা-অভিমান সব কিছুকেই কবি কাব্যে মর্যাদার আসন দিয়েছেন। 'ছেলেটা', 'সহযাত্রী' 'শেষদান', 'বালক', 'কোমল গান্ধার', 'সাধারণ মেয়ে', 'বাঁশি', 'একজন লোক'. 'ভীরু', 'ঘরছাড়া', 'অপরাধী', 'অস্থানে', 'পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'উন্নতি' প্রভৃতি এই জাতীয় কবিতা। কবিতাগুলির বাস্তবধর্মিতা এবং গার্হ্যস্থ্যরস এগুলিকে আরও আস্বাদ্য করে তুলেছে।

'অপরাধী' কবিতায় 'তিনু' নামে একটি বালককে কবি ভালবাসেন তাই তাকে দুষ্টু বলে দেখেন, দোষী বলে দেখেন না। তার বুদ্ধি আছে, কিন্তু বিবেচনা নেই বলে সে পরিহাসের পাত্র সকলের কাছে। কবি তাকে দেখেন 'কাছের থেকে, মানুষ বলে, ভালোমন্দ পেরিয়ে।'

'শেষ চিঠি' কবিতাটি সন্তানহারা পিতার মর্মভেদী বেদনায় বিষণ্ণ। কন্যার মৃত্যুর পর পিতা তার শেষ চিঠি আবিষ্কার করেছে যাতে লেখা —

'তোমাকে দেখতে বড্‌ডো ইচ্ছে করছে।'
আর কিছুই নেই।

চিঠির এই স্বল্প ভাষণের মধ্য দিয়ে আমরা কবির মনের বেদনার গভীরতাকে অনুভব করতে পারি।

'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' ও 'ক্যামেলিয়া'তে প্রেমের ব্যর্থতা ও নিয়তির পরিহাসের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

এই ভাব-পর্যায়ের প্রতিটি কবিতাতেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি কবির গভীর সহানুভূতির চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

৮. কয়েকটি কবিতায় কবির হীন প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ও কৌতূহল প্রকাশিত হয়েছে। বনবাণী কাব্যগ্রন্থে ক্ষুদ্র প্রাণী ও বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা জ্ঞাপন দেখেছি। পুনশ্চ কাব্যেও সেই মমত্ববোধ ও একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাগের কবিতাগুলির মধ্যে 'কীটের সংসার' এবং 'শালিখ' উল্লেখযোগ্য। 'শালিখ', 'মাকড়সা', পিঁপড়ে', 'নেড়ী কুকুর', 'গুবরে পোকা' প্রভৃতিকে তিনি অসংকোচে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। 'ছেলেটা' কবিতায় একটা নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডির কথা আছে। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' কবিতাতেও একটি কুকুরের কথা আছে।

'কীটের সংসার' কবিতায় কবি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে কীটের জীবনের

সঙ্গে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হল না। একদা কামিনী ফুলের ডালে কবি মাকড়সার বাসা দেখলেন। বাগানের পথের ধারে দেখলেন পিঁপড়ের বাসা। সমগ্র বিশ্বের পটভূমিকায় মানুষের সংসার দেখতে ছোট। তবু তা ছোট নয়। তেমনি এই কীটের সংসার ভালো করে চোখে পড়ে না। তবু সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্রে ওরা আছে। ওদের জীবনেও ভাবনা আছে, সমস্যা আছে, প্রয়োজন আছে, আছে দীর্ঘ ইতিহাস। ওরাও 'ক্ষুধা-পিপাসা-জন্ম-মৃত্যু'র অধীন। কিন্তু ওরা মানুষের কৌতূহলের বাইরে অবস্থান করছে। ওদের সঙ্গে কবির এই অপরিচয় তাঁর মনে বেদনার উদ্রেক করেছে।—

কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ সংসারের ধারেই।

৫. পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থ যখন তিনি রচনা করছিলেন তখন দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে এই আন্দোলন পরিচালনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ই তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি রচনা করেন। 'প্রথম পূজা', 'রঙরেজিনি', 'শুচি', 'স্নান সমাপন', 'প্রেমের সোনা' ইত্যাদি এই শ্রেণীর কবিতা।

'শুচি' কবিতাতে অস্পৃশ্যতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। এই কবিতাটি ১৯৩২ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা। এই সময়টির কিছু ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে যা 'শুচি' রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দক্ষিণ ভারতের কোচিন রাজ্যে সকল শ্রেণীর হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে। বর্ণহিন্দুদের ব্যবহারের প্রতিবাদে কেলাপ্পন নামে একজন নেতা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলে কবি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে কোচিনের মহারাজাকে একটি পত্র দেন (২রা ডিসেম্বর, ১৯৩২)। সকল হিন্দুদের জন্য মন্দিরের দ্বার যাতে উন্মুক্ত হয় সেই অনুরোধ তিনি জানিয়েছিলেন। এর আগেই গান্ধীজী পুণার যারবেদা জেলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য অনশন ধর্মঘট করেছিলেন এবং তার ফলেই হরিজনদের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের ঐতিহাসিক

পুণা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর পরে হরিজনেরা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভে আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

এই অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে কবি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর সামনে আরও একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা হল হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সমস্যা। এই উভয় সমস্যার আভাস পাওয়া যায় 'শুচি' কবিতায় রামানন্দ অস্পৃশ্য চণ্ডাল নাভাকে আলিঙ্গন করে বলেছেন যে তিনি অন্তরে মৃত ও অচেতন এবং সেই জন্যই সেই মৃতের সংকারের জন্য তাকে তার প্রয়োজন। আবার তিনি মুসলমান জোলা কবীরের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলেছেন যে, কবীরের হাতের শুচিবস্ত্র তাঁর হৃদয়ের নগ্নতাকে দূর করবে।—

রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন—
চিত্ত আমার ধূলায় মলিন।
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে।
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'

এখানে মূলগত ভাবটি হল অহংকার আমাদের শুভবুদ্ধি আছন্ন করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই পর্যায়ের অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যেও একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

৬. পুনশ্চ-এর কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির প্রকৃতি চেতনার একটি বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'খোয়াই', 'পুকুরধারে', 'বাসা', 'দেখা', 'সুন্দর', 'স্মৃতি', 'ছুটির আয়োজন', 'বিচ্ছেদ', 'ফাঁক', 'পয়লা আশ্বিন', 'সুন্দর' প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা।

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি-বর্ণনা চিত্রধর্মময়, এখানে কবি বাস্তবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। সোনার তরী প্রভৃতি পর্বের প্রকৃতি বর্ণনায় কবির রোমান্টিক কল্পনার চরম বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। সেখানে প্রকৃতি অনেকটা কল্প-মায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু পুনশ্চ-র প্রকৃতি-চিত্রগুলিতে কল্পনার রঙ আরোপিত হয় নি তাই এগুলি কৃত্রিম বা বর্ণনাতীত হয় নি। পদ্মার গাম্ভীর্য এবং কোপাই নদীর শীর্ণ পাণ্ডুরতা সবই যাথার্থ্যের মহিমায় উজ্জ্বল। সোনার তরী ইত্যাদি কাব্যের মত সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির কেন্দ্রে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা এখানে নেই। পুনশ্চ-এর প্রকৃতি-চিন্তায় কখনো কখনো কবি দার্শনিক হয়ে উঠেছেন। এখানে প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির চিত্রকল্পগুলি লক্ষণীয়।

স্থানে স্থানে কবি যেন চিত্রের মালায় এক একটি প্রাকৃতিক পরিবেশকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরেছেন।

'খোয়াই' কবিতায় কবি প্রকৃতির পটভূমিকায় অতীত স্মৃতি অনুধ্যান করেছেন। খোয়াই নদী পদ্মার তুলনায় আভিজাত্যহীনা। কিন্তু এই নদীর বর্ণনায় কবির সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি নদীটির অকৃত্রিম জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। নদীটির সঙ্গে নিজের জীবনের ও কর্মের সাধর্ম্য আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি এই খোয়াই। খেলাচ্ছলে প্রকৃতি এখানে বর্ষাধারায় ছোট ছোট খেলার পাহাড় তৈরি করে। এই খেলাকে কবি ছোট বলে মানতে পারেন নি। কারণ কোন বিশেষ মুহূর্তে তিনি এর 'রুষ্টরুদ্রের প্রলয় ভ্রূকুঞ্চনের মতো' মহিমাকে উপলব্ধি করেছেন। বাল্যকাল থেকে এই খোয়াই প্রকৃতি-প্রেমিক কবির লীলাক্ষেত্র—

এসেছিনু বালককালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে
ঝির্ ঝির্ ঝর্ণার ধারায়
রচনা করেছি মন-গড়া রহস্যকথা,
খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুরবেলায় আপন-মনে একলা।

কবি 'খোয়াই'-এর সঙ্গে নিজের জীবনের একটা মিল খুঁজে পেয়েছেন। এর পটভূমিকাতেই তাঁর জীবন নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে, তাঁর মনে এক বিচিত্র অনুভূতির উদয় হয়েছে।

তার পরে অনেক দিন হল,
পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ
ঐ আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ।

কবির জীবন শেষ হয়ে যাবে, তখনও কর্মচাঞ্চল্য অক্ষুণ্ণ থাকবে খোয়াই-এর,

কিন্তু তার অন্তরে কোথাও হয়ত কবির জীবনের স্মৃতিচিহ্ন থাকবে এই চিন্তায় কবি শান্তি অনুভব করেছেন।

'পুকুরধারে' কবিতায় কবি দোতলার জানলা দিয়ে পুকুরের একটি কোণা ও তার চারিপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

তিনি এই চলিষ্ণু সৌন্দর্যধারায় অতীতের ছায়ার প্রতিফলন দেখেছেন। তাই 'আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দূরকালের কার একটি ছবি' তাঁর মনে আসে। বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় পুকুরের রঙ বদলায়, জলে বাতাবি লেবুর পাতার ছায়া কাঁপে। কবির মন অতীতচারী হয়ে ওঠে। অতীতের কোন এক নারীর কথা মনে আসে—স্নেহে প্রেমে কারুণ্যে সারল্যে ভরা সেই নারী।

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রীতি গভীর তন্ময়তার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা না ঘটলে এমনভাবে প্রকৃতিকে আত্মস্থ করা যায় না।

'বাসা' কবিতাটির মধ্যে কবির প্রকৃতি-প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রতিমা ঠাকুরের সঙ্গে স্টুডিও স্থাপন করা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে কবির কল্পনার সেই স্টুডিয়োর বর্ণনা রয়েছে কবিতাটিতে। কিন্তু তাঁর এই স্টুডিয়ো রচনা সাংসারিক কাজের চাপে কখনও বাস্তবে পরিণত হয় নি। তবু ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে কবি একটি বাসা নির্মাণের বাসনা জানিয়েছেন কল্পনায় সেই বাসার ছবি এঁকেছেন। এই কবিতাটির সঙ্গে ১৯৩০ সালে প্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত একটি পত্রের কিছু মিল আছে—"থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা, ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে শালবনের ছায়ায় খোলা জানালার কাছে। ·· ··বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়চে, আছি বার্লিনে বড়োলোক সেজে। বড়ো কথা বলতে হবে, বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন। জগৎজোড়া সব সমস্যা রয়েচে তর্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ওদিকে ভারত সাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী—তার অনেক দাবি, অনেক দায়; ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক আমার স্টুডিয়ো।"

কবিতাটির চিত্র-কল্পনায় রয়েছে বাস্তব রস। ময়ূরাক্ষী নদীতীরের বর্ণনা —যেখানে শালবন আর মহুয়ার মেশামেশি, পুবের দিকে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছটা সাকালের বাঁকা রোদ্দুরে দেয়ালে চোরাই ছায়া ফেলে। নদীর ধার দিয়ে রাঙা মাটির পথ, কুড়চির ফুল ঝরে পড়ে পথে। বাতাবিলেবু-ফুলের

গন্ধ ভাসে বাতাসে, সজনে ফুলের ঝুরি দোলে হাওয়ায়, চামেলি লতিয়ে ওঠে বেড়ার গায়ে। আরও অসংখ্য চিত্রের মালা কবিতাটিতে।

'বাসা' কবিতাটিতে কবির ইচ্ছাকে কাব্যিক কল্পনাও বলা যেতে পারে। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে সব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়ার বাসনার মধ্যে কবির রোমান্টিক ভাবনারই প্রকাশ হয়েছে।

এ বাসা আমার হয় নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনোদিন।
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন ঘননীল মাথার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।

আর মনে হয়,—

আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সবকিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

ময়ূরাক্ষী নদীর তীরের এই বাসা চিরকাল কবির কল্পলোকের বিষয় হয়ে থাকবে এবং সেইজন্য একে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা কবির চিরকাল থাকবে। কবিতাটির শেষাংশের সঙ্গে Wordsworth-এর 'Yarrow Unvisited' কবিতাটির ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৭. 'একজন লোক', 'তীর্থযাত্রী', 'চিররূপের বাণী', 'মানব পুত্র', 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন' এই ভাবধারার কবিতা। বিশ্ব-সৃষ্টি রহস্য, মানবসত্তার রহস্য, মানুষের আত্মস্বরূপের যথার্থ পরিচয় প্রভৃতি দার্শনিক চিন্তা অধ্যাত্ম রহস্যের উপলব্ধির কাব্যরূপ এই কবিতাগুলিতে।

'একজন লোক' কবিতায় ভাদ্র মাসের সকালবেলায় আধবুড়ো হিন্দুস্থানী একজন মানুষকে দেখে কবির মনে হয়েছে যে জীবনে আমাদের কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু আমরা পরস্পরের সত্য পরিচয় জানি না। সংসারের বাস্তবতায় পরস্পরের কাছে পরস্পরের একটা জাগতিক প্রয়োজনোদ্ভূত অস্তিত্ব-বোধ ও পরিচয় আছে। কিন্তু সমগ্র পরিচয়টি একটি রহস্যে আবৃত; অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে মানবীয় অস্তিত্বচেতনায় একটি ঐক্যবোধ আছে। অসীমের

পটভূমিকায় 'বিশ্বের শেষ রেখাতে যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।' সেখানে অপরিচিত লোকটিকে দেখে কবির মনে হয়েছে—

'ওকে শুধু জানলুম—একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকাল বেলায়
একজন লোক।

এবং পথিক—

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারও সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারও,
সেখানে আমি—একজন লোক।

পথিকের জগতে আছে তার বাছুর, ময়না, স্ত্রী, বোবা মুদিদোকানদার, কাবুলিওয়ালা, কিন্তু অপরিচিত 'আমি একজন লোক' সম্পর্কে কোন কৌতূহল নেই।

'তীর্থযাত্রী' কাবতাটি টি. এস. এলিয়টের 'Journey of the Magi' কবিতার অনুবাদ। এর সঙ্গে এই কাব্যের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির ভাববস্তু ও পরিকল্পনার সাদৃশ্য আছে।

বেথেলহেমের এক অখ্যাত স্থানে মানবপ্রেমিক যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়েছে। এই দেবশিশুকে দেখবার জন্য মানুষ ক্লেশ সহকারে পথ পরিভ্রমণ করেছে—এই পথপরিক্রমাই হচ্ছে তীর্থযাত্রা। তীর্থে পৌঁছে দেখা গেল—পুরানো যা কিছু, যা কিছু জীর্ণ ও অসত্য তার যেন মৃত্যু ঘটেছে, নবীন জন্ম নিচ্ছে, নূতন প্রত্যয় এবং আশা পুরানোর পরিবর্তে আপন স্থান করে নিচ্ছে—

কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড় কঠোর,
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।

তারা আপন দেশে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরে এল। কিন্তু পুরানো বিধিবিধানে বাঁধা জীবনে আর শান্তি পেল না। তারা উপলব্ধি করল মৃত্যুর স্বীকৃতিতেই নবজন্ম লাভ করার উপায় নিহিত।

কবিতাটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। জীর্ণ পুরাতনকে সরিয়ে নবীনকে বরণ করার আগ্রহ, এমন কি ক্লেশ স্বীকার করার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে স্বীকার করতেন। তার এই পরিচয় অনেক স্থানেই পাওয়া যায়।

'শিশুতীর্থ' ও মানব পুত্র' কবিতা দুটি যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণী অবলম্বনে লিখিত।

'শিশুতীর্থ রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য-কবিতা। ১৯৩০ সালের ১১ই জুলাই কবি বার্লিনে যান। সেখান থেকে ড্রেসডেন হয়ে তিনি মিউনিক যান। এই সময়ে তিনি একদিন দক্ষিণ জার্মানির Passion Play (খ্রীষ্টের জীবনের শেষ পর্বের অভিনয়) দেখবার জন্য মিউনিক থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত 'ওবার আমমারগাউ' (Oberammergau) নামে একটি গ্রামে যান। নাটকের ভাষা জার্মান হলেও তিনি সমস্ত দিন বসে এই অভিনয় দেখেন। এই অভিনয় তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং খ্রীষ্টের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জার্মানির প্রসিদ্ধ উফা কোম্পানীর ফিল্মের জন্য নূতন আঙ্গিকে ইংরাজীতে 'The child' রচনা করেন। সম্ভবত এইটিই কবির একমাত্র মূল ইংরেজী রচনা। 'শিশুতীর্থ' এরই বাংলা রূপান্তর।

'শিশুতীর্থ' লিখিত হয় ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে, 'বিচিত্রা'-য় এটি ১৩৩৮ সালের ভাদ্র মাসে 'সনাতনম্ এনম্ আহুর উতাদ্যস্যাৎ পুনর্ণবঃ' নামে প্রকাশিত হয়।

পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ, শোষণ ও অত্যাচারের মধ্যে খ্রীষ্টের মানবতা কবির চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৩৩৮ সালে কানপুরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয়। কলকাতা ও চট্টগ্রামেও মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে। তখন গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই বৎসরের ভাদ্র মাসে তিনি বিলাতে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যান। দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে গান্ধীজীর প্রচেষ্টা কবির মনে খ্রীষ্টের মানবধর্মকে নূতন করে মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া এই সময় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাপান চীনের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়া কেড়ে নিয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। দেশে ও বিদেশে এই হিংসাত্মক আবহাওয়ার মধ্যে কবি শিশু মানবপুত্র ও নরদেবতা রূপে একদা পৃথিবীতে আবির্ভূত খ্রীষ্টকে বিশেষভাবে বন্দনা করেছেন। মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ খ্রীষ্টকে

কোন বিশেষ ধর্মের প্রচারক হিসাবে দেখেন নি। তিনি তাঁকে সমগ্র মানবতার একজন পরিপূর্ণ প্রতিনিধি রূপে দেখেছেন।

খ্রীষ্টের নামের স্পষ্ট উল্লেখ এই কবিতায় না থাকলেও বিষয়টি যে তাঁর জন্মসংক্রান্ত এমন ইঙ্গিত কবিতাটির কোনো কোনো স্থানে বিশেষ করে শেষের দিকে পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে কবিতাটিকে মহাপুরুষের আবির্ভাবের রূপক বলা যায়।

এই কবিতাটি একটি বিশিষ্ট কবিতা। চরম-আদর্শের জন্য মানবজাতির চিরন্তন যাত্রা ও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সেই আদর্শের প্রতীক এক নবজাত শিশুর নিকট পৌঁছানো, রূপকছলে এই কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। কল্পনার সুদূর বিস্তার এবং ভাবোদ্দীপক শব্দচয়ন প্রয়োগের ফলে কবিতাটি অসামান্য হয়ে উঠেছে।

সৃষ্টির আদি যুগ থেকে মানুষ তার পশুস্বভাবজ শক্তির উপর নির্ভর করে বসবাস করেছে। কিন্তু মানুষের উদ্দেশ্য চরম আদর্শ লাভ।

মানুষ চিরকাল চরম আদর্শের অভিযানে চলেছে, তার লক্ষ্য আত্মস্বরূপের এবং অন্তরস্থিত নিত্য-মানবকে উপলব্ধি। এই আদর্শে উত্তরণের পথে মানুষের ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তি ও পশুশক্তি বাধা হয়ে আছে। তার অন্তরস্থিত নিত্য-মানবের অবস্থিতিতে সাধারণ মানুষ অচেতন, সন্দিহান তাই সে বারেবারেই আদর্শকে অস্বীকার করে আদর্শকে লাভের পথ থেকে দূরে সরে আসে। যুগে যুগে এই মানুষের মধ্যেই মহামানব ও তত্ত্বজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়। তাঁরা বলেন মানুষের বাহ্যিক-রূপই সব নয়, সে মহান, সে চিরন্তন। সংসারের আবিলতায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও সে আলোক-সন্ধানী। প্রথমে অজ্ঞ, তারা মহাপুরুষের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, এসবই প্রবঞ্চনা বলে মনে হয়। তারপর তাদের মনের অন্ধকার সরে যায়। তাদের বিবেক জেগে ওঠে। সাধুর নেতৃত্বে তারা সার্থকতার তীর্থে যাত্রা করে। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। কেউ সাধুর অনুগত, কেউ অবিশ্বাসী, কেউ আবার বিকৃত ব্যাখ্যাকারী। নিজেদের দুর্বলতার জন্য তারা আদর্শ লাভের পথে বাধা পায়। তখন তারা অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাদের মহান নেতাকে হত্যা করে। এইভাবে যুগে যুগে যাঁরা মানুষকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করানোর জন্য আবির্ভূত হন তাঁরাই মানুষের হাতে নির্যাতন ভোগ করেন। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের আদর্শই মানুষকে পথ দেখায়। ক্রমে মানুষ আদর্শের

সন্ধান পায় অন্তরস্থিত নিত্যমানবকে দর্শন করে। সেই চিরমানব শিশুর মতই শুভ্র নির্মল পবিত্র। শিশুই সেই চিরন্তন নিত্য-মানবের প্রতীক। এই শিশু-সন্দর্শনেই মানুষ জীবনের চরম আদর্শকে দর্শন করে।

এই কবিতাটির রূপককে একটু অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। একে আত্মোপলব্ধির রূপক ছাড়াও পৃথিবীতে মহাপুরুষের আবির্ভাবের রূপক বলা হায়। যখন দেশে ও সমাজে অন্যায় দেখা দেয়, অধর্ম ও অসত্য প্রভাব বিস্তার করে তখনই হয় মহাপুরুষের জন্ম। এঁরা সকলেই শিশুরূপে আবির্ভূত হন। এই শিশুর আবির্ভাবেই পৃথিবীতে নবযুগের সূচনা হয়, মানুষের অবনত মনুষ্যত্ব আপন মহিমা ফিরে পায়।

৮. পুনশ্চ-এর কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের স্মৃতির আবেশ লক্ষ্য করা করা যায়। 'তীর্থ যাত্রা', 'বালক', 'পুকুর ধারে' প্রভৃতি কবিতায় চিরন্তন সৌন্দর্য-সাধনার প্রকাশ দেখা গেলেও স্থানে স্থানে কবির স্মৃতি-অনুধ্যান লক্ষ্য করা যায়।

৯. এই জাতীয় প্রতিটি কবিতার কেন্দ্রে একটি কাহিনী আছে। 'অপরাধী', 'ছেলেটা', 'সহযাত্রী', 'শেষ চিঠি', 'বালক', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'প্রথম পূজা', প্রভৃতি এই ধারার অন্তর্গত। কোন কোন কবিতায় তিনি চঞ্চল বালকের কথা বলেছেন অপূর্ব ভালবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে; আবার কোথাও তিনি প্রেমের ব্যর্থতা ও নিয়তির বিড়ম্বনার কথা বলেছেন। এই কবিতাগুলি বাস্তবতা ও কাব্যসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ।

পূর্বোক্ত শ্রেণী বিভাগের মধ্যে কোন কোন কবিতাকে দুই বা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। কারণ ঐ দুই বা ততোধিক প্রবণতা কোন কোন কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়বিভাগ মূলতঃ ভাব ও প্রবণতা অনুসারেই করা হয়েছে।

বিচিত্রিতা

বিশিষ্ট বাঙালী চিত্রশিল্পীদের আঁকা এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রায় সাতখানা ছবির সংগ্রহ এবং সেগুলিকে নিয়ে রচিত কবিতাগুলিই বিচিত্রিতা-র বিষয়বস্তু। গ্রন্থের প্রথমে বিচিত্রিতা নামে চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের আঁকা।

গ্রন্থের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী

নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ।" এই গ্রন্থটি শিল্পী নন্দলাল বসুকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

কতকগুলি চিত্রকে উপলক্ষ করে কবির ভাব এবং কল্পনা আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই তাঁর কবি-মানসের কোন বিশিষ্ট অবস্থার পরিচয় দেয় না গ্রন্থটি। এর মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাব ও কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত এবং এর মধ্যে কবি অন্ত্যমিল বজায় রেখেছেন। ভাবের দিক থেকে এরা মহুয়া ও পরিশেষের সমগোত্র। 'বধূ', 'ভীরু', 'ছায়াসঙ্গিনী', প্রভৃতি কবিতায় কবির ভাব ও কল্পনার অপূর্ব প্রকাশ। 'কন্যা বিদায়' এবং 'বিদায়' চিত্র-নিরপেক্ষ সার্থক কবিতা। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলিই কবির কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করেছে।

শেষ সপ্তক

রবীন্দ্রনাথের ৭৪তম জন্মদিনে ২৫শে বৈশাখ ১৩৪২ শেষ সপ্তক কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করে কবি দুই মাসের মধ্যে শেষ সপ্তক-এর কবিতাগুলি রচনা করেন। এর মধ্যে কতকগুলি কবিতা কবির পুরাতন ১২টি গদ্য-কবিতার নূতন রূপ এবং অন্য কয়েকটি কবিতা তাঁর পূর্বের ৭টি পত্রের নূতন কাব্যমূর্তি। সুতরাং এই গ্রন্থের ৪৬টি কবিতার মধ্যে ২৭টি মোটামুটি নূতন কবিতা।

শেষ সপ্তককে গদ্য-ছন্দে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এই কাব্যের মধ্যে কবি-মানসের একটি বিশিষ্ট পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সায়াহ্নের দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতা এই শেষ সপ্তক-এ বিশেষভাবে প্রকাশিত। এখানে কবি জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। আপন আত্মায় কবি ঈশ্বরের অনন্ত-স্বরূপের প্রতিফলনকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। মানবের আত্মাকে কবি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। এখানে কবি আত্মার স্বরূপসন্ধানে ব্যাপৃত। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনন শেষ সপ্তক-এ এসে প্রথম পূর্ণতা পেয়েছে। এর আগে পর্যন্ত কবি বিশ্বজগতের সৌন্দর্যের মধ্যেই অসীমের লীলা আস্বাদ করেছেন, এখানে কবি আপন মানসলোকে সেই অসীমকে উপলব্ধি করেছেন। মৃত্যুর সম্ভাবনা বৃদ্ধ কবিকে জীবনপ্রেমী ও স্মৃতিচারী করে তুলেছে। মৃত্যুর সন্নিকটে দাঁড়িয়ে

বৃদ্ধ কবি জীবনের অমরতা ও চিরন্তনতাকে অনুভব করেছেন। তাই এই কাব্যে বেদনার মধ্য দিয়েও আনন্দ ও মুক্তির সুর শোনা যায়।

শেষ সপ্তক-এর কবিতাগুলির মধ্যেও কয়েকটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। ১. আখ্যান ও জীবনীমূলক কবিতা। ২. প্রেমমূলক কবিতা। ৩. নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতা। ৪. ব্যক্তিগত জীবন বিশ্লেষণমূলক কবিতা। ৫. জীবন, মৃত্যু, মানব ও প্রকৃতি বিষয়ক দার্শনিক ভাবমূলক কবিতা। ৬. গদ্য-কবিতার রীতি-বিষয়ক কবিতা।

১. এই গ্রন্থের বত্রিশ, তেত্রিশ এবং বিয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতা এই ধারার অন্তর্গত।

বত্রিশ সংখ্যক কবিতায় বুড়ো মোহন সর্দারের মুখ দিয়ে রঘু ডাকাতের গল্প শুনিয়েছেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই গল্পগুলির উপভোগের রোমাঞ্চকর পরিবেশেরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন ছেলেরা মিটমিটে প্রদীপের আলোয় ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় নয়, বিদ্যুতের প্রখর আলোয় খবরের কাগজে ডাকাতের গল্প পড়ে।

তেত্রিশ সংখ্যক কবিতায় নেহাল সিং নামে একটি শিখ বালকের অসামান্য সত্যপ্রীতি দেখানো হয়েছে। এই বালকের কাছে জীবন অপেক্ষা সত্য অধিকতর বরণীয়।

বিয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি পণ্ডিত ও রসিক চারুচন্দ্র দত্তর জীবন এবং সেই সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলেছেন।

২. এক, দুই, তিন, চোদ্দ, একত্রিশ, সাঁইত্রিশ এবং আটত্রিশ সংখ্যক কবিতাকে এই ভাগে স্থাপন করা যায়।

এক সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে প্রেমিকা যখন কাছে থাকে তখন তার প্রেমকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করা যায় না। জীবনের বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রেম-স্মৃতি সত্তায় মিশে যায়। তাই প্রেমিকা যখন দূরে চলে যায় বা অপ্রাপণীয়া হয় তখন সেই অনায়াসলভ্য প্রেমের স্মৃতি চৈতন্য-লোকে জেগে ওঠে। তাই তাকে হারিয়ে আবার প্রেমের মধ্য দিয়ে ফিরে পাওয়া যায়। বেদনার মূল্যেই প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। কবিতাটির শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে সেই কথাই বলা হয়েছে—

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।

আটত্রিশ সংখ্যক কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। 'মেঘদূত'কে অবলম্বন করে কবি অনেক গদ্য ও কবিতা রচনা করেছেন। যক্ষ একদিন তার প্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে প্রেমের সার্থকতা খুঁজেছিল। কিন্তু যে প্রেম সংসারে ক্ষুদ্র সীমায় যুগলের উৎসবে আবদ্ধ তা অসম্পূর্ণ। যখন তার সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভেঙে যায় তখন সে বিশ্বের মাঝখানে পূর্ণরূপে দেখা দেয়। যক্ষের মতো বিরহী প্রেমিক নিজের অন্তরে প্রিয়ার রসমূর্তি রচনা করে তাকে বিশ্বের আনন্দের মধ্যে স্থাপন করে। বিরহ-বেদনার নির্মল প্রবাহে প্রেমিকের অন্তর শুদ্ধ হয়ে যায়, সে কবি হয়ে ওঠে -

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি,
নিজের অন্তর-আঙিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।

৩. এই গ্রন্থের চার, পাঁচ, এগার, তেইশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আঠাশ, ছত্রিশ ও চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর।

চার সংখ্যক কবিতায় কবি জীবন গোধূলিতে যৌবনশেষের আবেশ ও আবিলতা কাটিয়ে সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠতে চাইছেন। তাঁর অলস মন নিসর্গ প্রকৃতির সংস্পর্শে শুভ্র আলোর প্রাঞ্জলতায় বের হয়ে আসবে। তিনি প্রকৃতির মধ্যে চিরন্তন প্রাণপ্রবাহকে অনুভব করেছেন। বিশ্বধারার সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করে। প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে অনন্ত প্রাণপ্রবাহে আপনাকে নিমজ্জিত করতে চাইছেন। এই বিশাল বিশ্বধারার সঙ্গে তাঁর জীবন-চেতনাও ভেসে যাবে 'চিন্তাহীন, তর্কহীন, শাস্ত্রহীন মৃত্যু-মহাসাগর সঙ্গমে।' নিসর্গ ধারার সঙ্গে নিজের প্রাণপ্রবাহকে যুক্ত করলে পরম শান্তি ও দিব্য দৃষ্টি লাভ করবেন।

পাঁচ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন প্রকৃতির সঙ্গে যোগেই মনের সতেজতা এবং আনন্দ বৃদ্ধি পায়। জীবন-সায়াহ্নে কবি বিশ্বনিসর্গের কাছে নিজেকে

ব্যাপ্ত করে দিব্য দৃষ্টি লাভ করবেন এবং তার দ্বারাই তাঁর সত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় অবারিত হবে—

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে।

প্রকৃতির মধ্যে যেমন প্রকাশের ব্যাকুলতা আছে তেমনি কবি তাঁর জীবনের স্বরূপ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। কবির মতে নিসর্গের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই মানুষ সত্য দৃষ্টির অধিকারী হয় এবং এর দ্বারাই সে আপন সত্তার পরিপূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করে।

চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবির নিসর্গ-প্রীতির এক চূড়ান্ত নিদর্শন দেখা যায়। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে কবির গভীর একাত্মতার বোধটি প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটি শান্তিনিকেতনে কবির মাটির ঘর শ্যামলী সম্পর্কে লেখা। বাংলা দেশের মাটির রঙ শ্যামল। মাটির ঘর শ্যামলী যখন ভেঙে পড়বে—তখন মাটির সঙ্গেই সে মিশে যাবে। সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো, মাটির কোলে মিশবে মাটি। যে মাটিতে শ্যামলী তৈরি হয়েছে সেই মাটিই সমস্ত বেদনা ও কলঙ্ককে আপনার মধ্যে ধারণ করে। সব বিকার বিদ্রূপকে এই মাটিই দূর্বাদল দিয়ে ঢেকে রাখে এবং এর মধ্যে "শত শত শতাব্দীর রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ" স্তব্ধ হয়ে আছে। মাটির মতো শ্যামল স্নিগ্ধ বলেই তিনি বাংলা দেশের মেয়েকে ভালোবেসেছেন। বাংলা দেশের মেয়ের মধ্যে আছে 'মাটির শ্যামল অঞ্জন' ও 'কচি ধানের চিকন আভা'। তাদের 'কালো চোখের করুণ মাধুরী'-র উপমা দেখা যায় এই 'মাটির দিগন্তে নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির নিমীলনে'। এই মাটি কবিকে চিরদিন আকর্ষণ করেছে। তিনি মাটির সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করেছেন। তিনি বুঝেছেন এই মাটির মধ্যেই মুক্তি ও নবজীবনের আশ্বাস নিহিত—

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,

যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

এই কবিতাটি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"বার্ধক্যের শেষ সীমায় কবি তাঁহার কল্পনার দুঃসাহসিক অভিমান সংযত করিয়া তাঁহার এই মৃত্তিকা-প্রীতিকে প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। মাটির ঘরের মধ্যে এক স্নেহশীতল, সনাতন বিশ্ববিধানের সহিত সামঞ্জস্যশীল, ক্ষমা ও বিস্মৃতির ব্যঞ্জনায় স্নিগ্ধ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও নারী জাতির শ্যামল মাধুর্যের প্রতীক আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছেন।"[১]

৪. এই ধারার কবিতাগুলি হল ছয়, পনের, ষোল, উনিশ, ঊনত্রিশ, ত্রিশ, একচল্লিশ, তেতাল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ এবং ছেচল্লিশ।

ছয় সংখ্যক কবিতায় কবি জীবন গোধূলির ঘাটে এসে বিগত জীবনের হিসাব করেছেন। কবি এখন অনুভব করছেন যে, বিগত দিনের সাহিত্য ও প্রেমের সাধনায় যথার্থ সার্থকতা ভুলে শুধু কঠিন অভ্যাসের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আজ আর তার কোনো মূল্য নেই। আজ সামনে পথের শেষ; তাই পাথেয়েরও আর কোন প্রয়োজন নেই। মিলন-শয্যার প্রদীপ আজ অস্তমিত, ভোরের আলোয় যে বাঁশি বেজেছিল, রাতের শেষ প্রহরে তার শেষ সুরটি থেমে যাবে। কিন্তু জীবনের সব সঞ্চয় বিস্মৃতির তলে লুপ্ত হলেও তাঁর প্রেমানুভূতির স্মৃতিদীপ্ত মুহূর্তগুলি যেন মানুষের ধ্যানের মধ্যে বেঁচে থাকে, এই তাঁর কামনা। তিনি 'আলোর প্রেমিক' ও প্রাণলীলার উপাসক। তাই কোন বেদনার ছায়া ফেলে তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন না। ধুলোর উদাসীন বেদীর সামনে ধুলোর মধ্যেই নিজের ব্যক্তি সত্তার দাবিকে তিনি নিঃশেষ করে দিতে চান।

পনের সংখ্যক কবিতা-পত্রটি শ্রীমতী রাণী দেবীকে লিখিত। এখানে কবি তাঁর চিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। কবির ছবি আঁকা শুরু হয় মোটামুটিভাবে ১৯২৬ সালে।

এখানে কবির মতে দূরত্ব বলে যে জিনিস তা সুন্দর। আবার সুন্দরের

১ ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের কথা (১৯৪৭), পৃ. ২২২

মধ্যে দূরত্ব। তাই সুন্দর পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে। প্রয়োজনের সঙ্গে থেকেও সে আলাদা, প্রতিদিনের হলেও সে চিরকালের। আকাশের মধ্যে দূরত্ব আছে বলেই তা সুন্দর। কবি তাঁর কাব্যে ও চিত্রে এই দূরকে নিয়েই খেলা করেন। এদের মধ্যেই তিনি শান্তি, অমরতা ও মুক্তি লাভ করেন। দূর অর্থে কবি এখানে অসীমকেই বুঝিয়েছেন। ছবি কোনো সংবাদ দেয় না, সে নিজেরই সংবাদ নিজে। জগতে নানা রূপের খেলা, সেই সঙ্গে কবির ছবিও এক একটি রূপ। সে অজানা থেকে জানার মধ্যে বেরিয়ে আসে। সে কোনো কিছুর প্রতিরূপ নয়। এতদিন কবি কাব্যসৃষ্টির জন্য ধ্বনির অন্বেষণ করেছেন। এখন তিনি চিত্ররচনার জন্য রেখার বিশ্বে চোখ মেলে দেখছেন। কবির দেখা ও তাঁর সৃষ্টি এক হয়েছে বলেই তিনি চিত্রকর।

ষোল সংখ্যক কবিতাটিতেও চিত্রের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। এখানে কবি কাব্যের সঙ্গে চিত্রের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।—

> কথা ধনী ঘরের মেয়ে,
> অর্থ আনে সঙ্গে করে,
> মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
> রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
> তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।

তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর ৭৪তম জন্মোৎসবের স্মরণে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্রে নিজের জীবনকে অন্তরঙ্গভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন। নানা বয়সের 'ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়' জীবনের যে বিভিন্ন পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তাই তিনি এই কবিতায় বলেছেন। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের 'নানা রবীন্দ্রনাথের' একখানি পরিচয় মাল্য-গাঁথা হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন জীবনের অনেক কিছু অসম্পূর্ণতা ও অস্বীকৃতি রয়ে গেছে। মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ক্ষমার মধ্যে প্রতিফলিত তাঁর যে পরিচয়, সেই পরিচয়ই মহাকালের সামগ্রী হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন তিনি সকল পরিচয়ের হাত থেকে মুক্তি কামনা করছেন। জীবনের নানা সুর এক চরম সংগীতের গভীরতায় মিলিয়ে দিতে চাইছেন—

> তার পরে দাও আমাকে ছুটি
> জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
> সকল পরিচয়ের অন্তরালে,

নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা স্থরের নানা তারের যন্ত্রে
স্থর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

৫. সাত, আট, নয়, দশ, বার, তের, সতের, আঠার, একুশ, বাইশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, উনচল্লিশ এবং চল্লিশ সংখ্যক কবিতাগুলিকে এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাত সংখ্যক কবিতায় মহাবিশ্ব সম্পর্কে কবির ধারণাকে উপলব্ধি করা যায়। কবি বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিরাট ও বিচিত্র লীলাকে অনুভব করেছেন। সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যুর কেন্দ্রে মহাকাল নিরাসক্ত অবস্থায় অবিচলিত আনন্দে বিরাজ করছেন। সেখানে কবি আশ্রয় চেয়েছেন—

হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

নয় সংখ্যক কবিতায় কবি মানবসত্তার অগম্যতা ও অবোধ্যতার কথা বলেছেন। মানবসত্তা দুরধিগম্য; সে রহস্যে আবৃত। এই সত্তার অতি সামান্যই আমরা জানতে পারি। মানবজীবনের এক দিক সাংসারিক বাস্তবতার মধ্যে স্পষ্ট এবং অপরদিক স্বপ্ন-মায়ায় আচ্ছন্ন। এখন কবির প্রশ্ন—

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি—
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে।

শেষে কবি বুঝতে পেরেছেন যে মানবসত্তার প্রকৃত স্বরূপের সমস্তটা উদ্ঘাটনে স্রষ্টার নিষেধ আছে। বিধাতার অভিপ্রায়েই মানবসত্তা অজানার ঘেরের মধ্যে আছে।

একুশ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে মহাকাল ও মহাকাশের পটভূমিকায় জ্যোতিষ্কগুলির অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তারা অচিরে মৃত্যুর মধ্যে অদৃশ্য হবে। এই জ্যোতিষ্কগুলির উদয় ও বিলয়ের মতোই পৃথিবীতে মানব-সভ্যতার উত্থান পতন ঘটেছে। যুগের জয়স্তম্ভ, কবির মহাকাব্য, জাতির

গর্বিত ইতিহাস সবই মৃত্যুর মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের জীবনের ক্ষণে ক্ষণে পাওয়া অমৃতময় মুহূর্তগুলি চিরন্তন।

বাইশ সংখ্যক কবিতায় কবি দেহ ও প্রাণকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। অহং হল জড় দেহ-মনের অধিকারী এবং প্রাণ হল আত্মার বাহন। দেহে জরা আসে, তখন তা আত্মার সমতাকে জয় করে নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা অনাসক্ত, দেহকে মৃত্যু গ্রাস করতে পারে, কিন্তু প্রাণের মৃত্যু নেই। কবি এখন দেহমন থেকে মুক্ত চিরন্তন, আনন্দময় ও নিরহংকার সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন এবং সৃষ্টির অনন্ত আনন্দধারায় আপন সত্তার যোগ অনুভব করতে পেরেছেন। এই কবিতাটি সম্পর্কে ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন—"এ হল কবি সংস্পর্শে আমাদের বহুপরিচিত বাইরের স্বরূপ এবং অন্তরাত্মার মর্মবস্তুর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। একদিকে সুখ-দুঃখে ও আশা-নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ কৌমার যৌবন জরায় পীড়িত বাইরের আমি, আর অন্যদিকে অনন্ত জীবনের অভিলাষী জরা মরণহীন অন্তরসত্তা। এই বহিঃস্বরূপের বর্ণনায় তাকে ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করে বিশিষ্ট রূপ দান করার মধ্যে চমৎকার ফুটেছে।"[১]

ঊনচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুকে আপাত-দৃষ্টিতে জীবনের সমাপ্তি বলে মনে হলেও মৃত্যুই কবির মতে জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি হতে পারে না, জীবন থেকে জীবনান্তরে যাবার পথে মৃত্যু ক্ষণিক বিরাম। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন নবীনতা লাভ করে, মৃত্যুতেই জগতের মধ্যে প্রাণপ্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা হয়। মৃত্যু জীর্ণ পুরাতনকে ধ্বংস করে, ফলে নবীনের জন্ম হয়। অনন্ত সম্ভাবনাময় এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—

যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিই নি তাকে কোনো গর্তে আটকে থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,—
সে সমুদ্র আমিই।

৬. কয়েকটি কবিতাতে তিনি গদ্যরীতির বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ, চব্বিশ এবং পঁচিশ সংখ্যক কবিতা এই ধরনের। এখানে কবি তাঁর পূর্বে

১. ড. ক্ষুদিরাম দাস, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৯৬৬), পৃঃ ২৫৪

রচিত পদ্য-ছন্দের কবিতাগুলির প্রতি ঈষৎ অপছন্দের ভাব প্রকাশ করেছেন এবং জনসাধারণের কাছে তাঁর কাব্যকে পৌছে দেবার জন্য গদ্যকাব্যরীতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।

বিশ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে খোলা আকাশের নীচে রাঙা মাটির পথের ধারে আয়োজিত সভায় কাব্য পাঠ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর পূর্বের রচনাগুলি বড় কোমল ও স্পর্শকাতর। এদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু ও কুণ্ঠিত। এরা অন্তঃপুরিকা এবং এদের মুখের উপরকার অবগুণ্ঠনে সোনার সুতোয় ফুলকাটা পাড়। এদের রাজহংসের গতি মাটিতে চলার পক্ষে বিঘ্ন ঘটায়। এরা ভীরু, বহু সম্মানে বন্দিনী এবং নৈপুণ্যের বন্ধনে বাঁধা। খোলা সভায় আসতে পারে তারাই, যাদের সংসারের বন্ধন খসেছে, যাদের গতি অসংকোচ ও অক্লান্ত, যাদের গায়ের বসন ধূলিধূসর। এদের জন্যই কবি নূতন করে কাব্য রচনা করতে আগ্রহী হয়েছেন। তাই পুরানো কাব্য পাঠ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি সভা থেকে বিদায় নেবার সময় বললেন—

'যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান'।

এর থেকেই অনুমিত হয় কবি নূতন রীতিতে কাব্য রচনা করতে চান।

পঁচিশ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন তাঁর অতীত যুগের কাব্য আভিজাত্যের অহংকারে উচ্চকিত। সে যেন সযত্নে সাজান বাগান; এই বাগানকে দেখে মনে হয় এ যেন "মোগল বাদশাহের জেনানা—রাজ আদরে অলংকৃত। কিন্তু এই বাগানের পাঁচিলের ওপারে যেসব সুদীর্ঘ ও ঋজু য়ুক্যালিপটাস এবং প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ সোনাঝুরি আছে তাদের মাথার উপরে নীল আকাশ, অবারিত। তারা স্বাধীন এবং মুক্ত। তারা ব্রাত্য—আচারমুক্ত ও সহজ। তারা বাইরে বন্ধনহীন, কিন্তু ওদের মজ্জার মধ্যে আছে সংযম। তাই কবির মনে লাগলো ওদের ইঙ্গিত—

বললেম, 'টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়া-ভাঙ্গা ছন্দের অরণ্যে।'

এই ইঙ্গিত আমরা বিশ সংখ্যক কবিতাতেও পেয়েছি।

বীথিকা

১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে বীথিকা প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি সুবৃহৎ এবং এতে উনসত্তরটি কবিতা আছে। এখানে কবির দার্শনিক মনন ও জীবন-জিজ্ঞাসা রূপায়িত হয়েছে। সৃষ্টি ও মানবজীবনের চিরন্তন রহস্য এবং জগৎ ও জীবনের পর্যালোচনা করেছেন। সর্বত্রই অতীত ও বর্তমান, নিসর্গ ও বিশ্বসত্তা, সৃষ্টি ও ধ্বংস, ব্যক্তিগত জীবনের ভাবনা কল্পনা, সর্বোপরি একটি দার্শনিক প্রত্যয়জাত জীবনজিজ্ঞাসা কবিতাগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। অনিত্যের পটভূমিতে নিত্যের লীলা আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় বসে জগৎ ও জীবনে রস ও রহস্য উপলব্ধি বিচিত্র ভাব ও কল্পনার মধ্য দিয়ে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। গভীর দার্শনিকতার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার অপূর্ব সমন্বয় এখানে লক্ষ্য করা যায়।

বীথিকা কাব্যের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন ভাগে কবিতাগুলিকে ভাগ করা যায়। ১. বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতকে অনুভবমূলক কবিতা। ২. জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কিত কবিতা ৩. প্রেমমূলক কবিতা ৪ ঈশ্বরোপলব্ধিমূলক কবিতা ৫. বিবিধ রসের কবিতা।

১. 'অতীতের ছায়া', 'মাটি', 'দুজন', 'নব পরিচয়', 'পত্র' ইত্যাদি কবিতাগুলি হলো এই ধারার।

'অতীতের ছায়া' কবিতায় বর্তমানের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে কবি অতীতের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কবি অতীতকে নিরাসক্ত ধ্যানমৌন সাধক রূপে কল্পনা করেছেন। এই পৃথিবীর প্রতিটি মুহূর্ত অতীতে লীন হচ্ছে। অতীত এবং বর্তমানকে নিয়ে বিশ্ব-ইতিহাস রচিত হয়ে উঠছে। কবি এখানে অতীতের ভাবমূর্তিকে রূপমূর্তি দান করেছেন। বর্তমানের দিবালোকের অবসানে অতীত নিস্তব্ধ আকাশের তলায় তারার ধুনী জেলে বিলুপ্ত বর্তমানের চিত্র রচনা করেছেন। অসংখ্য বিগত বসন্তের পুষ্পে তাঁর কেশ শোভিত। কণ্ঠে তাঁর বহু প্রাচীন শতাব্দীর মণিমালা। বর্তমান হারিয়ে যায় না। অতীতের মধ্যেই তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা বেঁচে থাকে। এর দ্বারাই ইতিহাস রচিত হয়। অতীত নিপুণ শিল্পীর মত বর্তমানের কোনো ঘটনাকে গ্রহণ করে, কোন ঘটনাকে বর্জন করে ইতিহাসের পট রচনা করছেন। বর্তমানের কিছু ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে থাকে, কিছু বিলুপ্ত হয়ে যায়। কবি আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবন কিছুকালের মধ্যে অতীতের সামগ্রী হয়ে যাবে। তাই তিনি মহা-অতীতের সঙ্গে সখ্য

স্থাপন করছেন। তিনিও নিরাসক্ত প্রশান্ত এবং নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে জীবনের পর্যালোচনা করবেন, জীবনের সত্য রূপকে উপলব্ধি করবেন—

দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানামত
আপনার মনে মনে।
কলকোলাহলশান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে,
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
তারার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা—
কর্মহীন আমি সেথা বন্ধুহীন সৃষ্টির বিধাতা।

'পত্র' কবিতাটি একটি লঘুরসের কবিতা। জীবন-সায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা সম্পর্কে লঘু তারল্যের সঙ্গে পরিহাস করেছেন। তাঁর শেষ জীবনের লেখাকে সমালোচকের হাতে সমর্পণ করতে চান না। তিনি অরূপের সন্ধান পেয়েছেন, তাই জীবনের যশ-খ্যাতির প্রতি তাঁর মোহ নেই—

কলমটা তবে আজ তোলা থাক্,
স্তুতিনিন্দার দোলে দোলা থাক্।—

আজি শুধু ধরণীর স্পর্শ
এনে দিক অন্তিম হর্ষ।
বোবা তরুলতিকার বাক্য
দিক তারে অসীমের সাক্ষ্য।

২. জীবনের স্বরূপ, এবং জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত চিন্তাধারার পরিচয় আছে এই ভাবের কবিতাগুলিতে। কবিতাগুলি হল—'রাত্রিরূপিনী', 'নাট্যশেষ', 'আসন্নরাত্রি', 'প্রণতি', 'বিরোধ', 'রাতের দান', 'মরণমাতা', 'মাতা', 'মিলন' 'যাত্রা', 'অভ্যাগত', 'ঋতু অবসান', 'শেষ' এবং 'জাগরণ'।

'রাত্রিরূপিনী' কবিতায় কবি ক্লান্ত জীবন-দিবার শেষে জীবনের ক্লান্তির অপনোদনের কথা ব্যক্ত করে অতীত ও মৃত্যুর রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করে গভীর শান্তি লাভ করতে চেয়েছেন। কবির কামনা তাঁর জীবনের যতকিছু লাভ-ক্ষতি রাত্রির মধ্যে লুপ্ত হোক —

যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর
শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,
সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।
তব প্রেমে
চিত্তে মোর যাক থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।

'নাট্যশেষ' কবিতাটি কবির বেদনা মিশ্রিত গভীর ভাবানুভূতির পরিচয়-বাহী। এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে মানুষরূপী নটনটীর লীলাব সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতির মিশ্রণে কবিতাটি অপূর্ব।

মানুষ নটরূপে নেপথ্যলোক থেকে দেহ-ছদ্মসাজে সংসার রঙ্গমঞ্চে এসে হাসি-কান্নার মাধ্যমে নিজের অভিনয় সাঙ্গ করে দেহবেশ ফেলে আবার নেপথ্য-লোকে চলে যায়। এই খেলার কোন অর্থ হয়তো আছে বিশ্ব-মহাকবির কাছে। মানুষ যতক্ষণ সংসারে থাকে, সে তার হাসিকান্নাময় জীবনকেই সত্য বলে মনে করে; তারপর যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে যখন দীপশিখা নিবে যায়, বিচিত্র চাঞ্চল্য থেমে যায় তখন তারা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেয়। তাদের ভালোমন্দ, সুখদুঃখ, স্তুতিনিন্দা, উত্থানপতন সব অর্থহীন হয়ে যায়, চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্ব-মহাকবির কাছে এর একটা অর্থ থাকতে পারে। এটি তাঁর নাট্যকাব্যের বিষয় বলে পরিগণিত হতে পারে।

··যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা
পরক্ষণে প্রিয়হস্ত রচিতে বসিল তার চিতা;
সে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক
সে দুঃসহ দুঃখদাহ—শুধু তারে কবির নাটক
কাব্যডোরে বাঁধিয়াছে, শুধু তারে ঘোষিতেছে গান,
শিল্পের কলায় শুধু রচে তাহা আনন্দের দান।

কবিও মৃত্যুর সন্নিকটে এসে তাঁর জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কের আনন্দ-বেদনাময় দিনগুলিকে অর্থহীন বলে মনে করছেন। তারা আজ কবিহৃদয়ের গুহাগাত্রে ছবির মত—

…অদৃষ্টের যে অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হোল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে।…
… … .
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে ; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে।

'শেষ' কবিতায় কবি আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করেছেন। এই সংসার জীবন, সুখ-দুঃখ সবই কবির কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। এই জগতের ও জীবনের সমস্ত বন্ধনে আজ তিনি নির্লিপ্ত উদাসান। সামনে নবজীবনের আলোকরেখা। জ্যোতির্ময় তারকার মতো তাঁর জীবন বিশ্বচৈতন্যে ভেসে যাচ্ছে, তাঁর ভবিষ্যৎ যেন বিশ্বসত্তায় লীন হয়ে যাচ্ছে—যে সত্তার চিরন্তন,—

যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্ লক্ষ্যমুখে।
পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে, সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে-মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র—'আমি'।

'জাগরণ' কবিতাটিতে কবি এই জীবনের পর্যালোচনা করেন নি। যখন তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নূতন জগতে যাবেন, অন্য এক পৃথিবীতে পুনরায় জেগে উঠবেন, তখন জীবনকে কি চোখে দেখবেন তার ইঙ্গিত আছে। বর্তমান জীবনের এই রূপ পরবর্তী জীবনে সত্য না স্বপ্ন বলে মনে হবে, তাই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন—

তাই ভাবি মনে,
যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,

সবকিছু অন্য-এক অর্থে দেখি—
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি ?
সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে ?

এই কবিতা-দুটি সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "শুধু ক্ষণিক মৃত্যুভাবনার বিলাস নয়, এ যেন মৃত্যু দর্শন ঘটিয়াছে নিজের জীবনে. মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হইয়াছে—যে পরিচয় তাহার সমগ্র নিবিড়তা লইয়া ধরা পড়িয়াছে, কবির শেষতম কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে, রোগশয্যায়—আরোগ্য—জন্মদিনে—শেষ লেখায়। এ অনুভূতি এই প্রথম এবং একান্তই অভূতপূর্ব।"

৩. এখানে প্রেমের চিরন্তন, নিত্যনবীন রূপটির কথা বলেছেন। 'কৈশোরিকা', 'প্রত্যর্পণ', 'ছায়াছবি', 'নিমন্ত্রণ', 'পোড়োবাড়ি', 'ভুল,' 'ব্যর্থ মিলন', 'অপরাধিনী', 'ছবি', 'ক্ষণিক' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে প্রেমের অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

'কৈশোরিকা' কবিতায় কৈশোরের লীলাসঙ্গিনীর প্রেমকেই স্মরণ করেছেন। জীবন-পথের প্রত্যূষকাল থেকে এই প্রিয়া বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে কবির সঙ্গে প্রেমের অভিসার করেছেন। কবি অনুভব করছেন এক মহাসুদূরের পথে তাঁকে যেতে হবে—সে কথাও তিনি তাঁর কৈশোরিকার কাছে শুনেছেন। কৈশোরিকা তাঁকে এক নবজীবনের পারে নিয়ে এসেছে। কবিকে সে অনন্ত জীবনের নন্দন ফুলমালা অপূর্ব গৌরবে পরাতে চায়—

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহাদূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর—
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

'প্রত্যর্পণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার স্বরূপটি প্রকাশিত

হয়েছে। প্রেমিকার যথার্থ মূর্তি প্রেমিকের মনের কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি। কবি-প্রিয়া কবিকে কবির দানের চেয়ে গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ দান প্রত্যর্পণ করলেন। পুষ্পমাল্য শুধু নয়, কবি-প্রিয়া নিজেকে সমর্পণ করেই সেই অমূল্য দানের মর্যাদা রাখলেন। প্রিয়ের হাত থেকে প্রেমের পুষ্পমাল্য সে প্রেমেরই বিনিময়ে গ্রহণ করে নারী পুরুষের দানকে ধন্য করে, গ্রহণ করেই সে প্রেমের প্রত্যর্পণ ঘটায়।

বীথিকা-র প্রেমের কবিতাগুলি অধিকাংশই পুরানো স্মৃতিবহ। কবির প্রথম যৌবনে চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে যে উজ্জ্বল দিনগুলি কেটেছিল—তারই স্মৃতি চুয়ান্ন বছর পরে লিখিত বীথিকা-র কবিতা-গুলিতে ছায়াপাত করেছে।

'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি চন্দননগরের বাসকালে লিখিত। কবি তাঁর মানসীকে আহ্বান জানাচ্ছেন, এ মানসী চিরকালের, প্রতিটি প্রেমিকের মনে ধ্যানে ও কল্পনায় মানসীর যে মূর্তি অঙ্কিত কবির এই প্রেমিকাও তদ্রূপ। কবি এখানে প্রেমিকাকে ইচ্ছানুসারে আসার কথা বলেছেন। কবিতাটির মধ্যে অনেক সুধী সমালোচক বৌঠাকুরানী স্মৃতিকে উপলব্ধি করেছেন। এই অনুমান আমাদেরও অসঙ্গত মনে হয় না।

৪. কবি এই জীবনের মধ্যেই ঈশ্বরের স্পর্শ উপলব্ধি করেছেন। 'ধ্যান', 'সত্যরূপ', 'ছুটির লেখা', 'শ্যামলা', 'ছন্দোমাধুরী', 'কাঠবিড়ালী', 'বনস্পতি', 'হরিণী', 'দুইসখী', 'মাটিতে আলোতে', 'আশ্বিনে', 'দেবতা' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই সুরের।

'ধ্যান' কবিতায় কবি বিশ্বের যে প্রকাশকে ধ্যানে উপলব্ধি করেছেন তাকে তিনি অনন্তের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। কবি খণ্ড জীবনে অনন্তকে উপলব্ধি করেছেন তাই জীবনের আশা-নৈরাশ্য সুখ-দুঃখকে তিনি শেষ করে দিচ্ছেন। তিনি অনন্তের কাছে জীবনের সমস্ত কর্ম-কীর্তিকে সমর্পণ করতে চান।

> নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব—
> আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
> তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
> আমি-হীন চিত্ত-মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।

'সত্যরূপ' কবিতায় কবি বলেছেন যে, জন্মমৃত্যুর চঞ্চল লীলার মধ্যে এই

ক্ষণিক জীবনই তো স্বর্গের জ্যোতির্ময় দ্বীপ। চলমান ক্ষণস্থায়ী জীবনে কবি চিরন্তন সৌন্দর্যকে অনুভব করেছেন। এই ক্ষণ জীবনেই কবির উপলব্ধি ঘটে, তিনি মহাকাল দেবতার অন্তরের অতি নিকটে মহেন্দ্র মন্দিরে আছেন—

······বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তায় মোর রচি নিজ সীমা
আপন দেউটি।
সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী-মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে;
সেই তো বাখানে
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।

'ছন্দোমাধুরী' কবিতাটিতে কবি বিশ্বস্রষ্টার এক অপূর্ব শান্তরূপের কল্পনা করেছেন। রূঢ় কঠোর বাস্তব সংসারের মধ্যেও কবি বিশ্বস্রষ্টার আনন্দময় স্পর্শ অনুভব করেন।

জগতের এই নিষ্ঠুর লোভ, হিংসা হলাহল ও প্রলয়ের বিভীষিকার মধ্যে সৌন্দর্য-দূতী নৃত্যে গানে কর্কশকে পরাভূত করে রসের প্লাবন বইয়ে দেয়, শান্তি ও অমৃতের বাণী বহন করে আনে।—

ছন্দভাঙা হাটের মাঝে
তরল তালে নূপুর বাজে,
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে।
কর্কশেরে নৃত্য হানি
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।

'দেবতা' কবিতায় মর্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেমে কবি দেবতার আবির্ভাব অনুভব করেছেন। দেবতা মানুষের অনিত্যলীলায় মানবলোকে ধরা দিতে চায়, যেখানে সৌন্দর্য ও ব্যক্তিচেতনার অবসান সেখানেই বিশ্বপ্রাণের পরিচয় স্পষ্ট হয়। কবি অনুভব করেন তাঁর নিজের প্রাণ বিশ্বপ্রাণের মধ্যে ব্যাপ্ত—

মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,

ঝংকৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা ;
আকাশের অতিদূর সূক্ষ্ম নীলিমায়
সংগীতে হারায়ে যায় ;
...   .
মর্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

৫. বিবিধ রসের কিছু কবিতা লক্ষ্য করা যায়। এগুলির মধ্যে কোথাও বিষণ্ণতা, কোথাও রোমান্টিক অতৃপ্তি, কোথাও প্রকৃতি-প্রেম আবার কোথাও বা সাময়িক ঘটনার প্রকাশ। এই ধারার কবিতাগুলি হল—'পাঠিকা', 'মৌন', 'বিচ্ছেদ', 'বিদ্রোহী', 'গীতচ্ছবি', 'উদাসীন', 'দানমহিমা', 'ঈষৎ দয়া', 'রূপকার', 'মেঘমালা', 'কবি', 'সাঁওতাল মেয়ে', 'অন্তরতম', 'ভীষণ', 'সন্ন্যাসী', 'গোধূলি', 'পথিক', 'অপ্রকাশ', 'দুর্ভাগিনী', 'গরবিনী', 'প্রলয়', 'অভ্যুদয়', 'নুটু', 'মুক্তি', 'দুঃখী', 'মূল্য', 'নমস্কার', 'নিঃস্ব' প্রভৃতি।

পত্রপুট

১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসে কবি শান্তিনিকেতনে ছুটির অবসরে পত্রপুট-এর কবিতাগুলি লিখতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁর শরীর ও মন অসুস্থ ছিল, তা তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানতে পারা যায়। পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ কাল ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৩ সাল।

বিশ্বসৃষ্টি ও মানবসত্তার রহস্য, কবির নিজ জীবনের অন্তরতম সত্তার উপলব্ধি, এই প্রতীয়মান অনিত্যতার মধ্যে অসীম ও চিরন্তনের স্পর্শ এবং জীবনের সুখ-দুঃখের কথাই পত্রপুট-এর কবিতাগুলির বিষয়বস্তু। এই কবিতাগুলির সঙ্গে বীথিকা-র একটি ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

পত্রপুট-এর কবিতাগুলিকে বিষয় অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা। ২. ব্যক্তিগত জীবন ও আত্মোপলব্ধিমূলক কবিতা। ৩. মানবসত্তার স্বরূপ ও মানবপ্রীতিমূলক কবিতা। ৪. প্রেমমূলক কবিতা।

১. এই কাব্যের তিন, চার, পাঁচ, সাত, আট, নয় সংখ্যক কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক। এই কবিতাগুলিতে মর্ত্যপ্রীতি ও মর্ত্যজীবনের সীমায় অসীমের

ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত। মানবমহিমা ও মানব-প্রেমের পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়।

তিন সংখ্যক কবিতায় পৃথিবীর প্রতি অগাধ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদায়বেলায় তিনি পৃথিবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছেন। ১৩৪২ সালের পূজাবকাশে শান্তিনিকেতনে আলোছায়াময়ী প্রকৃতির রূপ উপলব্ধি করে কবিতাটি রচিত হয়।

এই পৃথিবীর নানা রূপ। কখনো সে স্নিগ্ধ, কখনো হিংস্র, কখনো অন্নপূর্ণা, কখনো অন্নরিক্তা, কখনো পুরাতনী, কখনো নিত্য-নবীনা—বিপরীত ললিত এবং কঠোরের সমন্বয়ে সে ভীষণ এবং মধুর। নানা বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি অখণ্ড ঐক্য বিরাজমান। কবিতাটির সঙ্গে ডারুইন-প্রবর্তিত বিবর্তনবাদের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ডারুইনের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনে যোগ্য যারা তারাই এই পৃথিবীতে টিকে থাকে। এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায় কবিতাটিতে।—

মহাবীর্যবতী তুমি, বীরভোগ্যা,
... ...
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামে,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

কবিতাটির পরবর্তী একটি অংশের সঙ্গে বার্গসঁ-এর Vital force বা প্রাণবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তিনি যে প্রকৃতি ও গতির কথা বলেছেন অর্থাৎ জড়ের বাধাকে অতিক্রম করে প্রাণের অগ্রগতির যে ধারণা তা এই কবিতাটির নিম্নলিখিত অংশে লক্ষ্য করা যায়—

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
... ...
জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পর যুগে
মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর মধ্যে নানা বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছেন। নানা বিপরীতের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্তি অগ্রসর হয়ে চলে—

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
... ...
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শতশত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছে তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

এই স্থানগুলিতে হেগেলের diabetical movement-এর কিছু ছায়া পড়েছে।

ব্যক্তি মানবের মৃত্যু হলেও সমষ্টিগত মানবজীবনধারা অব্যাহত। প্রকৃতি উদাসীনভাবে পুরাতনকে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নূতনকে সৃষ্টি করে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অব্যাহত রাখার জন্যই ব্যক্তিজীবনের মৃত্যু ঘটে ; ক্ষুদ্র জীবনের কোনো ফলবান খণ্ডকে পরম দুঃখে জয় করতেই ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা। পৃথিবীর এই নির্মম উদাসীনতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেও তিনি ক্ষণিক জীবনকে পরম দুঃখে জয় করে তাকে সত্য মূল্য দিতে চেয়েছেন—

...কোনো-একটি আসনের
সত্য মূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোন একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে ;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

মানসী-সোনার তরী যুগে বসুন্ধরার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে কবিমন আবেগচঞ্চল ও স্বপ্নমায়ায় আচ্ছন্ন।

তাই পৃথিবীর প্রতি ভালবাসায় রোমান্টিক অনুরাগ ও আকুলতা। কিন্তু পত্রপুট-এর কবিতাটিতে কবির অভিজ্ঞতা পুষ্ট জীবনানুভূতির পরিপক্ক ও মোহমুক্ত পরিচয়। এখানে কবি পৃথিবীকে অনন্ত প্রাণপ্রবাহ ও মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র বলে অনুভব করেছেন।

চার সংখ্যক কবিতায় কবির প্রকৃতি-প্রীতির নিবিড় পরিচয় আছে। ঋতুচক্রের আবর্তনে 'অসীমের চির-উৎসাহপূর্ণ' জীবন এবং কালপ্রবাহের পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছেন। সময় ও জীবন নিয়ত এগিয়ে চলে।—

মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না।
এক দিনেরও জন্য।

কবিতাটির শেষে একটি বিদায়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দয ও সমারোহের মধ্যেও বিদায়দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। কবির এই পর্যায়ের প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে একটি পরিণত চিন্তাশীলতা লক্ষ্য করা যায়। জীবনের ন্যায় প্রকৃতিও চলিষ্ণু, উভয়েরই স্মৃতিচিহ্নের প্রতি ফিরে তাকাবার অবসর নেই। জীবন ও কালের এই চিরকালীন যাত্রাকে অনুভব করেও কবি এই মর্ত্য জীবন-রস উপলব্ধি করেছেন উদাসীন নিরাসক্ত চিত্তে।

সাত সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে, জীবনের ছোট ছোট রসময় অমৃতময় মুহূর্তগুলিও নিরর্থক নয়। তারা নিখিল সৃষ্টিস্রোতের অঙ্গীভূত। বিশ্বসৃষ্টির রসধারা কবির প্রাণে যে আনন্দের সঞ্চার করেছে বিশ্বের ইতিবৃত্তে তার স্থায়িত্ব না থাকলেও সৃষ্টির প্রকাশকে সে সমৃদ্ধ করেছে। এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি নিয়ে কবি ঋতুর সভায় মালা গেঁথেছেন। সেই সৃষ্টি হয়েছে উজ্জ্বল আনন্দময়। কবির এই আনন্দ-চেতনায় বিশ্বসৃষ্টির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন—

বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।

আট সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে একটি নগণ্য বস্তুরও এই সৃষ্টিতে মূল্য আছে। একটি বুনো ফুলকে কেন্দ্র করে কবি বিশ্বসৃষ্টির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। কালপ্রবাহে বিশ্বসৃষ্টির যে পরিবর্তন তাতে এই বুনো ফুলেরও

ভূমিকা আছে। বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাসে অতীত ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত কালপরিধির মধ্যে একটি বুনো ফুলেরও স্থান আছে। এই ফুলের ফোটা-ঝরার মধ্যে সৃষ্টির আদিম সংকল্প জীবন্ত হয়ে ওঠে—

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে !

খ এই বিভাগের কবিতাগুলি হল এক, দুই, ছয়, দশ, বার, তেরো, পনেরো সংখ্যক।

জীবন-গোধূলিতে এসে কবি নানাভাবে নিজের জীবন ও মানসিক অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন।

এক সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে, জীবনের নানা সুখ-দুঃখের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে হঠাৎ কখনো সম্পূর্ণ সময়ের টুকরো এসেছে। কিন্তু কবি তাকে কাব্যে গেঁথে রাখতে পারেন নি, কেন না তাঁর আশঙ্কা ছিল যে প্রকাশের ব্যগ্র উত্তেজনার হয়তো তাঁর সৃষ্টি সহজতার সীমা ছাড়িয়ে যাবে। কবির মতে ধ্যানের দৃষ্টিতে সুন্দরকে উপলব্ধি করতে হয়, বাহ্যিক রূপের মধ্যে সুন্দরকে পাওয়া যায় না। তিনি অনুভব করতে পারছেন পৃথিবী আদিম অপ্রত্যাশিত আনন্দের মুহূর্তে কবি বেঁচে ছিলেন এবং এই বিস্মিত আনন্দবোধকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন এতেই তিনি ধন্য —

অপূর্ব সুর যেদিন বেজেছিল
ঠিক সেইদিন আমি ছিলেম জগতে
বলতে পেরেছিলেম –
আশ্চর্য !

ছয় সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর অন্তর সত্তাকে উপলব্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অতিথিবৎসল রূপে কল্পিত ভগবানকে তাঁব পথিক-চিত্তকে ঘরে স্থান দিতে প্রার্থনা জানিয়েছেন। ভগবানেব কাছে তাঁর আরও প্রার্থনা এই যে, ঈশ্বরের নিত্য জ্যোতির স্পর্শে ব্যক্তিসত্তার গ্লানি ও মালিন্য যেন দূর হয়ে যায়। ঈশ্বরের নিত্যসত্তার সঙ্গে মানবসত্তার পার্থক্য নেই। জাগতিক বস্তু ও উপকরণের আড়ালে মানবসত্তা আবৃত থাকে বলে তার স্বরূপ সব সময় উপলব্ধি

করা যায় না। মানব তার জাগতিক সত্তাকেই সত্য বলে মনে করে। তাই কবিসত্তার আবরণ উন্মোচন করে সত্যস্বরূপকে প্রকাশ করার জন্য ভগবানকে অনুরোধ জানিয়েছেন—

আপনাকে চেনার সময় পায় নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায় ;
পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারই সঙ্গে তার রূপের মিল।
... ...
হে অতিথিবৎসল,
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
সে পাক্ আপনাকে।

এই কবিতাটিতে অনেকে কবির মানব-প্রীতির পরিচয় পেয়েছেন, "শেষ পর্বে কবির মন সাধারণ মানুষের জন্যে প্রীতি ও প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এবং এ যুগের সকল গ্রন্থেই মানবপ্রীতির সেই স্বাক্ষর আছে ; অবহেলিত সাধারণ মানুষের প্রতি মমতার পরিচয়ই এই কবিতার মূল কথা।"[১]

দশ সংখ্যক কবিতাটির মূল প্রেরণা এসেছে উপনিষদের একটি মন্ত্র থেকে। এই কবিতাটি রচনার দিনে কবি প্যারিসে অধ্যাপক সিলভঁ্যা লেভির মৃত্যুর খবর পান। এই মৃত্যু সংবাদ হয়তো তাঁকে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক বিষয়ে জিজ্ঞাসু করে তোলে। এখানে তিনি আত্মার স্বরূপ সন্ধানে আগ্রহী। দেহের আবিল আবরণে আত্মার মুক্ত রূপ ঢাকা পড়ে। কবি প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান করেন। প্রাচীন ঋষিরা মানবাত্মার মহৎ স্বরূপকে অন্ধকারের পার থেকে উদিত আদিত্যবর্ণ সূর্যের মধ্যে দেখেছিলেন। কবিও আজ দেহ থেকে মনটাকে সরিয়ে ফেলে মানুষের অন্তরতম সত্তাকে অনুভব করতে চান।

বারো সংখ্যক কবিতাটি ১৩৩৩ সালের নববর্ষের দিন লিখিত। জীবনের অপরাহ্ণে খেয়া ঘাটের শেষ ধাপের কাছে বসে কবি বিগত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। কবি এখানে আত্মজীবনকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেছেন। কবিতাটিতে কবির কৈশোর যৌবনের স্মৃতির কথা আছে। মানব-ইতিহাসের

১. শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু : রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায় প্রথম খণ্ড (১৩৭৯), পৃঃ. ৭৪

স্রষ্টা যে নিত্যমানব তাঁকেও কবি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। কবি এখানে বলেছেন যে তিনি কবিসত্তার ভোগাসক্তিপূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু যে সত্তা জীবনকে নিত্যতার সন্ধান দেয় তাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। মালিন্যে আচ্ছন্ন তাঁর সত্তাকে কবি পাহাড়তলির নিস্তরঙ্গ হ্রদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঋতুর আবর্তনে সেখানে সৌন্দর্য ও মাধুর্য সৃষ্টি হলেও সে পাহাড়ের বন্ধন অতিক্রম করে, নিজের সীমানা ভেঙে ফেলে অবরুদ্ধ বাণীকে প্রকাশ করার জন্ত অন্তর্গূঢ় আবেগে নবজীবনের আকাঙ্ক্ষায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করে নি। মানুষের বঞ্চনা অন্যায় ও অত্যাচারের লৌহদুর্গে ইতিহাস বিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আবদ্ধ; এই দানবের বিরুদ্ধে দেবলোকের যে অভিযান তাতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। কেবল তিনি স্বপ্নে শুনেছেন সেই দেবকল্প মানবের গুরু গুরু ডমরু ধ্বনি, আর সমর-যাত্রীর পদপাত-কম্পন। যে মানবসত্তা পাপ, দুঃখ ও বিনাশের মধ্য দিয়ে নূতন সৃষ্টি করেন কবি তাঁকে অনুভব করতে পারেন নি, তবুও জীবন-সন্ধ্যায় তিনি কল্যাণকামী ইতিহাস-স্রষ্টা মহামানবকে প্রণাম জানিয়েছেন—

শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

পনেরো সংখ্যক কবিতায় কবির আত্মপরিচয় এবং কবিসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ আছে। কবি তাঁর সত্তাকে সর্ব সংস্কারবর্জিত, ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তাই তাঁর কাব্য সাধনা প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করে দেবলোক থেকে মানবলোকে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। কবির সাধনার সঙ্গে বাউলদের সাধনার সাধর্ম্য লক্ষিত হয়। বাউলদের মতই তিনি সর্বপ্রকার সংস্কার বন্ধনমুক্ত। তাই তিনি বলেন —

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

বাল্যকাল থেকে কবি 'নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা বাগানটিতে' 'ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর একলা বসে' সূর্যের কাছে আলোর মন্ত্র

গ্রহণ করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন অযুত নিযুত বৎসর পূর্ণ থেকে ঐ আলোকমণ্ডলে তাঁর বাস। বন্ধুহীন গোষ্ঠীচ্যুত কবি সত্যের সাধনা করেছেন অমৃত আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তিনি নিত্যকালের মানুষকে সংস্কারের গণ্ডীর বাইরে খুঁজে পেয়েছেন। তমসের পরপারে মহান মানুষকে দেখেছেন। যৌবনে তিনি নারীর সংস্পর্শে এলেন, উভয়ের আত্মার রহস্য উভয়ের কাছে অপরিচিত, তবু তাঁদের মিলন হল। কবির প্রেমের একটি দিক ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে জাগতিক নারীকে অনুভব করেছে, অন্যদিকে ধ্যান মূর্তিতে নারীর মালিন্যমুক্ত পূর্ণতর রূপ যেখানে মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতকে অনুভব করেছেন কবি।

কবিতাটির শেষাংশে সবিতার উপাসনা। প্রেমবোধ এবং দেবলোক থেকে মানবলোকে উত্তরণের কথা বলেছেন কবি—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
 স্থষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ—
আর স্থষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।
 আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
 আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
 মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

৩. এই ভাবধারার কবিতা হল ষোলো ও সতেরো সংখ্যক কবিতা।

ষোলো সংখ্যক কবিতাটির নাম 'আফ্রিকা'। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে। মুসোলিনির ইতালী আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা গ্রাস করে। এই যুদ্ধ ও অত্যাচারের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে কবিতাটিতে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পৌরোহিত্য করবার আমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতায় আসার আগের দিন অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে এই কবিতাটি রচনা করেন।

কবিতাটি কবির মানবতাবোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সভ্যতার গর্বে

উদ্ধত অত্যাচারী উপনিবেশবাদীদের প্রতি কবির আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

সতেরো সংখ্যক কবিতায় জাপানীরা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় জয়ী হবার জন্য অহিংসা মন্ত্রের উদ্‌গাতা ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে আশীর্বাদ ভিক্ষার জন্য গিয়েছিল। এখানে ধর্মের নামে মিথ্যাচারকে কবি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। এই কবিতাটির ছন্দোবদ্ধ রূপ হল নবজাতক-এর 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি।

৪. এই গ্রন্থের প্রেমমূলক কবিতার সংখ্যা হল দুই, এগারো এবং চৌদ্দ সংখ্যক কবিতা।

এগারো সংখ্যক কবিতাটি ১৩৪৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে 'উদাসীন' নামে প্রকাশিত হয়। একদিন বসন্ত কবির প্রাণে যে উন্মাদনা জাগাত আজ বার্ধ্যক্যে কবি প্রকৃতিতে সেই রূপমুগ্ধতা অনুভব করতে পারছেন না। যৌবনে কাব্যশ্রী কবিকে যে আনন্দ ও চঞ্চলতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এখন সেভাবে তাঁকে উজ্জীবিত করতে পারছে না। সেই নারী কবির কাছে এখন বাণীহারা চাঁদের মত হলেও তিনি জানেন তাঁরই মনের রঙে সে নিজেকে রঙীন করেছিল। আজ কবিকে সে রূপসুধা থেকে বঞ্চিত করে নিজেকেই সার্থকতা থেকে বঞ্চিত করেছে। এখন কবির মনে তাঁর মাধুর্য যুগের ভগ্নাবশেষ রয়ে গেল। তিনি সেই নারীর মধুর স্মৃতির মধ্যে বাস করছেন। কিন্তু সে নারী নিজের কৃপণতায় মায়াশূন্য মরুদেশে রয়েছে।

চৌদ্দ সংখ্যক কবিতাটি লঘু রোমান্টিক রসের অনাবিল স্বচ্ছতায় স্নিগ্ধ ও সুন্দর। কবি তাঁর ধ্যানরূপিণী তরুণীকে বলেছেন চিরন্তনী। একালে কবি যতই পুরানো বলে প্রতিভাত হোন তবু তিনি প্রেমের আসরে গানের জোগান দিতে পারবেন, সেই গানে প্রেমিক-প্রেমিকা নিজেদের নূতন করে আবিষ্কার করবে। কবি তাঁর যৌবনের সুর একালের নববসন্তে রেখে যেতে চান। আজকের প্রেমিকার মনে সেদিনের সুর বিস্মৃত বেদনার আভাস এনে দিক। অতীতে যখন তিনি প্রিয়বন্দনা করেছেন তখন এই প্রেমিকা ছিল না, আবার যখন সে পৃথিবীতে থাকবে না তখনও সে কবির কাব্যে অমর হয়ে থাকবে—

ওগো চিরন্তনী,
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।

শ্যামলী

১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসে শ্যামলী প্রথম প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতনের মাটির ঘর শ্যামলীর নামানুসারে এই কাব্যের নামকরণ করা হয় শ্যামলী। শেষ সপ্তক-এর চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায় এই ঘরের কথা আছে—

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।

এখানে কবির মৃত্তিকাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মাটিকে ভালবাসেন। মাটি জীবনের সব অপূর্ণতা, বেদনা ও কলঙ্ককে শ্যামল দূর্বাদলে ঢেকে রাখে। বাংলাদেশের মাটির রঙ শ্যামল, রূপস্নিগ্ধ এই বাংলাদেশের মেয়েকে তিনি ভালবেসেছেন। তার চোখে মাটির শ্যামল অঞ্জন, কচি ধানের চিকন আভা। কবির কাছে বাঙালী মেয়েও শ্যামলী। শ্যামলী গ্রন্থের শেষ কবিতাটি ঐ মাটির ঘরকে নিয়ে লেখা। এই গ্রন্থের প্রেমের কবিতাগুলিতেও স্নিগ্ধ শ্যামলা বাঙালী মেয়ের কথা।

মাটির ঘর শ্যামলীতে বাসই চির-পথিক মানবাত্মার পক্ষে উপযুক্ত মনে হয়েছে কবির। ইট-পাথর দিয়ে গাঁথা ভিত বন্ধনের প্রতীক। মাটির ঘরের মধ্যে আছে একটি উদাসীন নিরাসক্তির ভাব। মাটির ঘর বাঁধা সহজ, আবার ভেঙেও যায় সহজে। তাই কবি 'শ্যামলী' কবিতায় বলেছেন—

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে
আমার ভাঙাভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি, আবার যেদিন যাই চলে।

অন্যান্য গদ্য-কবিতার ন্যায় সুর শোনা গেছে শ্যামলী-তে। এই কাব্যের কবিতাগুলিকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. আখ্যানমূলক কবিতা। ২. প্রেমমূলক কবিতা। ৩. বিশ্বপ্রকৃতিমূলক কবিতা। ৪. মানবসত্তার অপরিমেয়তা, মৃত্যুর মহিমা ও রহস্য-সম্পর্কিত কবিতা।

১. 'কনি', 'অমৃত', 'দুর্বোধ' ও 'বঞ্চিত' এই জাতীয় কবিতা। এই কবিতাগুলির মধ্যে ছোট গল্পের গাঢ় সংহতি লক্ষ্য করা যায়। এই

কবিতাগুলির মধ্যে অতীত প্রেমের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখানে প্রেমের তীব্রতা আছে, বেদনা আছে, কিন্তু ব্যাকুলতা বা হতাশা নেই।

'কনি' কাহিনীকাব্য। রবীন্দ্রনাথ বিরহের মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। এখানে কবি বলতে চেয়েছেন, যে প্রেম সম্পর্ক সমাজের প্রতিকূলতায় বাধাপ্রাপ্ত হয় তা নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজেকে চরিতার্থ করতে চায়। এখানেই প্রেমের ট্র্যাজেডি ঘটে।

'দুর্বোধ' কবিতায় নাটকের নায়ক কুশল সেনকে ভালবাসে নায়িকা নবনী। নবনীকে কুশলের কোন প্রয়োজন নেই, তাই সে নবনীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে। নবনী মনে করেছিল যে, দীনতা ও ক্ষুদ্রতার মধ্য দিয়েই কুশলের হৃদয় জয় করবে—

'ঘাস যেমন দিনে দিনে নেয় ঘিরে কঠোর পাহাড়কে।'

কুশল দূরে চলে গেল। সম্পর্ক রইল শুধু চিঠির মাধ্যমে। ফিরে এসে কুশল নবনীকে বিয়ে করতে চাইলে নবনী কুশলের ভালবাসার স্বীকৃতিতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নায়ক-নায়িকার প্রেমের এই দুর্বোধ্য রহস্যকে কবি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

'মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, স্পষ্ট নয় কোনো পক্ষই ;
যেটুকু সুখ দেয় বা দুঃখ দেয় স্পষ্ট কেবল সেইটুকুই।'

তারপর কুশলের মুখ দিয়ে কবি জানিয়েছেন যে প্রেমপাত্রী দৃষ্টির বাইরে থেকে ক্রমে সৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তখন শুধু তার মাধুর্যটুকুই মনে থাকে, অন্য সবকিছু গৌণ হয়ে যায়। সেই সময় প্রেমিক সহজভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে এবং ভাষালংকারে প্রেমিকার স্মৃতি মূর্তিকে সাজিয়ে তুললে সে এক নূতন রচনা হয়ে ওঠে। এই জন্যই খ্রীষ্টান শাস্ত্রে বলে সৃষ্টির আদিতে ছিল বাণী।

২. 'দ্বৈত', 'শেষ প্রহরে', 'হারানো মন', 'সম্ভাষণ', 'বাঁশিওয়ালা', 'মিলভাঙা', 'হঠাৎ-দেখা', ও 'অপর পক্ষ' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে প্রেমমূলক কবিতা বলা যায়।

শ্যামলী-র প্রেম-কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শমূলক রোমান্টিক প্রেম-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে প্রেমের চিরন্তন রহস্যেরই নানারূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কবিতাগুলিতে আবেগ সীমিত হলেও কল্পনার প্রসার এবং পরিণত চিন্তাশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

শ্যামলী-র প্রেম-কবিতাগুলির দুটি ধারা। কোন কোন কবিতায় কবি দাম্পত্য-জীবনের মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন, আবার কখনও বা নৈর্ব্যক্তিকভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তিগত প্রেমের উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্মৃতিচারণা লক্ষ্য করা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা বস্তুকেন্দ্রিক হলেও স্থানে স্থানে তা বস্তুর সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। সাধারণ নারী তাই অসাধারণ হয়ে উঠেছে। প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি ও মালিন্যকে দূর করে কবি বাস্তবাতীত প্রেমলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শ্যামলীর প্রেম-কবিতাগুলি স্তিমিত আবেগ ও নিবিড় উপলব্ধির ছোঁয়ায় পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

'দ্বৈত' কবিতায় কবি বলেছেন প্রেমিকা প্রেমিকের মনের সৃষ্টি। প্রেমিকের মনের ভাবে ও কল্পনায় প্রেমিকা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। প্রেমিকার সমস্ত অসম্পূর্ণতা প্রেমিকের প্রেমেই পূর্ণ হয়। প্রেমিকের প্রেমের মধ্য দিয়েই প্রেমিকার সত্যকার সার্থকতা।—

আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে।
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

'হঠাৎ-দেখা' কবিতায় প্রেমের বিরহ-ভাবুকতাই উপজীব্য হয়েছে। কবির মতে প্রেমিকের চিত্তে প্রেমিকার জন্য প্রেমানুভবের মৃত্যু নেই। বাস্তব সংসারে প্রেম দৃশ্যমান না হলেও মনের গভীরে তার অস্তিত্ব থাকে। তাই বহুকাল পরে রেলগাড়ির কামরায় প্রেমিক-প্রেমিকার হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে আবার চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রেমিকা যখন জিজ্ঞাসা করে তাদের বিগত দিনের কিছু বাকি আছে কি না, প্রেমিক বলেছে—

'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।'

৩. এই ধারার কবিতা হল 'প্রাণের রস', 'স্বপ্ন', 'তেঁতুলের ফুল' ও 'শ্যামলী'।

'প্রাণের রস' কবিতায় কবি জীবন-গোধূলিতে নির্লিপ্ত অবকাশের মুহূর্তে প্রকৃতিকে নূতনভাবে অনুভব করেছেন। বিশ্ব-নিসর্গে যে প্রাণের অফুরন্ত

প্রবাহ তার মধ্যে কবিপ্রাণও অঙ্গীভূত। নিজের প্রাণকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত করে আপন চেতনায় বিশ্ব-প্রাণের স্পর্শরস অনুভব করেছেন। বর্তমান জীবনের সমস্যায় আজ আর তিনি বিচলিত নন। মৃত্যুর ভয়ও তাঁর নেই, কারণ প্রকৃতির মধ্যেই তিনি প্রাণের অমৃতময় অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন।

'স্বপ্ন' কবিতায় শ্রাবণের ঝড়ো রাত্রিতে প্রাচীন কালের নারীর কথা মনে করেছেন কবি। কিন্তু একালের আধুনিকা নারীর ছায়ায় অতীতযুগের ছবি কবির চোখে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না। সেই নারীর সঙ্গে বর্তমান কালের নারীর আচার-আচরণ এবং বসনভূষণের পার্থক্য আছে। তবু অতীতের কবি শ্রাবণ রাত্রে যে নারীকে স্বপ্ন দেখতেন তার সঙ্গে বর্তমান কবির স্বপ্নে মিল আছে।—

শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই রয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

কল্পনা কাব্যগ্রন্থের 'স্বপ্ন' কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগে প্রয়াণ করেছেন। কবি কালিদাসের উজ্জয়িনীপুরে শিপ্রানদী তীরে কবি তাঁর পূর্ব-জন্মের প্রথম প্রিয়া মালবিকাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। বর্তমান কবিতায় তিনশো বছর পূর্বেকার বৈষ্ণব কবির নায়িকার সঙ্গে আধুনিক নারীর মিল না দেখলেও উভয় যুগের স্বপ্নের মধ্যে একটা সাদৃশ্য অনুভব করেছেন।

'তেঁতুলের ফুল' কবিতায় তেঁতুলের ফুলকে কেন্দ্র করে কবির জীবনেতি-হাসের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। তেঁতুলের ফুল অভিজাত ফুলের দলে পড়ে না, তাই কবি কোনদিন তার প্রতি আগ্রহ দেখান নি। আজ এই ফুলকে দেখে কবির মনে বিশেষ ভাবের উদয় হল। কবির মনে পড়ল তাঁর শহরের বাড়ির সুপ্রাচীন তেঁতুল গাছকে। কালের পরিবর্তন হয়েছে, কবির জীবনেও হয়েছে অনেক পরিবর্তন, কিন্তু মানব-ভাগ্যের উত্থান-পতনের প্রতি নির্লিপ্ত হয়ে আজও সেই আত্মসমাহিত তেঁতুল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়-বাদলের দিনে গাছটিকে ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনারত মুনির মতো মনে হতো, ইটকাঠের মূক জড়তার মধ্যে মহারণ্যের প্রতিনিধি বলে মনে হতো, আবার বসন্তের দিনে তাকে তিনি ঋতুরাজের বাইরের দেউড়ির উদ্ধত দ্বারী বলে জেনেছেন। সেদিন তার রূঢ় বৃহৎ রূপের অন্তরে সুন্দরের নম্রতা ও বসন্তের সভায় তার কৌলিন্যকে কবি উপলব্ধি করতে পারেন নি। আজ ফুলের পরিচয়ে তেঁতুল গাছকে

দেখছেন, তার সুন্দরের সাধনাকে অনুভব করতে পারছেন। তিনি মনে করছেন ঐ প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবন-মদিরতা যদি অতীতে উপযুক্ত লগ্নে বুঝতে পারতেন তবে তাঁর প্রেয়সীকে ফুলের একটি গুচ্ছ উপহার দিতেন।

৪. এই ভাবধারার কবিতাগুলি হল 'আমি', 'চিরযাত্রী', 'কালরাত্রে' ও 'অকাল ঘুম'।

'আমি' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে কাব্যরসের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। কবি মানুষের অন্তরতম সত্তাকে অসীমের অংশরূপে কল্পনা করেছেন। একেই কবি বলেছেন 'আমি'। অসীমই 'আমি' রূপে অর্থাৎ মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়ে সৃষ্টিকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। মানুষের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির রূপ রস ফুটে ওঠে এবং এই 'আমি'র মধ্য দিয়েই বিধাতা তাঁর সৃষ্টির মাধুর্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

ও দিকে, অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
এই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হোল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

এই 'আমি' না থাকলে বিশ্বসৃষ্টির কোনো অর্থ থাকত না। কবিত্বশূন্য বিধাতা নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে একা বসে থাকতেন এবং তাঁর কাছে সৃষ্টি সৌন্দর্যশূন্য ও প্রেমবিহীন বলে প্রতীয়মান হত। এই কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি' যুগের চিন্তাধারার সাদৃশ্য আছে।

'চিরযাত্রী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানবসত্তাকে চিরপথিকরূপে কল্পনা করেছেন। পথিকরূপী এই মানবসত্তা বার বার জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়া করে, মানবপ্রাণ চিরকাল নূতনের অভিসারী। মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধক সন্ধানী তাঁরা নবীন প্রেরণায় নব-সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যান, তাঁরাই মৃত্যুকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেন অনাগতের দিকে। যারা বস্তু আঁকড়ে পড়ে থাকে তারা বেঁচে থেকেও মৃতের তুল্য। মানুষের এই অগ্রগতি ব্যাহত হলেই

তার সর্বনাশ ঘটে। মানুষের অন্তরের প্রেরণাই তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই প্রেরণাতেই মানুষ সীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে অমরতা লাভ করে।

'অকাল ঘুম' এবং 'কালরাত্রে' কবিতা দুটিতেও কবি মানুষের অন্তর-সত্তার বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষ খণ্ড দেশ-কালে বদ্ধ হলেও অসীমের অংশ। কোন দুর্লভ মুহূর্তে মানুষের সেই পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

খাপছাড়া

এই গ্রন্থটি ১৩৪৩ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। এখানে শিশুদের উপযোগী কয়েকটি ছড়ায় হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে। অদ্ভুত, অবাস্তব ও পরস্পর-বিরোধী উক্তির সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন—

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।

ছড়ার ছবি

এই গ্রন্থটি ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। এটি কোন হাস্যরসাত্মক রচনা নয়। ছড়ার-ছন্দে শিশুদের উপযোগী কতগুলি গল্পচিত্রের সমষ্টি। বাংলাদেশের ছড়াগুলিকে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ আসন দান করেন। বাল্যকালে বাংলাদেশে প্রচলিত ছড়াগুলি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ছড়ায় মুখের ভাষার কাছাকাছি চলতি শব্দের ব্যবহার এবং সহজ স্বরবৃত্ত ছন্দের দোলা এদেশের শিশুচিত্তের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্তকেও দোলায়িত করেছিল। ছড়ার ছবি শিশুদের জন্য রচিত হলেও এর মধ্যে স্থানে স্থানে রচনার পারিপাট্য ও ভাবের গাম্ভীর্য চোখে পড়ে। যেমন—

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে,
হাঁসের পাতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে—
জানিনে মন-কেমন-করা লাগত কী সুর হাওয়ার
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার।
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আঁকিয়ের লেখা
ঝিকিমিকি সোনার রঙে হাল্‌কা তুলির রেখা।

ছড়ার ছবি, 'পদ্মায়'

প্রান্তিক

প্রান্তিক প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের পৌষ মাসে। এই বৎসর ভাদ্র মাসে কবি নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হন। এই সময় কবি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। কবির চেতনা লুপ্তি গুহা হতে মুক্তি লাভ করল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে কবি জীবন সম্পর্কে প্রশান্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করলেন। মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কবি জীবনের সত্য পরিচয় লাভ করলেন। এই কাব্যের ১৮টি কবিতার মধ্যে ১৬টিই মৃত্যু-বিষয়ক। এবং অন্য দুটি কবিতা কবির সাম্প্রতিক সমাজচিন্তা-প্রসূত। এর অধিকাংশ কবিতাই মাত্র তিন মাসের মধ্যে রচিত। মৃত্যুর প্রেরণায় লেখা হলেও কবিতাগুলির মূল কথা জীবন।

'প্রান্তিক' নামটি গভীর অর্থময়। কবির জীবন-চৈতন্য লুপ্তি গুহায় অবরুদ্ধ হল। 'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে' মৃত্যুদূত তাঁর শিয়রে এসে উপস্থিত হল। ক্ষণকালের জন্য সবই হয়ে গেল তন্দ্রাতুর স্বপ্নাচ্ছন্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-অন্ধকারকে জয় করল চৈতন্যের আলোক-প্রবাহ কবির নবচেতনার উন্মেষ হল। ১ সংখ্যক কবিতা—

> ··নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
> স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।

মৃত্যুর প্রসাদবহ্নিতে কামনার আবর্জনা, ক্ষুধিত অহমিকার রাশিকৃত জঞ্জাল দগ্ধ হয়ে যাক, জীবন আলোকিত হয়ে উঠুক ২ সংখ্যক কবিতায় কবির এই প্রার্থনা।

৩ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যখন অদৃশ্য আঘাতে 'এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র' ছিন্ন হয়ে গেল, তখন 'অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে' কবি নয়ন মেললেন। বিশ্বসৃষ্টির কর্তার পরিচয় তাঁর সামনে হল অবারিত। তিনি অনুভব করলেন তাঁকে শূন্য দিগন্তের ভূমিকায় নূতন জীবনচ্ছবি রচনা করতে হবে।

৪ সংখ্যক কবিতায় জীবনের বিচিত্র কাজের কথা বলেছেন কবি। জীবনের অসংখ্য বেচাকেনা ও আশাপ্রত্যাশার কোলাহলে, বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে সংসারের বিভিন্ন প্রকাশে জীবনে সত্য অবলুপ্তপ্রায়। কিন্তু মৃত্যুর আরতি শঙ্খধ্বনিতে—

…মনে হল,
পরের দুখের মূল্য হতে মুক্ত, সব চিহ্নমোছা
অসজ্জিত আদিকৌলিন্যের শান্ত পরিচয় বহি
যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীতমন্দিরে
একাকীর একতারা হাতে।

৫ সংখ্যক কবিতায় অতীতের সঙ্গে বোঝা-পড়া, ত্যাগ ও ভোগের যৌথ প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে কবি মুক্তির সন্ধান করেছেন। অতীতের যা কিছু বেদনার ধন কামনার ব্যর্থতা সব মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে কবি মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মতো ভারমুক্ত হতে চেয়েছেন। এই মুক্তি পৃথিবীকে বর্জন করে নয় বরং তার আনন্দরসে অবগাহন করে নিজেকে গভীরভাবে অনুভবের মধ্যে। ৬ সংখ্যক কবিতায়—

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি।

৭ সংখ্যক কবিতাটি কবির জীবনকে স্বীকৃতি-দানের ইতিহাস। জীবনেই তিনি অপূর্ব ও অনির্বচনীয়ের উপলব্ধি করেছেন।

৮, ৯ এবং ১০ সংখ্যক কবিতায় কবির দৃষ্টি ঔপনিষদিক আত্মোপলব্ধির গভীরে নিমগ্ন। কবি মনে করছেন এতদিন যে সাজে তিনি আপনার পরিচয় রচনা করেছেন, মৃত্যুদূতের স্পর্শে আজ তা নিরর্থক মনে হচ্ছে। বাইরের বর্ণপ্রসাধন আজ মুছে গেছে, আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা উপলব্ধি করেছেন। অবসন্ন চেতনার গোধূলি লগ্নে যখন দেহ ও স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসছে, সমগ্র বিশ্ব-বৈচিত্র্যের উপর নেমেছে এক কৃষ্ণ যবনিকা, তখন সেই তমসার পারস্থিত মহান পুরুষের জ্যোতির্ময়, কল্যাণতম রূপকে কবি প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন। মৃত্যুর পরপারে কবি জ্যোতির জ্যোতিকে উপলব্ধি করলেন। এতদিন তাঁর দৃষ্টি তাঁরই ছায়া-আচ্ছাদিত ছিল। সৃষ্টির সীমান্তে এই জ্যোতি-স্বরূপের দর্শনই কবির চরম আকাঙ্ক্ষা। এই চরমের কবিত্বের মর্যাদা লাভের জন্যই কবি এতকাল জীবন-রঙ্গভূমিতে তান সেধেছেন। ১০ সংখ্যক কবিতায়—

…লব আমি চরমের কবিত্বমর্যাদা

জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান।
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি—
তাই ফিরাইয়া দিলে। আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি-'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।

কবির দৃষ্টি ঔপনিষদিক জ্যোতির ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছে। তিনি মহামুক্তির স্বাদ পাবার জন্য ব্যাকুল। ১১ এবং ১২ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন এই পৃথিবীর কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে এবং লোকমুখের নিন্দা-খ্যাতি থেকে তিনি সরে যেতে চান। জাগতিক খ্যাতি সম্মানই তাঁর কাম্য নয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ১২ সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে—

··· এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নব বসন্তের
আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছ যথা।
যার লাগি আশাপথ চেয়ে আছ সে নহে সম্মান,
সে যে নবজীবনের অরুণের আহ্বান-ইঙ্গিত—
নবজাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক।

১৩, ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক কবিতায় কবির মন নিরাসক্ত ছুটির আনন্দে পূর্ণ। জীবনের বন্ধনই শেষ কথা নয়, মানবাত্মার গতি অনন্তের পানে, তার সখ্যতা সূর্য নক্ষত্রের সঙ্গে। পৃথিবীকে ত্যাগ করার পূর্বে, পথচিহ্নহীন অস্তসিন্ধুপারে কুলায় রিক্ত করে উড়ে যাওয়া পাখীর মত তিনিও অনন্ত অভিমুখে যাত্রার পূর্বে বসুন্ধরার আতিথ্য এবং প্রীতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন ১৪ সংখ্যক কবিতায়—

···এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

১৫ সংখ্যক কবিতায় কবি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিজেকে নূতন রূপে দেখেছেন—তিনি যেন 'তীর্থযাত্রীর অতিদূর ভাবীকাল হতে মন্ত্রবলে' ভেসে এসে বর্তমান

শতাব্দীর ঘাটে এই মুহূর্তে পৌঁছেছেন। তাঁর উপর থেকে প্রাত্যহিকতার আবরণ সরে গেছে, নিজের বাইরে নিজেকে দেখেছেন 'অপর যুগের কোনো অজানিত'-এর মতো। সর্ব দেহ মন থেকে অভ্যাসের জাল ছিন্ন হয়েছে, তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয় ঘুচে গেছে, তাঁর মন আজ ছুটির নিরাসক্ত আনন্দে পূর্ণ—

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত সম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

একদিকে কবিচিত্ত গভীরের ধ্যানে নিমগ্ন, অন্যদিকে বর্তমান কালের রাজনীতির 'স্পর্ধিত ক্রূরতা' ও 'মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার'-এ কবিচিত্ত বিচলিত। পৃথিবী জুড়ে মানুষের তীব্র অপমান, অত্যাচার, অবিচার, ধ্বংস ইত্যাদি ঘটনায় কবি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ২৫শে ডিসেম্বর খ্রীষ্ট জন্মদিনে কবি প্রান্তিক-এর শেষ দুটি কবিতা রচনা করলেন। পৃথিবীতে এই তীব্র অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রকঠিন অভিসম্পাত ধ্বনিত হয়ে উঠল ১৭ সংখ্যক কবিতায়—

মহাকালসিংহাসনে—
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন—
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

মনুষ্যত্বের অপমানে আহত কবি বিদায় লগ্নে আহ্বান জানিয়েছেন মানুষকে ১৮ সংখ্যক কবিতায়—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

সমসাময়িক ঘটনার আলোড়ন কবির চিত্তের প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যকে কখনও

কখনও বিচলিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতায় স্থানে স্থানে তার প্রতিফলন আছে। প্রান্তিক-এর পরবর্তী কাব্যগুলিতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

সেঁজুতি

গ্রন্থটি ১৩৪৫ সালের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত হয়। এখানে মোট ২৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতারই বিষয়বস্তু হয়েছে বিগত জীবনের স্মৃতি এবং আসন্ন মৃত্যু-ভাবনা। এই অনিত্য জীবন ও জগতের মধ্যেই তিনি অসীমের স্পর্শ পেয়েছেন। এই ধারণাও সেঁজুতি-র কবিতাগুলির বিষয়বস্তু হয়েছে।

সেঁজুতি কথাটির অর্থ হচ্ছে সন্ধ্যা-প্রদীপ। নামকরণের দিক দিয়ে এটি খুবই সার্থক হয়েছে, এ যেন সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে বিগত জীবনের হিসাব করা এবং মৃত্যু-রাত্রির জন্য শান্তভাবে প্রতীক্ষা করা।

কবি এই গ্রন্থটি ডা. নীলরতন সরকারকে উৎসর্গ করেছেন। ইনিই কবিকে ১৩৪৪ সালের ব্যাধি মুক্ত করেছিলেন। উৎসর্গ-পত্রেই কবি বলেছেন মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বর থেকে ফিরে নিজেকে তিনি নূতনভাবে আবিষ্কার করলেন। মর্ত্যের রঙ্গভূমিতে যে প্রাণ-চেতনা সুখ-দুঃখের নাট্যলীলায় রত ছিল সে যেন তাঁকে আজ 'অচিহ্নিতের পারে', 'অরূপ লোকের দ্বারে', নিয়ে গেল। তাঁর দূর-প্রসারিত দৃষ্টিতে ধরা পড়ল—

আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমি ঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।

সে ভাষার চরম অর্থকে কবি বুঝতে পারেন নি। তবু সেই ভাষাতেই তিনি ছন্দের ডালি সাজিয়েছেন।

সন্ধ্যালোকে কবি নিজের মুখোমুখি বসেছেন। বিগত জীবনের স্মৃতির সঙ্গে মিশেছে আসন্ন বিরহ-বেদনা; এই পৃথিবী তাঁকে ত্যাগ করতেই হবে। তবু এই মর্ত্যের অমরাবতীই তাঁকে জীবনের সার্থকতা এবং মহাজীবনের ইঙ্গিত দিয়েছে।

সেঁজুতি-র কবিতাগুলির মূল ভাব হল আত্মজীবন-সমীক্ষা এবং আসন্ন মৃত্যুর

প্রতীক্ষা। 'জন্মদিন' শীর্ষক ছুটি কবিতা, 'পত্রোত্তর', 'যাবার মুখে', 'অমর্ত্য', 'নিঃশেষ', 'প্রতীক্ষা', 'পরিচয়', 'পলায়নী', 'সন্ধ্যা', 'ভাগীরথী', 'তীর্থ-যাত্রিনী', 'নতুন কাল,, 'পালের নৌকা' প্রভৃতি কবিতায় এই ভাবধারা ব্যক্ত হয়েছে।

'জন্মদিন' সেঁজুতি-র একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। সমগ্র কবিতাটি জুড়ে রয়েছে কবির আত্মবিশ্লেষণ। কবিতাটি শুরু হয়েছে 'মরণের ছাড়পত্র নিয়ে', কবি অনুভব করেছেন তাঁর ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে আসছে। মানুষের চিরন্তন আত্মশক্তিকে এই পৃথিবী আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। জগৎ ও জীবনের বন্ধন ও আসক্তির ডালি ও অপবিত্র সঞ্চয় সে ভগ্ন মৃৎপাত্রের মধ্যে ফেলে যায়। মানবাত্মা জাগতিক বন্ধনের উর্ধ্বে জ্যোতির্ময় ও আনন্দময়। তবুও তিনি এই ধরণীর ঋণ স্বীকার করেছেন। পৃথিবীর মাটির পাত্রেই সঞ্চিত রয়েছে অমৃত। জীবনের প্রতি অটুট ভালবাসা নিয়েই তিনি যাত্রা করবেন—

…তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা ; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে ; দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌনবীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।—

… …

আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এ পারের ভালোবাসা—বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

সেঁজুতি-র অন্যান্য কবিতাগুলিতে 'জন্মদিন'-এর মত ছন্দ, ধ্বনি ও বক্তব্যের সমুন্নত মহিমা দেখা যায় না। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই অতীত স্মৃতি রোমন্থন প্রধান হয়ে উঠেছে। 'পত্রোত্তর' কবিতায় কবি 'পরমের সুরে চরমের গীতিকলা'কে উপলব্ধি করার জন্য উৎসুক। এই মর্ত্যের বুকেই আলোকধামের আভাস 'অমৃত পাত্রে' ঢাকা আছে। তার আহ্বানে কবির কণ্ঠে জেগেছে বিস্মিত সুর, তাঁর মন চলে গেছে ধূলিময় বাধাবন্ধ এড়িয়ে বহু দূরে। কবি

সংসারের দুঃখ, দৈন্য, কুশ্রীতাকে দেখেছেন তবু তারই মধ্যে শুনেছেন শান্ত শিবের বাণী। তিনি দেখেছেন আত্মহারা নিখিলের অন্তবিহীন প্রাণের উৎসব-যাত্রা, সেই নৃত্যলীলার ছন্দ তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গায়িত করেছে। তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মুক্তি লাভ করবেন—

ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে—
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্যতারার সাথি।

'যাবার মুখে' এবং 'অমর্ত্য' দুটি কবিতার মধ্যেই তিনি তাঁর মর্ত্যজীবনের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। এই ধরণীর কাছেই তিনি তাঁর আত্মস্বরূপের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর বস্তু-দেহের অতীত অনির্বচনীয় আনন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

'পলায়নী' কবিতায় কবি সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যাওয়ার শোভাযাত্রা উপলব্ধি করেছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নগর-নগরী সব ছুটে যাচ্ছে। কবিও সেই স্রোতে ভেসে যেতে চেয়েছেন—

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস নে আপনারে,
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যা রে।

কবিতাটির সুরের সঙ্গে বহুকাল পূর্বে রচিত, ক্ষণিকা কাব্যের 'উদ্‌বোধন' কবিতার সুরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'পলায়নী'-তে বলেছেন—

ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে
তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে,
যে সুর বাজিল মিলাতে মিলাতে
তাই কান দিয়ে শোনো।

'উদ্‌বোধন কবিতায় বলেছেন—

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।

সেঁজুতি কাব্যের মূল সুর মৃত্যুকেন্দ্রিক। 'সন্ধ্যা'-য় কবি মৃত্যুর সীমানায় জীবনের নূতন পরিচয় পেলেন।—

সন্ধ্যা ওগো, কাছের তুমি,
ঘনিয়ে এসো প্রাণে,—
আমার মধ্যে তারে জাগাও
কেউ যারে না জানে ;
ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি
একলারই দীপখানি,
মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ,
কাছাকাছি বসার,
অতি-দেখার আবরণটি খসার।
সব-কিছুরে সরিয়ে করো
একটু-কিছুর ঠাঁই—
যার চেয়ে আর নাই।

'ভাগীরথী' এবং 'তীর্থযাত্রিনী' প্রভৃতি কবিতাতেও কবির মৃত্যুচিন্তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। জীবনপ্রান্তে এসে মৃত্যুভয় কবির দূরীভূত হয়েছে। তাই কবির অন্যতম প্রার্থনা এই জীবনের শেষ ঘাটে—

নিরুদ্দেশ যাত্রীর ললাটে
স্পর্শ দিক আশীর্বাদ তব,
নিক সে নূতন পথে যাত্রার পাথেয় অভিনব।

—সেঁজুতি, 'ভাগীরথী'

সেঁজুতি কাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কবির কাল-সচেতনতা। কবির এই সময়কার লেখায় 'কালের যাত্রার ধ্বনি' স্পন্দিত। অতীত চিন্তা নূতন রূপে দেখা দিয়েছে। 'নতুন কাল' কবিতায় কবি জীর্ণ পুরাতনের পরিবর্তে নূতনের আগমনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবিতাটি পালাগানের ঢঙে রচিত। বহুযুগের মুছে আসা ছবি কবি নূতনভাবে উপস্থিত করেছেন—

কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

কাজির বিচার, শহর-কোতোয়াল।
পুরাকালের শিক্ষা এখন চলে উজান-পথে,
ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদ টানা রথে।
ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।
যে হোক রাজা, যে হোক মন্ত্রী, কেউ রবে না তারা—
বইবে নদীর ধারা—
... ...
তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর—
'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর'।

'চলতি ছবি' ও 'ঘরছাড়া'য়ও কবির কালচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। দুটি লেখাতেই কবি গ্রামের চলতি ছবি দেখেছেন। 'চলতি ছবি' কবিতাটিতে ছবির অংশ কম। দ্বিতীয় স্তবকটিতে চিত্রের মালা দেখা যায়, তবে এখানে মননই প্রধান। কারণ মুহূর্ত পরেই গ্রামের চলতি ছবি ঝাপসা হয়ে আসে যেমন ওর নামও না-জানা। এই অপরিচিত গ্রামের চিত্রকে কবির ভাবনাই অনেকাংশে পূর্ণতা দিয়েছে। কবি গ্রামের মানুষের চিরন্তন চিত্ত প্রবণতাকে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতাটি অকস্মাৎ রাজনৈতিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় শেষ হয়েছে। 'ঘরছাড়া' কবিতায় চিত্রগুলি জীবন্ত, মনন অপেক্ষাকৃত কম, গ্রামের চলতি ছবি, গ্রাম্য জীবনের বর্ণনা, অতি পরিচিত গ্রাম্য সমাজ কবি নিপুণ বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

এছাড়া অন্যান্য আর যে কয়েকটি কবিতা আছে সর্বত্রই কবির আত্ম-বিশ্লেষণ এবং মৃত্যুচিন্তা প্রধান হয়েছে।

প্রহাসিনী

১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে কবির পরিহাস-প্রিয়তার এক অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। আত্মীয়া পরিচিতাদের কাছে লিখিত কয়েকটি কবিতা-পত্র এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। কয়েকটি ছড়া জাতীয় কবিতাও আছে। 'মাল্যতত্ত্ব' কবিতায় তত্ত্বের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সমন্বয় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরিহাস মার্জিত ও মননশীল। 'গৌড়ী রীতি' কবিতায় বলেছেন—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে
"দাতা বটে ষোল আনা।"

আকাশ-প্রদীপ

আকাশ-প্রদীপ প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে। প্রায় সব কবিতাই ১৩৪৫ সালের কার্তিক মাস থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে লেখা।

এই কাব্যে কবি প্রান্তিক ও সেঁজুতি-র ন্যায় দার্শনিক চিন্তা ও গুরুগম্ভীর সুরের অবতারণা করেন নি, সহজ সরল কল্পনার লীলাই এখানে মুখ্য হয়েছে।

কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। উৎসর্গ পত্রটি পড়লে বোঝা যায় কবির নিজের লেখা সম্বন্ধে কিছু দ্বিধা ও কুণ্ঠা জেগেছে। প্রৌঢ় কবির স্বভাবতঃই মনে হয়েছে এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক মনকে স্পর্শ নাও করতে পারে। তিনি লিখেছেন—"বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি।" এই কাব্যের মূল ভিত্তি স্মৃতিচিত্রণ। কবির পরিচিত জগৎ বদলে গেছে এবং পরিচিত মানুষ যাদের সঙ্গে কবির যোগাযোগ সহজ-সাধ্য ছিল সেই মানুষগুলিও বৃদ্ধ কবির জীবনে আর নেই, তাই স্বাভাবিকভাবেই কবির চোখে ঘনিয়ে এসেছে বেদনা। আধুনিক যুগে এই স্মৃতিবিলাস সর্বজন-স্বীকৃত নয়। এদিক দিয়ে হয়ত তাঁর সঙ্গে আধুনিক যুগের যোগ স্থাপন না হতে পারে। কবির পূর্ব-পরিচিত জগৎ, জীবন, মানুষ সবই আজ তাঁর কাছে আকাশের স্বপ্ন। তাই তিনি ধূসর গোধূলিতে আকাশ-প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই স্বপ্নময় দিনগুলির অনুধ্যান করেছেন—'আকাশ-প্রদীপ' কবিতায়—

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

প্রথম কবিতা 'ভূমিকা' থেকেই কবির বেদনাময় স্মৃতি-চিন্তন লক্ষ্য করা যায়। কবিতার প্রথমেই তিনি বলেছেন স্মৃতিকে তিনি আকার দিয়ে আঁকতে চেয়েছেন। কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভেঙে পড়ে, স্মৃতির মাধ্যমে মানুষের চৈতন্যের মধ্যেই হয় তার নবজন্ম—

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয়দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা ব'লে মানি।

বাল্য-কৈশোরের স্মৃতিকে গভীর অনুভব এবং আনন্দের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন কবি 'যাত্রাপথ', 'স্কুল-পালানে', 'ধ্বনি', 'জল', 'সময়হারা', 'শ্যামা' এবং 'কাঁচা আম' প্রভৃতি কবিতায়।

'যাত্রাপথ' কবিতায় কবি তাঁর বালক কালের কথা অভিজ্ঞতার মিশ্রণে রচনা করেছেন। গোধূলির ক্ষীণ আলোতে সেই আদিযুগের কথা মনে পড়েছে—

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
দিদিমায়ের বালিস-তলায় চাপা।
আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগী তাহার মলাট
দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।
মায়ের ঘরে চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি এক মনে।

'জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া' একথা বলেছেন 'ধ্বনি' কবিতায়। বাল্যকালে চিলের সুতীক্ষ্ণ স্বর, পাড়ার কুকুরের কোলাহল, ফেরিওয়ালাদের ডাক, রাস্তা হতে সহিসদের ডাক, পাতিহাঁসের স্বর, স্কুলের ঘণ্টা প্রভৃতি তাঁর মনকে আঘাত করত এবং তাঁকে বিশ্বসৃষ্টির পরপারে 'রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে' নিয়ে যেত। কবিতার শেষের দিকে কবি কোনোরূপ যৌক্তিকতা আরোপ করতে চান নি। বর্তমান ও অতীতকে একটি রহস্যবোধের দ্বারা ঐক্য সূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন। কবিতাটির শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে বাল্যস্মৃতির সঙ্গে মননের মিশ্রণ হয়ে গেছে—

কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল যেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

'জানা-অজানা' কবিতায় কবি নিজের অবহেলিত ঘরটার দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বোধ করেছেন। ঘরের বিবরণের মধ্যে কবি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন। অতীতের এই ঘরের সমস্ত আসবাবই ছিল ভাষাময়, জীবনের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু—

আজ অন্য রূপ,
প্রায় তারা চুপ।
আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন।

'জানা-অজানা'র মাঝের চৈতন্যের সাঁকো দিয়ে—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ স্থাপন। স্পষ্ট আর অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে অতীত তার বাণী পাঠায়, যা বর্তমানে সব সময় বোধগম্য হয় না।

কবির ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে ছড়া ও রূপকথার স্থান আছে। তাদের ধ্বনি ও সুর জীবন-সায়াহ্নে আবার তাঁর মনকে অধিকার করেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'বধূ', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' প্রভৃতি কবিতায়। দুটি কবিতাতেই বাল্যস্মৃতি ও বর্তমান জীবনকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'বধূ' কবিতায় কবি ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে বধূ-আগমন গাথা শুনেছিলেন—

"বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।"

সেই গানের ছন্দ বালকের প্রাণে কল্পনার শিহরণ জাগিয়েছিল, তারপর সেই বাল্যকাল মিলিয়ে গেল। যৌবনের আগমনে সেই মায়াময়ী বধূর নূপুরধ্বনি কবির মনে গুঞ্জন তুলেছে, বধূর রহস্য মোচনের কাল নিকট হয়েছে। কিন্তু কোনোদিনই বধূর রহস্য কবির কাছে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয় নি। কবি নারীর রহস্যকে আজি বিশ্বরহস্যের অঙ্গীভূত করে দেখেছেন। কবির বাল্য-কৈশোর ও পরিণত মনের নারী-চেতনার বৈচিত্র্য বহন করছে কবিতাটি। শেষাংশের কল্পনা কবিতাটিকে মননশীল রহস্যময়তার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে—

তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,

"তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে!"
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
... ...
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।"

'বধূ' কবিতার বক্তব্য ব্যক্তিগত বলে স্মৃতি এত উজ্জ্বল। 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতায় বাস্তব অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কল্পনা-প্রবণতা বেশি দেখা যায়। কবিতাটির শেষে সাম্প্রদায়িকতা আরোপ করার জন্য অনেকে মনে করেন কবিতাটির মূল্য কিছু হ্রাস হয়েছে।

বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

আকাশ-প্রদীপ-এ কয়েকটি প্রেমের কবিতা আছে:—'শ্যামা', কাঁচা আম', 'নামকরণ', 'তর্ক' এবং 'ময়ূরের দৃষ্টি'।

'শ্যামা' এবং 'কাঁচা আম' কবিতা দুটি কবির কিশোর প্রেমের ইতিহাসের কাব্যরূপ। কবির অপরিণত নারী চেতনা এখানে অপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। কিশোরী 'শ্যামা' ছিল কবির সমবয়সী। ভীরু বালক কবি কিশোরীর লীলা-চাপল্য দেখেই তৃপ্ত। তারপর জানাশোনা একদিন হল বাধাহীন—

একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হোলো দোঁহে কথা-বিনিময়।

কবি ও কিশোরীর পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠতর হল। কিন্তু তবু অপরিচয়ের বাধা সম্পূর্ণ ঘোচে নি একথা কবি পশ্চিম দিগন্তে এসে উপলব্ধি করলেন—

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিম দিগন্তে হয় লীন।

এখানেই কিশোর প্রেমের চরম পরিচয় এবং রবীন্দ্র-প্রেমধারণারও সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যায়।

'কাঁচা আম' কবিতাটি গদ্য-ছন্দে লেখা। এখানেও সেই কিশোর প্রেমের উন্মেষের ইতিবৃত্ত। কাঁচা আমকে কেন্দ্র করে পূর্বস্মৃতির দ্বার খুলে গেল। কাঁচা আম দেখে 'অস্থির ব্যগ্রতায়' কবি তা কুড়িয়ে নিতে উদ্যত হলেন না, কারণ পালাবদল হয়েছে। কাঁচা আমের মাধ্যমে কবির কিশোর প্রেমের উন্মেষ হয়েছিল। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। অপরিণত প্রেমের হয়েছে সলিল-সমাধি। বর্তমানে কবি বিষণ্ণ-স্বীকৃতির মধ্যে কবিতা শেষ করেছেন, যেখানে মাধুর্য ফুটেছে; কিন্তু তিক্ততা নেই। এই অম্লমধুর স্মৃতিতেই কিশোর প্রেমের সার্থকতা—

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাই নি।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

'তর্ক' কবিতায় কবি প্রেমের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে মোহের কোন সম্পর্ক আছে কি না এই নিয়েই কবি যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আজীবনের প্রেমচিন্তা দেহ কামনা-শূন্য। তিনি চিরকালই আত্মার মহিমাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর

নারীচেতনাও এই চিন্তার অঙ্গীভূত। তাঁর শেষ যুগের কাব্যে এই চিন্তাধারার একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখন তিনি প্রেম ও মোহকে একেবারে বিরুদ্ধ বলে ভাবতে পারছেন না। এই কাব্যের 'তর্ক', 'নামকরণ' এবং 'ময়ূরের দৃষ্টি' কবিতায় কবি দেহ-আত্মাগত প্রেম নিয়ে আলোচনা করেছেন। সমালোচকের মতে—"সার্থক রসসৃষ্টির চেষ্টা এই সব রচনায় উপস্থিত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রাচীন সংস্কার গ্রন্থিও যেন কবি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিয়াছেন। প্রেম ও মোহের সম্বন্ধ লইয়া 'তর্ক' কবিতাটিতে কবি বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রেম আর মোহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন।"[১] কবি স্পষ্টতঃই স্বীকার করেছেন—

যদি প্রেম হয় অমৃত কলস,
মোহ তবে রসনার রস।

সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যেও এই মোহ লক্ষ্য করা যায়। কারণ সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে মোহ না থাকলে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির কোন তাৎপর্য থাকত না—

পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।
এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।
পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
মোহতরী বেয়ে তাই সুধাসাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া
অসীমের ছায়া।

নবজাতক

'নবজাতক' প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে। 'আকাশ-প্রদীপ'-এর আগে এবং পরে লেখা কয়েকটি সঞ্চিত কবিতাকে একত্র করে

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬৯) পৃ ২১৯

এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়। এতে গ্রন্থটির কলেবর বিশাল হয়ে পড়ে এবং কবিতাগুলি বিচিত্র ভাব নিয়ে লেখা বলে একটি গ্রন্থে এদের সন্নিবেশ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি। তাই অমিয় চক্রবর্তী সংগৃহীত কবিতাগুলিকে বিভক্ত করে দুটি গ্রন্থে সংকলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে আরও কিছু নূতন কবিতা রচনা করেন। দুটি বইতেই নূতন কবিতাগুলো ভাগ হয়ে গেল। ঐ দুটি বইয়ের প্রথম বইটি ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে 'নবজাতক' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয় এবং আষাঢ় মাসের প্রকাশিত পরবর্তী বইটির নাম হয় 'সানাই'।

'নবজাতক' গ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে··· কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্য মনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে।······ হয়তো··· এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।"

কবির কাব্যে বার বার 'ঋতু পরিবর্তন' ঘটেছে একথা সত্য। 'ঋতু পরিবর্তন' বলতে কবি তাঁর উপলব্ধি-বৈচিত্র্যই বোঝাতে চেয়েছেন। 'সোনার তরী-চিত্রা'-র যুগে প্রেম ও সৌন্দর্যই কবির কাব্যের বিষয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'বলাকা' থেকে লক্ষ্য করা যায় তাঁর মনন গভীরতর হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে গদ্য-কবিতা রচনা করার সময় কবির মন আরও অভিজ্ঞতা-পুষ্ট হয়েছে এবং মনন হয়েছে গাঢ়তর। 'নবজাতক'ও কবির পরিণত মনের ফসল।

কবি তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন 'নবজাতক'। —এই নামটির মধ্যেই একটি নূতনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই কাব্যের মধ্যে কয়েকটি হালকা সুরের কবিতা থাকলেও অধিকাংশ কবিতাই পরিণত মনের চিন্তাজাত ফসল। কবিতাগুলিতে কবির ক্ষোভ বেদনা এবং ঘৃণার পরিচয় আছে। কবিতাগুলির ভাবধারা আলোচনা করলে আপাতদৃষ্টিতে কিছু নূতন ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। এই সম্পর্কে ড. নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন— "নবজাতক' নাম দিয়া যে নূতন ঋতু'ক বা নূতন আপনাকে কবি চিহ্নিত

করিলেন, সেই ঋতুর বা নূতন মানুষের লক্ষণ হইল এক নূতন সমাজ-চেতনা। বৃহত্তর জন-মানস সম্বন্ধে চেতনা, ইতিহাস-চেতনা এবং এই চেতনার সাহায্যে কাব্যে বস্তুর বাস্তব অনুভূতির সঞ্চার।"[১] তাঁর কাব্যে এই নূতনত্বের আবির্ভাব হয়েছিল পুনশ্চ-এর কাল থেকেই।

বর্তমান সভ্যতার অর্থগৃধ্নু, মদগর্বী, মনুষ্যত্ব-পীড়ক রূপ কবির মনকে ব্যথিত করেছে। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে মানবতার অপমানকারী পরপীড়ক সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। তিনি আশা করেছেন শীঘ্রই পৃথিবী কলুষমুক্ত হবে। পৃথিবীব্যাপী মানুষের দুঃখদুর্দশা শেষ হবে। মানুষ নূতনভাবে নূতন পৃথিবীতে জীবন শুরু করবে। এই অমঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নবযুগে আদর্শ মানবের আবির্ভাব হবে। সেই নবজাতক নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো বহন করে আনবে। মৃত্যুর পূর্বে 'শেষলেখা'-ধৃত 'ঐ মহামানব আসে' গানটিতেও তিনি এই কথাই বলেছেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে কবি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক উপকরণকে নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন, যেমন 'রেলগাড়ি', 'এরোপ্লেন', 'রেডিও' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ নবজাতক-এ নূতন সমাজচেতনা এবং মহামানবের আবির্ভাব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। পৃথিবীতে মানবতার অপমানের অবসান হোক, মানুষের অন্তরস্থিত মহত্তম ও বৃহত্তম মানুষের বিকাশ হোক। কবি বিশ্বাস করেন অচিরেই পৃথিবীতে শান্তি ও মিলনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত কবি চিরদিনই শান্তির উপাসক, চিরন্তন মানবতায় বিশ্বাসী। তাই মানবতার অপমানে কবির ক্ষোভ, এটা তাঁর শেষ জীবনের নূতন কোন অনুভূতি নয়। তিনি চিরকালই মানুষকে একটি আধ্যাত্মিক ঐক্যের সূত্রে একটি মিলনভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত যুক্তিযুক্ত মনে হয়—"কেবল শেষ বয়সে নয়, চিরকালই মানুষের উপর অত্যাচার ও পীড়নে কবির মন উত্তেজিত হইয়াছে। অসভ্য আফ্রিকাবাসীর উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের সংবাদই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার প্রেরণা।...সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সকল প্রকার বন্ধন ও পীড়ন হইতে অন্তরাত্মার মুক্তিই তাঁহার আদর্শ। আর বাস্তব-

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬৯), পৃ. ২২৪

চেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কমবেশি প্রায় সময়েই উপস্থিত আছে।"[১] বাস্তব বলতে রবীন্দ্রকাব্যে কখনই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ অর্থ বোঝায় না। নবজাতক কাব্যে কবি নিজেকে 'জন্মরোম্যাণ্টিক' আখ্যা দিয়েছেন। কবি বাস্তবকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আপন ভাব-কল্পনার প্রলেপ দিয়ে তাকে নূতন মূর্তি দান করেছেন।

এই কাব্যের কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১. বর্তমান মনুষ্যত্ব-পীড়ক সভ্যতার প্রতি ঘৃণা এবং নূতন যুগের আবির্ভাব বিষয়ক কবিতা। ২. সম-সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত কবিতা। ৩. বিশ্ব-জিজ্ঞাসা ও দার্শনিক মনন বিষয়ক কবিতা। ৪. ঐতিহাসিক চিন্তামূলক কবিতা। ৫. ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে উপলব্ধিমূলক কবিতা। ৬. খণ্ড বাস্তব দৃশ্য বা ঘটনায় গভীর সত্যের ব্যঞ্জনামূলক কবিতা।

১. এই শ্রেণীর কবিতা হল—'নবজাতক', 'উদ্বোধন' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত'।

'নবজাতক' কবিতাটি এই গ্রন্থের নাম কবিতা। এই কবিতার মধ্যে কবি মানব-মাহাত্ম্যের জয়গান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধারণা মানবের মধ্যেই মহামানবের আবির্ভাব হয়। পৃথিবীর মানুষ আজ নবীন আগন্তুকের আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। পৃথিবীব্যাপী অকল্যাণ ও অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কোন্ মহাস্ত্র নিয়ে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন? নরদেবতার পূজার জন্য কি নূতন সম্ভাষণ নিয়ে আসছেন? বিদ্বেষ-জর্জরিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত এই পৃথিবীতে শান্তির বাঁধ বেঁধে মিলনতীর্থ রচনা করবেন। পৃথিবী আজ সেই নবীন আগন্তুককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কবির দৃঢ় ধারণা—

মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী—
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি-বা দিতেছে আনি॥

'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটিতেও কবির সমাজ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সভ্য সমাজে আজ সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছে। শক্তিমান আজ দুর্বলকে পীড়ন করছে তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এই কবিতায়। এই কবিতায় কবি বলেছেন প্রতাপশালী এবং দুর্বল, নিপীড়ক এবং নিপীড়িত ভূরিভোজী এবং ক্ষুধাতুরদের সংগ্রাম আজ পৃথিবীকে কলুষিত করেছে। কবি

১. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা (১৩৬৪), পৃ ৬৩৮

আশা করেন যে পৃথিবীতে ন্যায় ও কল্যাণ শক্তি আজও নিঃশেষ হয় নি। তাই এই ধ্বংসলীলার অবসানে পৃথিবীতে আবার শান্তি আসবে—

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
　　কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
　　পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
　　জাগিবে নূতন দেশে॥

কোন কোন সমালোচক আবার কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধার প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। "প্রাযশ্চিত্তের সুমহান অনুভব কাব্যকে কতটা সাহায্য করেছে বলা কঠিন। কেননা নৈতিক বা অলৌকিক নিয়মেই যদি 'পাপের সঞ্চয়' বিষম দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, 'বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে একদিন শেষে বিপুল শান্তি উঠিবে জেগে'—এই যদি প্রকৃতির পদ্ধতি ও অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাহলে কবির এ অধৈর্যের প্রয়োজন বা সার্থকতা কোথায়?.... কল্যাণ-শক্তি সম্বন্ধে এহেন সন্দিগ্ধ বিশ্বাস সন্দেহজনক ঠেকে।"[১] রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে মাঝে মাঝে সংশয় এবং সন্দেহ প্রকাশ করলেও তিনি তাঁর মৌলিক বিশ্বাস থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি। শেষ পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক কবিতায় এই ধারণার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

২. রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন, নবজাতকেও এই জাতীয় কয়েকটি কবিতা আছে। যেমন —'ভূমিকম্প', 'আহ্বান', 'মৌলানা জিয়াউদ্দীন', 'সাড়ে নটা', 'প্রবাসী', 'বুদ্ধভক্তি' এবং 'পক্ষীমানব'।

এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে 'বুদ্ধভক্তি' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এটিকে কবির অন্যতম ব্যঙ্গ কবিতা বলেও চিহ্নিত করা যায়। এই কবিতাটি রচনার মূলে কয়েকটি ঘটনা আছে। ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে জাপান চীন দেশ আক্রমণ করে। শক্তির এই অপব্যয়ে কবি দুঃখবোধ করেন। জাপানীরা যখন নানকিং এবং সাংহাই অধিকার করে তখন কবি শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের প্রাণ নাশে বিচলিত হয়ে ওঠেন। ঐ বছর অর্থাৎ ১৩৪৪ সালের পৌষ উৎসবের ভাষণে কবি চীনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। এই সময়ে

---

১. শ্রী শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য (১৩৬৮), পৃ. ১২৮, ১২৯

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে জাপানীরা চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে গিয়েছিল। অহিংসা মন্ত্রের উদ্গাতার কাছে হিংসাশ্রয়ী সংগ্রামে জয়লাভের প্রার্থনা কবির কাছে মনুষ্যত্বের চরম অপমান বলে মনে হয়েছে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কবি ১৩৪৪ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' নামে একটি গদ্য-কবিতা রচনা করেন। বুদ্ধদেবের নামে এই শাঠ্য ও মিথ্যাচারকে কবি সহ্য করতে পারেন নি। কবিতাটি 'পত্রপুটে' সংকলিত হয়। কবি পরে কবিতাটিকে ছন্দে রূপ দেন এবং ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এইটিই নবজাতক-এর 'বুদ্ধভক্তি' কবিতা। কবিতাটির প্রথমে কবি লিখেছেন—"জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানী সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে"। মানবতাবাদী কবি, বিশ্বমানবের কল্যাণে যাঁর চিত্ত নিবেদিত; এই ঘটনায় যে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

'ভূমিকম্প' কবিতাটিও একটি সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে লেখা। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই ভূমিকম্পে বহু প্রাণ ও ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ক'লকাতায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' অভিনয় করান, সেই অভিনয় উপলক্ষে কবি এই কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে লেখা হলেও কাব্য রস ব্যাহত হয় নি।

'মৌলানা জিয়াউদ্দীন' ছিলেন বিশ্বভারতীর ইসলামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপক। তিনি বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে লাহোরে। কবি আলমোড়া থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এই সংবাদ শোনেন। শান্তিনিকেতনে আয়োজিত শোকসভায় বলেন—"এরকম বন্ধু দুর্লভ। এই বন্ধুত্বের অঙ্কুর একদিন বিরাট মহীরুহ হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আমায় শান্তি দিয়েছে—এ আমার জীবনে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকল। অন্তরে তাঁর সন্নিধির উপলব্ধি থাকবে, বাইরের কথায় সে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে না।"[১] কবিতাটিতে কবির গভীর অন্তরবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। এখানেও কবি তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কথাই স্মরণ

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩ খণ্ড (বি. ভা. ১৯৭০), পৃ. ৪৭৩

করেছেন। তাঁর অকস্মাৎ তিরোধানে বিশ্বনিয়মের প্রতি বিদ্রোহের ভাব আসতে পারে। তবু তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর দানের মধ্য দিয়ে যুক্ত থাকলেন, এখানেই সান্ত্বনা।—

তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।

৩. এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে কবির দার্শনিকতা প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র জগৎ সংসারে সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে কবির জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে কিছু কবিতায়। এই শ্রেণীর কবিতা হল—'কেন' 'প্রশ্ন', 'রাতের গাড়ি', 'মংপু পাহাড়ে' ও 'রাত্রি'।

'কেন' কবিতাটি বিশ্বজিজ্ঞাসা সংক্রান্ত। কবির দার্শনিক মননের পরিচয় এখানে। সমগ্র সৃষ্টি সম্পর্কেই কবির প্রশ্ন। কবিতাটিতে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম স্তরে সৃষ্টি এবং বিশ্বজনীন অপচয়ের কথা বলেছেন। সূর্যরশ্মির সমস্ত অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় না। এই আলোকের একটা বৃহৎ অংশ মহাশূন্যে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। সৃষ্টিকর্তা মহাকাল আপন সৃষ্টির প্রতি উদাসীন। কল্পকল্পান্তর ধরে সৃষ্টির এই অপচয় চলছে। এর রহস্য সন্ধান করেছেন কবি—

··· একি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন॥

দ্বিতীয় স্তরে কবি মানবচৈতন্যে ভাবনা-কল্পনার উত্থান পতন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মানুষের মনেও অজস্র চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়, কিন্তু তার অনেকটাই প্রকাশ হয় না, হারিয়ে যায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসেরও তাই, মানুষের সৃষ্টি এবং কর্মের চরম হয় একদিকে অন্যদিকে কালের বিধানে তা হারিয়ে যায়। পৃথিবীতে প্রবাহিত প্রাণধারা লক্ষ্যহীনভাবে মৃত্যুর গহ্বরে আত্মবিসর্জন করে। মানবজীবনের এই অপচয় কবিকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে—

মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন ॥

তৃতীয় স্তরে কবি আত্মার সত্যমূল্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। কবি নিজের ব্যক্তিসত্তা-সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথম বয়স থেকেই কবির মনে এই প্রশ্ন জেগেছে। অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র এবং ঝটিকার যে মিলিত স্বর এবং মানব হৃদয়তন্ত্রীর যে ঝংকার, সেই মিশ্রিত স্বর, ঋতুর উৎসব, জীবন মরণের নিত্য কলরব—সব কিছু এই বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে যেন প্রতি দণ্ডে পলে মিলিত হচ্ছে। কবি কল্পনা করেছেন এই বিশ্বের অন্তরে একটি কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে সমগ্র বিশ্বের কোলাহল মানবের ভাবনা-কল্পনা বাসা বেঁধেছে। সেখান থেকেই হয় নূতন সৃষ্টি। কবি মনে করেছেন যুগযুগান্তের কোন নিরাশ্রয় সত্তা কবির মনে বাসা বেঁধেছে। কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে তাঁর মৃত্যুতেই কি তাঁর অন্তর-সত্তা আবার আশ্রয়চ্যুত হয়ে অনন্ত পথে যাত্রা করবে ?—

উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজ শেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন ?
কিন্তু, কেন।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বিজ্ঞান-চর্চায় আগ্রহী হন। এই আগ্রহই 'প্রশ্ন'-এর মত কবিতা রচনার মূলে। কবিতাটিতে কবির বৈজ্ঞানিক মনন এবং দার্শনিকতা লক্ষ্য করা যাবে। কবিতাটি সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়—"দেশের দিকে তাকাইয়াও আজ কোনো ভরসা পাইতেছেন না ; সেখানে দেখিতেছেন—রাজনীতির মধ্যে না আছে শৌর্য, না আছে বীর্য, না আছে বৃহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ। কবি হতাশভাবে একখানি পত্রে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, 'আমার মন সরে যেতে চাচ্ছে সুদূরে—সেই দূরকে নিজের ভিতরেই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি।" তাঁহার ইচ্ছা সায়ান্স চর্চা করেন—নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকালের মধ্যে তীর্থযাত্রা করিয়া ভূমাকে ভোগ করেন। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আত্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া অসীমকে উপলব্ধির একান্ত ইচ্ছা। তাই বলিতেছেন—'যে বিশ্বজালে অচিন্তনীয়

দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোক-সূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধরা দিয়েছে তার টানে, সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন। সেই তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে কোনো একটা চিরন্তন অর্থ—যে অর্থ বহন করে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।' নবজাতক-এর 'প্রশ্ন' কবিতাটি এই পত্রের সঙ্গে পঠনীয়—"[১]

এই কবিতাটিতেও 'কেন' কবিতার ন্যায় একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এই গ্রহনক্ষত্রের অনন্তকালীন আবর্তন কাকে কেন্দ্র করে? আর 'আমি' নামক সত্তাটির উদ্ভবের রহস্যই বা কি? এই অজ্ঞেয় সত্তা আবার অজ্ঞেয় অদৃশ্যে বিলীন হয়ে যাবে। আত্মার অসমাপ্ত বার্তা রয়ে যাবে ধরণীতে এবং তখনও নক্ষত্রপুঞ্জ অপার আকাশে আবর্তিত হবে। শুধু প্রশ্নের তীব্র আর্তস্বর বাজতে থাকবে, তার কোনো উত্তর ধ্বনিত হবে না।

৪. এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিন্তামূলক দুটি কবিতা আছে 'হিন্দুস্থান' ও 'রাজপুতানা'।

এই কবিতা দুটি সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"ঐতিহাসিক চেতনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়, 'হিন্দুস্থান' ও 'রাজপুতানা' কবিতা দুটিতে। কবিতা হিসাবে অধিকতর সমৃদ্ধ 'হিন্দুস্থান' কবিতাটি, কিন্তু 'রাজপুতানা'-র ইতিহাস-চেতনা সমৃদ্ধতর।"[২]

'হিন্দুস্থান' কবিতায় কবি বলেছেন, ভারতের পশ্চিম দিগন্ত শিশুকাল থেকে কবিকে আকর্ষণ করেছে, কারণ 'ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে'। কালের মন্থর দণ্ডাঘাতে হিন্দুস্থানের উপর অভ্রভেদী প্রাসাদচূড়া গড়ে উঠেছে। কত সাম্রাজ্য সমৃদ্ধ হয়েছে। লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী শুভ-অশুভের বিচিত্র সম্মিলন ঘটেছে জাতির ভাগ্যে। দস্যুদল যে স্থানে ঐশ্বর্যের মশাল জ্বালিয়ে ক্ষুধিতের অন্নথালি লুণ্ঠন করে নিয়েছে, সেখানে আজ পীড়িত ও পীড়নকারীর বিরাট কবর রচিত হয়েছে। বহু শতাব্দীর জয়-পরাজয় মান-অপমানের অবসান হয়েছে—

ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড (১৯৬৪), পৃ ১৬২

২. ড. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬৯), পৃ ২২৭

বলে যায়—
আলো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তরে ॥

'রাজপুতানা' কবিতায় ইতিহাস-চেতনা আরও উজ্জ্বল। বক্তব্য আরও জটিল ও গভীর। এই কবিতাটি লেখা প্রসঙ্গে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"নবজাতকের 'রাজপুতানা' কবিতাটি লেখার ইতিহাস অন্যরূপ। স্টেটস্‌ম্যান হইতে প্রকাশিত 'সুন্দর ভারত' (Wonderful India) গ্রন্থে রাজপুতানার ছবি দেখিয়া মনে যে বিকার লাগে তাহারই অভিঘাতে উহা লিখিত।"[১] 'মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার বিড়ম্বনা ও তার তীব্র প্রতিবাদ এই লেখাটিতে। 'রাজপুতানা'-য় অতীত গৌরবের বিষণ্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। পূর্বগৌরব-হারা 'রাজপুতানা' সমালোচকের কৌতুকদৃষ্টিতে অপমানিত হচ্ছে। শূন্য সমারোহ বর্তমান রাজপুতানার দিকে তাকিয়ে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল রাজপুতানার যাঁরা কাল্পনিক কাহিনী রচনা করে অলস দর্শকদের মনোরঞ্জন করছেন তাঁদের কবি বিদ্রূপ করেছেন—

প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা।
নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা,
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীরসাজে
তারস্বরে আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।

দরিদ্র চাষী, যারা রাজপুতানার মাটি চাষ করছে বারোমাস রোদ বৃষ্টি মাথায় করে, তাদের সঙ্গে রাজপুতানার যোগ অন্তরতম ; তারা মিথ্যা দিয়ে রাজপুতানাকে বিকৃত করে না। পরিশেষে কবি হৃতগৌরব রাজপুতানার সম্পর্কে শেষ কামনা করেছেন, এইভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।—

তাই ভাবি হে রাজপুতানা,
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক,
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড (১৯৬৪), পৃ. ১৪৫

শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে ॥

এই কবিতাটির মাঝখানে বণিকতন্ত্র সম্পর্কে কবির নিন্দাবাদ একটু খাপছাড়া মনে হয়।

৫. কবি কয়েকটি কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন। কবিতাগুলি হল—'শেষদৃষ্টি', 'ভাগারাজ্য', 'জবাবদিহি', 'জন্মদিন', 'রোমান্টিক', 'অবর্জিত', 'শেষহিসাব', 'জয়ধ্বনি', 'প্রবীণ', 'শেষবেলা', 'রূপ-বিরূপ' এবং 'শেষ কথা'।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যে ব্যক্তিগত জীবন ও উপলব্ধি নানাভাবে উপস্থিত হয়েছে। এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে কবির মনে কতকগুলি ধারণা ও চিন্তার পুনঃ পুনঃ আবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর একটি মমতাময় মনোভাব ছিল। তিনি যতই বৃদ্ধ হয়েছেন ততই এই বিচিত্র সৌন্দর্যময়ী ধরণীকে ছেড়ে যাবার চিন্তায় ব্যাকুল হয়েছেন। অধিকাংশ কবিতাতে আগতপ্রায় মৃত্যু সম্পর্কে সচেতনতা দেখা গেছে। শেষ পর্যায়ের কবিতায় আত্মবিশ্লেষণ বার বারই ঘুরে ফিরে এসেছে এবং নিজের কাব্য-জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনাও দেখা যায় অনেক কবিতায়। তাঁর কাব্যপ্রবণতা কোন্ দিকে, এ বিষয়ে তিনি কিছু কিছু স্বীকারোক্তিও করেছেন কয়েকটি কবিতায়। 'শেষদৃষ্টি', 'শেষ হিসাব', 'শেষ বেলা', 'শেষকথা' প্রভৃতি কবিতায় তিনি জীবনের শেষের কথাই ইঙ্গিত করেছেন, কবিতাগুলির নামের মধ্যেই বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শেষ জীবনে তিনি জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কিছু কবিতা রচনা করেন। এইসব কবিতায় তিনি জন্মদিনের নূতন তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং আত্মবিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থের 'প্রবাসী' ও 'জন্মদিন' এই শ্রেণীর কবিতা। কয়েকটি কবিতায় তিনি তাঁর অন্তর-জীবনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন যেমন 'ভাগারাজ্য'। 'রোমান্টিক' কবিতায় কবি তাঁর কবি-মানসের ব্যাখ্যা করেছেন। কবি নিজেকে রোমান্টিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। বাস্তবকে অস্বীকার করে তিনি রোমান্টিক নন, বাস্তবের সার্থক রূপায়ণ ও তাকে কাব্যসুষমায় উত্তীর্ণ করেই তিনি রোমান্টিক—

যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।

ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক ?'
আমি বলি 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক'।

৬. খণ্ড খণ্ড বাস্তব দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কবি গভীর সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন কয়েকটি কবিতায়—'রাতের গাড়ি', অস্পষ্ট', 'এপারে ওপারে', 'ইস্টেশন', 'সাড়ে নটা' এবং 'প্রজাপতি'।

'রাতের গাড়ি' কবিতায় একটি উপমাকে কেন্দ্র করে মানব-প্রাণের অন্ধ যাত্রাকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রাণ যেন রাতের রেলগাড়ি। রাত্রির অন্ধকারে রেলগাড়ির গন্তব্যস্থল যেমন অস্পষ্ট এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে তেমনি মানব প্রাণেরও অজ্ঞেয় অন্ধকারে যাত্রা। গন্তব্যস্থল সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাই থাকে না। রেলগাড়ির যাত্রীর যেমন ক্রমে গন্তব্য সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে ওঠে তেমনি মানুষের জীবনযাত্রার গন্তব্য সম্পর্কে একটি প্রত্যয় জেগে ওঠে—

গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে॥

'ইস্টেশন' কবিতায় রেলগাড়ির যাওয়া-আসার রূপকের মধ্য দিয়ে জীবনের চলমানতাকে উপলব্ধি করেছেন। এখানে কবিমনের দার্শনিকতাই প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটির দুটি দিক—ইস্‌টেশনের বাস্তব ছবি এবং কবির দার্শনিকতা। বাস্তব পৃথিবীতে মানুষ যেমন ক্ষণকালের প্রয়োজনে ইস্‌টেশনে আসে, তেমনি অনন্তকালের জীবন ধারায় আমরা ক্ষণকালের জন্য এই পৃথিবীতে এসেছি। প্রয়োজন-অন্তে আবার মানুষকে অনন্তের পথে যাত্রা করতে হবে।—

চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি

নিত্যমেলার নিত্যভোলার ভাষা
কেবল যাওয়া-আসা।

পূর্বোক্ত কয়েকটি বিভাগ ছাড়াও নবজাতকে দুটি বিবিধ সুরের কবিতা আছে—'ক্যাণ্ডীয় নাচ' এবং 'সন্ধ্যা'। 'ক্যাণ্ডীয় নাচ' কবিতায় কবি সিংহলের একটি বিশেষ নাচ 'ক্যাণ্ডীয় নাচ'-এর বর্ণনা করেছেন। ছন্দোময় পৌরুষদীপ্ত এই নাচ কবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 'সন্ধ্যা' কবিতায় কবি দিন ও সন্ধ্যার তুলনা করেছেন। 'দিন'-কে কবির অধিক স্পষ্ট বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যা তাঁর কাছে রহস্যময়ী, অবগুণ্ঠনবতী বিদেশিনী।

সানাই

১৩৪৭ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। সমগ্র শেষ পর্যায়ের কাব্য ধারায় সানাই একটি বিশিষ্ট কাব্য। বিদায়-রাগিনীর সকরুণ মূর্ছনায়, অতীতের প্রেমস্মৃতির নূতন আস্বাদনে কাব্যটি বিষণ্ণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত। এই কাব্যে কবি পূর্বের রোমান্টিক পরিবেশে ফিরে গেছেন। এখানে ভাব স্বচ্ছন্দ এবং কল্পনা সহজ। এই কাব্যে পূরবী-র সেই কোমল স্মৃতিময় প্রেমের আবেশ আবার নূতন করে অনুভব করা যায়। কবিতাগুলিতে যেন সেই যুগের লীলা-সঙ্গিনীর স্মৃতি। কৈশোর-যৌবনের প্রেমস্মৃতি এই কবিতাগুলিতে সুকুমার সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। সানাই কাব্যটি অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা এবং দার্শনিকতা মুক্ত। তবু শেষ পর্যায়ের কাব্য হওয়ার জন্য তাঁর লীলাবাদের অনুভূতি এবং মৃত্যুর রহস্যময়তাও কাব্যটির কোন কোন স্থান ছুঁয়ে গেছে। প্রথম দুটি কবিতার মধ্যেই এই আভাসগুলি পাওয়া যায়।

'দূরের গান' কবিতায় কবি সুদূর নিরুদ্দেশের পানে তাঁর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। কোন নামহারা অদৃশ্য লোক থেকে তিনি জীবনচেতনা বহন করে এই পৃথিবীতে এসেছেন; সারা জীবন ধরে তিনি দূরবাসীর পরিচয় খুঁজেছেন এবং তাঁর বিরহকে অনুভব করেছেন।—

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে,
আজিও চলেছি তার টানে।

বাসাহারা মোর মন,
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

'কর্ণধার' কবিতার মূল ভাব এই যে কবির জীবন তরণীর কর্ণধার লীলার ছলে এই তরীখানি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আবার মৃত্যু-ভাটায় তাকে কোন পারে নিয়ে যাবেন। ধূসর গোধূলিতে সমস্ত জগৎকে স্বপ্নময় মনে হয়। অন্ধকারের নিঃশব্দ গাম্ভীর্যের মধ্যে যেন বেহাগ রাগিণীর করুণ সুর ধ্বনিত হয়। যখন জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কবির কর্ণধার 'অন্তিম যাত্রা'র পাল ঊর্ধ্বে তুলে দেন, তখন সেই জ্যোতিঃ স্বরূপ অচিন্ত্যকে অসীম অন্ধকার জলে মনে হয়। লীলার কর্ণধার কবির জীবনকে রহস্যময় কোন্ ঘাটে মৃত্যু-ভাটায় পার করছেন—

ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবনতরী মৃত্যুভাঁটায়
কোথায় করো পার।

সানাই কাব্যের অনেক কবিতাকে গান হিসাবেও গ্রহণ করা চলে। শুধুমাত্র বিষয়বস্তু নয়, লিখনরীতির দিক থেকেও সানাই-এ অতীতের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জীবন-গোধূলির ধূসর লগ্নটি যেমন বিষণ্ণ তেমনি প্রশান্ত। মোটামুটিভাবে সানাই-এর কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি ভাব লক্ষ্য করা যায়।

১. কোনো ঘটনা বা দৃশ্যকে অবলম্বন করে স্মৃতির মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান। ২. প্রেম চিন্তা। ৩. মনের ক্ষণিক ভাবের অভিব্যক্তি ও বিশুদ্ধ লিরিক-জাতীয় কবিতা।

১. এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে পড়ে—'সানাই', 'অনসূয়া', 'অপঘাত', 'পরিচয়', 'মানসী' প্রভৃতি।

শেষ পর্যায়ের কাব্যে বস্তু-পৃথিবীর চেতনা বার বারই রবীন্দ্রনাথের ধ্যানকল্পনাকে চূর্ণ করেছে। 'সানাই'-এর পূর্বে অনেক কাব্যে আমরা সেই পরিচয় পেয়েছি। তবে সানাই কাব্যে আমরা যেন বহুকাল পূর্বের রবীন্দ্রনাথকে আবার শেষ বারের মত দেখতে পাই। 'সানাই' কবিতাটি তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'সানাই'-এর সুরে কবি উপলব্ধি করলেন জীবনের

ছন্দভাঙ্গা অসংগতি এবং দৃশ্যমান পৃথিবীর সব কুশ্রীতার অন্তরালে নিবিড় ঐক্য বিরাজিত। অসীম সৌন্দর্যলোকের যে আনন্দধারা জীবনকে বিধৃত করে আছে সানাই তারই আভাস। এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের সত্যকার পরিচয়। সমগ্র জীবন তিনি পরিপূর্ণ সুর ছন্দ, ঐক্য, সংগতি এবং পূর্ণতার সাধনা করেছেন—

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে—
বুঝিবার সময় কি আছে!
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর-মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুরে
গভীর মধুর
অমর্ত্য লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।

'অনসূয়া' কবিতাতেও কবি বাস্তবের কুশ্রীতা এবং কদর্যতার মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের অমরাবতীতে প্রয়াণ করেছেন। সেখানে কবির কল্পনায় ধরা দিয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনন্ত যৌবনা সৌন্দর্যময়ী নায়িকা।—

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোমান্টিক—
... ...
আকাশকুসুমকুঞ্জবনে,
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে-বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার।
আজি এই চৈত্রের খেয়ালে
মনেরে জড়ালো ইন্দ্রজালে।

দেশকাল
ভুলে গেল তার বাঁধা তাল।
নায়িকা আসিল নেমে আকাশপ্রদীপে আলো পেয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ব পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য হল শেষ যুগে কবির ধ্যান বার বারই বাস্তবের আঘাতে ভেঙে গেছে। রোমান্টিকতার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকে নি। তাই কবিকে এই স্বপ্নের পরিবেশ ত্যাগ করে বাস্তবের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে—

স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর-বার যেতে হবে চ'লে
সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

'অপঘাত' কবিতার মধ্যেও আমরা রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় পেয়েছি। কবিতাটির আরম্ভ হয়েছে গ্রামীণ সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। ছুটিতে দুই বন্ধুর দেখা, গ্রামের বর্ষণসিক্ত সবুজ ঘাসে ঢাকা রাস্তায় বন্ধুদ্বয় গল্পরত—

নব বিবাহিত একজনা,
শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশেপাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি,
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

কিন্তু এই আনন্দের আলোচনা স্থায়ী হয় না, কারণ—

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

এই বস্তু-পৃথিবীর চেতনা রবীন্দ্রনাথের আত্মগত কল্পনাকে চূর্ণ করেছে। শেষ পর্যায়ে আমরা এই রকম স্বপ্নভঙ্গ বার বারই লক্ষ্য করি। স্বপ্নলোকের সঙ্গে এই সমস্ত স্থানে বাস্তবের সংঘর্ষ ঘটেছে।

২. এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে পড়ে—'মায়া', 'অদেয়', 'আহ্বান', 'শেষকথা', 'অত্যুক্তি', 'নারী', 'দূরবর্তিনী', 'অসম্ভব', 'গানের মন্ত্র' ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর প্রেম-কবিতাগুলিতে পূর্ব যুগের স্বপ্ন মায়ায় আচ্ছন্ন কোমল পরিবেশটি আবার ফিরে এসেছে। এখানে কবি নারীকে পরিপূর্ণরূপে রোমান্টিক ভাবের মধ্যে স্থাপন করে উপলব্ধি করেছেন। এই কবিতাগুলিতে রোমান্টিক অনুভূতির অনবদ্য রসঘন প্রকাশ—যেমন, 'মায়া' কবিতা—

স্বপ্নরূপিণী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোওয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।
নাই কোনো ভার, নাই বেদনার তাপ,
ধূলির ধরায় পড়ে না পায়ের ছাপ।
তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস,
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিত হাস।

৩. এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে পড়ে—'অনাবৃষ্টি', 'নতুন রঙ', 'গানের খেয়া', 'অথবা', 'বিদায়', 'যাবার আগে', 'পূর্ণা', 'কৃপণা', 'ছায়াছবি', দেওয়া-নেওয়া', 'দ্বিধা', 'আধোজাগা', 'ভাঙন', 'গানের জাল', 'মরীয়া', 'গান', 'বাণীহারা' প্রভৃতি।

এই কবিতাগুলিতে কবি কোন গুরুগম্ভীর ভাব বা তত্ত্বের সমাবেশ করেন নি। মনের খণ্ড, ক্ষুদ্র, ক্ষণিক ভাবগুলিকে নিয়ে হ্রস্বায়তন লিরিক কবিতা রচনা করেছেন। মাধুর্যই কবিতাগুলির মূল কথা। 'মানসী' 'ক্ষণিকা'-র যুগের কবির মনোভাব এখানে আবার যেন ফিরে এসেছে। এই কবিতাগুলি গান হিসাবেও গ্রহণযোগ্য। যেমন 'দ্বিধা' কবিতা—

এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
জানায়ে গেলে
সমুখের পথে পলাতকা পদপতন ফেলে।
তোমার সে উদাসীনতা
উপহাসভরে জানালো কি মোর দীনতা।
সে কি ছল করা অবহেলা, জানি না সে
চপল চরণ সত্য কি ঘাসে ঘাসে
গেল উপেক্ষা মেলে।

এই কাব্য দুটিতে কবির অপরাজেয় মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রোগযন্ত্রণা এবং মৃত্যুর নৈকট্য কবির মনকে দুর্বল করে নি বরং জীবন-মৃত্যুর রহস্যের যবনিকার অন্তরালে সত্যের নিকটবর্তী করেছিল।

রোগশয্যায় এবং আরোগ্য কাব্যদ্বয়ের কবিতাগুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরাভরণ তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল ব্যঞ্জনাধর্মী মন্ত্রবৎ-সংহত বাক্‌ভঙ্গী। অনুভূতি যেখানে গভীর, বাহ্যিক বিলাস সেখানে গৌণ হয়ে যায়। প্রতিমা ঠাকুর 'জন্মদিনে' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"বইখানি তাঁর রোগশয্যার মানসিক দর্পণ।"[১] এই কথা কয়টি তাঁর শেষের চারটি কাব্য সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য।

রোগশয্যায় কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কয়েকটি ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

ক. ব্যাধির যন্ত্রণা এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচিত কবিতা হল ৫, ৭, ৮, ৯, ১৫ এবং ২৪ সংখ্যক। খ. রোগীর কক্ষের পরিবেশ এবং শুশ্রূষাকারীদের নিয়ে লেখা কবিতা—১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২৬, ৩৩ এবং ৩৯ সংখ্যক। গ. জীবনের স্বরূপ-চেতনা এবং চিরন্তন প্রাণের উপলব্ধিমূলক ১৩, ২২, ২৮, ২৯, ৩২ সংখ্যক কবিতা। ঘ. মৃত্যু-চিন্তা এবং অসীমানুভূতিমূলক ১, ৪, ২৬, ৩৫, ৩৭, ৩৮ সংখ্যক কবিতা। ঙ. বিবিধ ভাবমূলক কবিতা—২, ৩, ২৫, ৩১ সংখ্যক কবিতা।

ক. ৫ সংখ্যক কবিতায় কবি যদিও দৈহিক রোগ-যন্ত্রণার কথা বলেছেন, তবুও মানবাত্মার সহনশক্তি ও অপরাজেয় বীর্যের কথাই প্রধান হয়েছে। কবি সমগ্র চরাচর-ব্যাপী যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্রের অবিরাম পীড়নকে অনুভব করেছেন। মানুষের শরীরও সেই পীড়নে পীড়িত হচ্ছে। কিন্তু মানবাত্মা 'দেহদুঃখ হোমানলেই' রোগযন্ত্রণার ঊর্ধ্বে বিজয়ী হয়। মানুষের ভালবাসায়ই আত্মা এই মহান শক্তির অধিকারী হয়।

৯ সংখ্যক কবিতায় কবি অসুস্থ দেহের কাব্য রচনার মধ্যে অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন। সৃষ্টির আদি যুগে যেমন কদর্য, বিকলাঙ্গ, বস্তুপিণ্ড রাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল প্রকাশের আশায়, সেইরূপ কবির অস্পষ্ট চেতনায়, চিন্তা, ভাবনা এবং কল্পনার বিশৃঙ্খল, বিকলাঙ্গ এবং অসম্পূর্ণ মূর্তি রচিত হচ্ছে। কবির জিজ্ঞাসা হল—

[১] শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর, নির্বাণ (১৯৫৫) পৃ ৪৭

বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণহস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।

১৫ সংখ্যক কবিতায় কবি অনুভব করেছেন যে তাঁর দেহের অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাণীও ক্রমশই ক্ষীণতর হচ্ছে। দুর্গমকে জয় করার জন্য ঝর্ণা যখন পূর্ণবেগে ছুটে যায়, তার গর্জন গুহার সঙ্কীর্ণ আত্মীয়তাকে অস্বীকার করে নিখিল বিশ্বের অধিকার ঘোষণা করতে থাকে, কিন্তু বৈশাখে সে তার এই গৌরব এবং সৌন্দর্য হারায়, খণ্ড খণ্ড কুণ্ডের মধ্যে তার ক্লান্ত গতিস্রোত অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। তেমনি কবির বাণীও আজ তার স্পর্ধাহীন রুগ্ন জীবনের সঞ্চিত গ্লানিকে ধিক্কার দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ব্যাধি এবং বার্ধক্যে ক্লিষ্ট জীবন যেন কবির প্রসারিত দৃষ্টিকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রভাত সূর্যের কাছে কবি আপনার আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও
পরাভূত রজনীর অপমান সহ।

খ. এই কবিতাগুলিতে শুশ্রূষাকারীদের অবিচল সেবা এবং তাঁদের উপস্থিতিতে কবির মানসিক স্বস্তি এবং আনন্দের কথা ব্যক্ত করেছেন।

১৩ সংখ্যক কবিতায় কবি রোগীর রোগযন্ত্রণার মধ্যেও প্রিয়জনের উপস্থিতি এবং সেবা-শুশ্রূষা যে আনন্দের কারণ হয় সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন। রোগীর ঘরের আবহাওয়া সাধারণ জীবন থেকে পৃথক। এ যেন নদীর স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শৈবাল দ্বীপ। রোগশয্যায় কবি যদিও সহজ জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত তবু প্রিয়জনের পরিচর্যা তাঁর সকল দুঃখকে লাঘব করে। কিন্তু এই অমৃতময় পরিচর্যারও একদিন অবসান হবে—

একদিন বন্যা নামে, শৈবালের দ্বীপ যায় ভেসে;
পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেইমতো ভেসে যাবে সেবার বাসাটি,
সেখাকার দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই কটা দিন॥

১৮ সংখ্যক কবিতায় সেবারত প্রিয়জনকে দেখে কবি মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় উপলব্ধি করেছেন। সংসারের বিচিত্র কর্মের মধ্যে মানুষের বিক্ষিপ্ত চেতনা নানারূপে প্রকাশিত হয় কিন্তু রোগীর কক্ষে মানুষ একাগ্র লক্ষ্যের প্রতি তার চেতনাকে সংহত করে রাখে। তখন—

সমস্ত বিশ্বের দয়া
সম্পূর্ণ সংহত তার মাঝে,
তার করস্পর্শে, তার বিনিদ্র ব্যাকুল আঁখিপাতে।

২৬ সংখ্যক কবিতাটি তাঁর মর্ত্যপ্রীতির আবেগে কম্পিত। কবি অনুভব করেছেন তাঁর কবিত্বশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকবে এবং কালক্রমে কাল-সিন্ধুর নিয়ত তরঙ্গাঘাতে দিনে দিনে তা লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের যে ভালবাসায় প্রতি মুহূর্ত তাঁর হৃদয় আপ্লুত হয়েছে, সেই ভালবাসার মধ্য দিয়েই তিনি বিশ্বের নিত্য-সুধা পান করেছেন। তাঁর অবর্তমানেও পৃথিবীর এই ভালবাসার স্বাক্ষর রয়ে যাবে—

এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার॥

৩৯ সংখ্যক কবিতায় সৃষ্টির গভীরে যে শান্তি বিরাজিত তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে কবি মানুষের সেবা ও ভালবাসার মহান শক্তিকে উপলব্ধি করেছেন। পীড়িত কবিকে এই চিন্তা মাঝে মাঝে বিচলিত করে যে, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে যাবার মন্ত্রণা করছে। কবি গভীর উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশকে দু'বাহু মেলে ধরতে চান। কিন্তু তখনই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়—

দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি॥

গ. এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে কবির দার্শনিকতা ফুটে উঠেছে, কবির জীবন-জিজ্ঞাসা সংহত হয়েছে। ১৩ সংখ্যক কবিতায় কবি আনন্দের উপলব্ধিকে জানতে চেয়েছেন সরল বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ দুঃখ-রাত্রির অবসানে কবির মনে অনেক জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন আনন্দানুভূতি যুক্তিতর্কের অতীত।

২৮ সংখ্যক কবিতায় কবির আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। কবির অন্তরে যে চৈতন্য, তার আদি শূন্যময় এবং অন্ত নিরর্থক মৃত্যু। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অমৃতময় আনন্দময় যে চৈতন্য-প্রবাহ, কবির অন্তরেও তারই উপস্থিতি।—

আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তারা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।

ঘ. ৪ সংখ্যক কবিতায় কবি মৃত্যুর অনিবার্যতাকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু মর্ত্যলোকের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আকর্ষণের স্বীকৃতিও গোপন থাকে নি। এই পৃথিবীর অজস্র দান কবিকে ভূষিত করেছে, তবু তাঁকে এই পৃথিবী ত্যাগ করে যেতে হবে। অন্তিম ধূলায় কবি স্বল্প আলো ও ছায়ায়, বাস্তব ও মায়ায় তাঁর জগৎ রচনা করতে চান।

৩৫ সংখ্যক কবিতায় কবি বিগত জীবনের অর্জিত খ্যাতি-কীর্তির দিকে গভীর নিরাসক্তির সঙ্গে তাকিয়েছেন; অতীতের বন্ধন থেকে জীবনকে মুক্ত করে তিনি অসীমের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। আয়ুস্রোতে ভেসে যখন তিনি বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন তখন যেন কোন অতীত কীর্তি তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে।

সুখে দুঃখে নিরন্তর
লিপ্ত হয়ে আছে যে আপনা
আপন-বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি
সংসারের শতলক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে,
নিঃশঙ্ক নিঃস্পৃহ চোখে দেখি যেন তারে
অনাত্মীয় নির্বাসনে;

ঙ. ২ সংখ্যক কবিতায় কবি অনন্ত প্রাণ-প্রবাহের কথা বলেছেন। অনিঃশেষ প্রাণ নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশে অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে। এই কবিতায় সৃষ্টি এবং ধ্বংস সম্পর্কে জিজ্ঞাসু কবিচিত্তের পরিচয় পাই।—

চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা।

৩ সংখ্যক কবিতাটি স্মৃতিচারণামূলক। আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় অতীতের বিচ্ছিন্ন প্রেম স্মৃতিকে স্মরণ করেছেন। অতীতে যারা তাঁর প্রাণের ঘাটে গানের খেয়া এনেছিল, তাদেরই স্মৃতি তাঁর স্বপ্নালোকের দুয়ার ঘিরে উপস্থিত হয়েছে।

২৫ সংখ্যক কবিতাটি তাঁর ঔপনিষদিক চেতনার প্রকাশ। সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় একটি আর্ষবাণী তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তা হল সমগ্র সৃষ্টির উদ্ভব আনন্দ থেকে। অনন্ত দেশ-কালে ব্যাপ্ত যে চিরন্তন সত্য তার উপলব্ধিতেই জীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

আরোগ্য

এই কাব্য প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে। এর অধিকাংশ কবিতাই শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছে। এই কাব্য সদ্য-রোগমুক্ত কবির মানসিক দর্পণ। "রোগশয্যায়-এর তুলনায় আরোগ্য স্বভাবতই ক্ষীণতর, রোগের উত্তাপ ও উত্তেজনা এতে নেই।"[১] তাই এখানে একটি প্রশান্ত করুণ মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবী ও মানুষকে কবি যেন আবার নূতন করে ভালবেসেছেন। আবার সুদূরের আহ্বান লাভ করে বিদায়ের প্রস্তুতি, তাও আরোগ্য-এর কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মানবাত্মার স্বরূপ এবং চিরন্তন সত্যের প্রতি আগ্রহ ফুটে উঠেছে কবিতাগুলিতে। এই চিরবিদায়ের ক্ষণে পৃথিবীর মমত্বের প্রতি নম্র মধুর স্বীকৃতি কাব্যখানিকে অসামান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। রোগশয্যায় কাব্যে ব্যাধি-জনিত ক্লান্তির পরিচয় পাওয়া যায় স্থানে স্থানে, কিন্তু আরোগ্য-এ কোন রূপ বিষাদের ছাপ নেই। একটা সর্বব্যাপী আনন্দের উপলব্ধি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। মৃত্যুকে তিনি এখানে একটা স্বাভাবিক পরিণাম বলে স্বীকার করেছেন। তাই মৃত্যু তাঁর কাছে ভয়াবহ নয়। এই মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে কবির স্মৃতি-চারণা, অতীতের মধুর স্মৃতি তাঁর মনকে আনন্দ-বেদনায় দোলায়িত করেছে। সর্বোপরি একটা মহামুক্তির আনন্দ কাব্যটির সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে আছে।

আরোগ্য কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে মোটামুটি কয়েকটি ভাব লক্ষ্য করা যায়। ১. মৃত্যু সম্পর্কিত অনুভূতি সম্বলিত কবিতা। ২. প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধিমূলক কবিতা। ৩. সত্তার চিরন্তনত্বের উপলব্ধিমূলক কবিতা।

১. শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য (১৩৬৮), পৃ. ১৭২

৪. জগৎ এবং মানবের প্রতি প্রীতিমূলক কবিতা। ৫. আপন কাব্য সৃষ্টি সম্পর্কিত কবিতা।

আরোগ্য কাব্য কবি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করকে উৎসর্গ করেছেন। সারা জীবন ধরে কবি নানা মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছেন। আজ পরিশ্রান্ত প্রদোষে কবির শেষ প্রহরকে যাঁরা মধুময় করে তুলেছেন তাঁদের প্রতি তিনি প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁরা যেন কবির জীবন-তরণী ছাড়ার আগে তীরের বিদায় স্পর্শ দিতে এসেছেন।

১. ৮, ১০, ৩০ এবং ৩১ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আরোগ্য-এ বার বারই কবি তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছেন। এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রশান্ত প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়।

৮ সংখ্যক কবিতায় কবি সংসারের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে অনন্তের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। দিনান্তের পান্থশালা-দ্বার থেকে তিনি শেষতীর্থ-মন্দিরের চূড়াকে দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে অপেক্ষা করে আছে জীবনের পূর্ণতা। কবি অনুভব করছেন—

সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দূর।

৩০ সংখ্যক কবিতাটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাগর্ভ। কবি প্রকৃতির একটি নিয়মের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুকে অপূর্বভাবে উপমিত করেছেন। দিন যেমন আপনার বাহ্য পরিচয়কে বিসর্জন দেয় পশ্চিমের সিংহদ্বার খুলে অন্ধকার আলোকের সাগরসঙ্গমে আপনার সত্য-পরিচয়কে উপলব্ধি করার জন্য; দূর প্রভাতের পানে আপনার নিঃশব্দ প্রণাম জানায় তেমনি জীবনও আপনার অন্তরতম স্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য মৃত্যুর মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করে। এই কবিতায় কবির মৃত্যু সম্পর্কে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ হয়েছে।

২. ২, ৫, ৬, ১১ এবং ২২ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীতে পড়ে। প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানবহৃদয়ের প্রেম কবিকে বিশ্বছন্দের অপূর্ব রহস্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ২ সংখ্যক কবিতাটিতে কবির প্রকৃতি-প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রকৃতির মধ্যে তিনি আনন্দময় পরম সুন্দরের অনুভব করেছেন। কবি

আলোকিত প্রাতে অসীম অরূপের স্পর্শ পেয়েছেন। প্রতি প্রভাতে ধরণী আলোক স্নানে শুচি হচ্ছে এবং রূপময়, রসময় মূর্তি রচনা করছে। প্রতিদিন চিরপুরাতনের বেদী তলে চির নূতনের অভিষেক হয়। ধরণীর শ্যামল সৌন্দর্য, উজ্জ্বল প্রভাত, পাখীর কণ্ঠে গান, সমস্তই জীবনকে সার্থক করে তোলে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবের প্রীতি মিশে কবির কাছে অমৃতের আস্বাদ বহন করে আনে—

> সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
> অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
> মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
> সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

১১ সংখ্যক কবিতায় অবসন্ন বৃদ্ধ কবি প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। জীবনের মরুময় গোধূলিতে কবি সঙ্গীহীন। কিন্তু প্রকৃতি তার আনন্দ থেকে কবিকে বঞ্চিত করে নি। প্রবীণ কবি পলাশের আনন্দমূর্তির মধ্যে আপন যৌবনের আনন্দকে খুঁজে পেয়েছেন আর অনুভব করেছেন নবীনের আমন্ত্রণ—

> তবুও তো কৃপণতা নাই তব দানে,
> যৌবনের পূর্ণ মূল্য দিলে মোর দীপ্তিহীন প্রাণে,
> অদৃষ্টের অবজ্ঞারে কর নি স্বীকার—
> ঘুচাইলে অবসাদ তার ;
> জানাইলে চিত্তে মোর লভি অনুক্ষণ
> সুন্দরের অভ্যর্থনা নবীনের আসে নিমন্ত্রণ।

৩. আরোগ্য-এর কিছু কবিতায় সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি এবং সত্তার চিরন্তনত্বের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে।

৩২ সংখ্যক কবিতায় 'পরম আমি'-র সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। আলোকের স্পর্শে তিনি অনুভব করছেন সৃষ্টির চিরন্তন আনন্দের সঙ্গে তাঁর আত্মার ভেদ নেই। তিনি চৈতন্যের আদি-উৎসের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং আদি-প্রাণের পুণ্যস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অমৃত লাভের অধিকারী হয়েছেন।

৩৩ সংখ্যক কবিতায়ও কবি কুহেলিকা ভেদ করে চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি এবং সত্যের অমৃত-রূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কবি আপন অন্তরে

চিরন্তন মানবকে অনুভব করবার বাসনা প্রকাশ করছেন। সংসারের ক্ষুদ্রতা এবং তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে জীবনের যে সত্য তা অনুভব করতে চাইছেন কবি—

এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে।

৪. ১, ৪, ১৩, ১৫, ১৯, ২০, ২১ এবং ২৩ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর। মৃত্যু-রাত্রির লাঞ্ছনা কাটিয়ে কবি প্রসন্ন প্রভাতে জগৎ এবং জীবনকে আবার নূতন করে দেখলেন। সব কিছুই পরম সুন্দর বলে মনে হল। সত্য এবং আনন্দের যেন অনুপম প্রকাশ এই জীবন এবং জগৎ। ১ সংখ্যক কবিতায় কবির মুগ্ধতার অপূর্ব নিদর্শন। বৈদিক ঋষিদের মত পার্থিব সব কিছুই তাঁর মধুময় লাগছে। মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসায় তিনি অমৃতের আস্বাদ পেয়েছেন। বিদায় নেবার সময় তাই পৃথিবীর ধূলায় তাঁর প্রণাম রেখে যাচ্ছেন,

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

১৩ সংখ্যক কবিতায় কবি তরুণ বয়সের ভালবাসার কথা বলেছেন। তারুণ্যের ভালবাসাকে কবি উচ্ছল ঝর্ণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজ বৃদ্ধ বয়সে সেই ভালবাসাকে নিখিলের বৃহৎ শান্তির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করছেন।—

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারি দিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

১৯, ২০, ২১ এবং ২৩ সংখ্যক কবিতাগুলি কবি তাঁর রোগশয্যার সেবক-সেবিকাদের উদ্দেশে রচনা করেন। তাঁর প্রতি মানুষের প্রীতি ও ভালবাসা-কেই জীবনের শ্রেষ্ঠ দান বলে তিনি মনে করেছেন।

৫. ১৮, ২৪, ২৫ এবং ২৬ সংখ্যক কবিতা এই শ্রেণীর। কবি শেষ জীবনে আত্মসমীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিরও সমীক্ষা করেছেন। ১৮ সংখ্যক কবিতায় কবি বার্ধক্যের রিক্ততার সঙ্গে ফসল-শূন্য রিক্ত মাঠের তুলনা করেছেন। ফসল কাটা হয়ে যাবার পরও মাঠে তুচ্ছ শাক জন্মায়, চৈত্রের নদী

শুষ্ক তবু তার তীরে বুনো ফুল ফোটে, তেমনি কবির জীবনের সৃষ্টির প্রাচুর্যের লগ্ন অস্তমিত হলেও সৃষ্টিক্ষমতা একেবারে নিঃশেষিত হয় নি। অতীত সৃষ্টির গৌরবে কবি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছেন।—

জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয় নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি।

২৪, ২৫ এবং ২৬ সংখ্যক কবিতায়ও নিজের কাব্যসৃষ্টি এবং সাধারণভাবে সাহিত্য-সৃষ্টির কথা বলেছেন।

এ ছাড়াও আরোগ্য-এ আরও অনেক কবিতা আছে। সবগুলির মধ্যে বৃদ্ধ কবির জগৎ এবং জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা ব্যক্ত হয়েছে এবং এক কথায় সমগ্র বিশ্ব এবং মানবজীবন এই কাব্যের বিষয় হয়েছে।

জন্মদিনে

এই গ্রন্থটি ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়। রোগশয্যায় এবং আরোগ্য কাব্যের ভাবধারার পরিণত প্রকাশ দেখতে পাই এই কাব্যে। এই কাব্যের নাম যদিও জন্মদিনে তবু এখানে জীবন-শেষের ইঙ্গিতই বড় হয়ে উঠেছে। জগৎ, জীবন এবং বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে এখানে কবির দার্শনিক প্রজ্ঞার অপূর্ব পরিচয়।

শেষ পর্যায়ের কাব্যে জন্মদিন-সংক্রান্ত চিন্তা বার বারই কবিকে আলোড়িত করেছে। প্রতি বছর জন্মদিন তাঁর কাছে নূতন তাৎপর্য বহন করে এনেছে।

এই কাব্যে জগৎ, বিশ্বসৃষ্টি এবং সত্তার অন্তরতম রহস্য উন্মোচনের প্রয়াসই মুখ্য হলেও মানবজীবন এবং নিখিল বিশ্বের মানবাত্মার সঙ্গে আত্মীয়তালাভের বাসনাও ব্যক্ত হয়েছে। তবু সমগ্র কাব্যকে ঘিরে রয়েছে একটি 'মহাদূরত্ব' বা মৃত্যুর উপলব্ধি।

১ সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর মর্ত্যজীবনের জন্মদিনের উৎসবে জীবনের অন্তরতম সত্তার দূরত্বকে অনুভব করেছেন। জন্মদিন হয় মর্ত্যজীবনকে ঘিরে, কিন্তু কবি-আত্মা তো এই খণ্ড জীবনে আবদ্ধ নয়। জন্মদিনের উৎসবে কবি এই দূরত্বকে অন্তরে অনুভব করছেন—

আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।

২ সংখ্যক কবিতাটিতে কবির আত্মরহস্যানুসন্ধান, কবি তাঁর জীবনে বহু জন্মদিন প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজের বহু বিচিত্র রূপ দেখেছেন। অতলান্ত প্রাণসমুদ্রের 'তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে' তাঁর আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু সৃষ্টির রহস্যের যবনিকা তার সামনে উন্মোচিত হয় নি। কবি আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।—

প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,
এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।

৫ সংখ্যক কবিতায় কবি সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের ধারায় আপন আত্মার ক্রম-বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। সৃষ্টির আদি যুগে যখন 'নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা' অসীম শূন্য প্লাবিত করেছিল, তখন অন্তহীন সেই আকাশে স্ফুলিঙ্গের মতো বহু শতাব্দী ধরে কবি অবস্থান করেছেন, তারপর ক্রমে জড়জীবন, পশুজীবন অতিক্রম করে মানবজীবন লাভ করলেন। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি নানা অবস্থা এবং রূপের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। মানুষের জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতের স্বপ্ন সবেরই অভিব্যক্তি তিনি জীবনে উপলব্ধি করেছেন। কোন্ রহস্য সূত্র অবলম্বন করে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন আবার চলে যাবেন নেপথ্যে।

১০ সংখ্যক কবিতাটির রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি বিশেষ মূল্য আছে। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির অপূর্ণতার স্পষ্ট স্বীকৃতি। প্রকৃতি, জগৎ ও মানব-জীবন নিয়েই সম্পূর্ণ সৃষ্টি। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অপূর্ণতাকে তিনি পরিব্রাজকের বর্ণনায় পূর্ণ করে নেন, কিন্তু মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা তা দূর করার জন্য সর্বসাধারণের অন্তরে প্রবেশ করতে হবে। মানুষের অন্তরের মহিমাকে জানতে হলে তার সঙ্গে অন্তরের যোগ প্রয়োজন, কিন্তু কবি অভিজাত সমাজভুক্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব হয় নি। তিনি সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তির উচ্চাসনে নির্বাসিত। তাই ভবিষ্যতের কবির জন্য অপেক্ষা করছেন, যিনি এই অবহেলিত মানুষের একজন হবেন এবং তাদের

যথার্থ পরিচয় কাব্যে ফুটিয়ে তুলবেন। কিন্তু তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন যে এই জনসাধারণের জীবন নিয়ে রচিত সাহিত্য যেন ভঙ্গী-সর্বস্ব না হয়।—

সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজ্‌দুরি।

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মানব-চেতনার এক অসামান্য স্বাক্ষর। প্রকৃত গণসাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর মতামত এখানে জানা যায়।

১২ সংখ্যক কবিতাটিও একটি বিশিষ্ট কবিতা। এখানে কবির দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ। দীর্ঘকালের বাণীর সাধনার কথা মনে করে কবি ভাবছেন তাঁর সাধনা বুঝি-বা ব্যর্থ হয়েছে। তবু তিনি জানেন তাঁর রচনায় অজানার পরিচয় নিহিত আছে এবং বাক্যের মধ্য দিয়েই তাঁর কাব্যে বাক্যাতীতের প্রকাশ হয়েছে। আজ অজানার দূত মৃত্যুসিন্ধুর পার থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছে, তাই কবি অনুভব করছেন তাঁর যাবার সময় সমাগত।

জীবন যে তমিস্রার পারে গিয়ে মেশে, সেখানে সব মুখরতা স্তব্ধ হয়ে যায়। সকল সংশয়-তর্ক, লোকখ্যাতি, সবই কবির তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। তিনি অনুভব করছেন তাঁর সত্তা আলোহীন অন্ধকারহীন, পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। যেখানে সব বাহ্য বৈষম্য, পার্থিব চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেখানেই কবি দিব্য অনুভূতি লাভ করবেন। কিন্তু রূপকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি, রূপের পদ্মেই অরূপমধু পান করেছেন। নিরাসক্তভাবে রূপ থেকে রূপাতীতের সন্ধান করবেন।

কবি অনুভব করছেন পার্থিব জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শ্লথবৃন্ত ফলের মতো ছিন্ন হয়ে আসছে। তিনি যেন অসীমের মধ্যে আপনাকে বিস্তৃত করে দিচ্ছেন। কবি-জীবনের পশ্চাতের ছবি ক্ষীণ হয়ে আসছে। তিনি মৃত্যু-সমুদ্রের অন্ধকার তীরে দাঁড়িয়ে অনুভব করছেন, অসীম পথের পথিক তিনি জীবনের কাজে মর্ত্যে এসেছিলেন, যাঁরা জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছেন, সেই সব দার্শনিকদের উপলব্ধিই তাঁর অসীম পথের পাথেয়, তাঁদের উদ্দেশ্যে কবি প্রণাম জানাচ্ছেন—

মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশ্যে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।

২১ সংখ্যক কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের একটি ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে কবির সমসাময়িক ঘটনার প্রতি সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসী মনোভাব এবং রাজনীতির ঘৃণ্য প্রভাবকে কবি ধিক্কার দিয়েছেন। যুদ্ধের হত্যালীলা এবং ধ্বংস কবিকে ব্যথিত করেছে, কিন্তু তিনি আশাবাদী। এই ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যে তিনি নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পান। মানবের সৎ বুদ্ধির জাগরণ আবার হবে

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নব সৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

২৬, ২৭, ২৮ এবং ২৯ সংখ্যক কবিতাগুলিতে কবির জীবন ও মৃত্যুর রহস্য রূপায়িত হয়েছে। কবিতাগুলিতে কবির বিষণ্ণতার ছাপ আছে। তিনি কামনা করেছেন তাঁর মৃত্যু-মুহূর্ত যেন সুন্দর হয়। আবার মৃত্যুর মধ্যে নবজীবনের ইঙ্গিত দেখেছেন ২৭ সংখ্যক কবিতায়। জীবন যেন মৃত্যুস্নানে শুচি হয়ে নবজীবনের নির্মল প্রভাতে জাগ্রত হয়—

নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে।

ছড়া

এই গ্রন্থটি ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। এর মুদ্রণ শুরু হওয়া কবি দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এটি প্রকাশিত হয় নি। শেষ জীবনের অসুস্থতার সময় কবি এর কবিতাগুলি মুখে মুখে রচনা করেন।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি অবাস্তব এবং অদ্ভুত উক্তির সমাবেশে গঠিত। ছড়াগুলিতে হাল্কা খুশীর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে ভাবের গুরুত্ব নেই, শুধু কথা ও শব্দের নানা লঘু ব্যবহার। এগুলি যেন শুধু আনন্দ বিতরণের জন্যই রচিত হয়েছে। কবি নিজেও এই গ্রন্থের ৭ সংখ্যক ছড়াটি প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছিলেন—"অবচেতন মনের কাব্য রচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারি এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তাহলেই আশাজনক হবে।"[১]

ছড়াগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে মিলের অপ্রত্যাশিত চমক। মিল যদি খুব প্রত্যাশিত হয় তবে পাঠকের মনে গতির সঞ্চার সম্ভব হয় না। কবি এই শব্দ-যোজনায় অনায়াস ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

শেষ পর্যায়ের কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে এই ছড়া। ছড়ার ছবি ইত্যাদি গ্রন্থের সংযোগ খুব গভীর নয়, বরং খানিকটা ভিন্ন সুর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ছড়াগুলিতে উদ্ভট রস থাকলেও এগুলি শুধুই ছোটদের জন্য নয়, বড়দেরও মনের খোরাক এখানে আছে। পূর্ব পূর্ব পর্যায় অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যায়ে অনেক বেশি বাস্তব। তাই স্থানে স্থানে জগতের অসঙ্গতি এবং মনুষ্য-চরিত্রের অসঙ্গতি এই ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এখানে যে তির্যক ব্যঙ্গরস তা শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার অনুরূপ।

লোক সাহিত্যে ছড়া বলতে যা বোঝায় এগুলি কিন্তু সেই জাতের ছড়া নয়। এগুলিকে লৌকিক ছড়া না বলে সাহিত্যিক ছড়াই বলা উচিত। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ১ সংখ্যক ছড়াটিতে দেশবাসীর প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লক্ষণীয়—

> পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
> সমুদ্দুরের এ পারেতে একেই বলে লড়াই।
> সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলেছে নাচানাচি,
> বাংলাদেশের তেঁতুল বনে চৌকিদারের হাঁচি।

১. শনিবারের চিঠি (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬), পৃ. ২৯৫

সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদম দিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে ;

শেষলেখা

এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন—"এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই।

'শেষলেখা'-র কয়েকটি কবিতা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত ; অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেইগুলি লিখিয়া লইতেন। পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।"[১]

এই কাব্যে কবি তাঁর জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে চরমতম উপলব্ধির কথা বলেছেন। জীবন এবং মৃত্যু তাঁর কাছে সমান তাৎপর্যময়, সমান সত্য। মৃত্যুর স্বরূপ আজ তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে, তাই তিনি নিঃশঙ্ক, দ্বিধাহীন। মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় তিনি জীবনকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন। মানবের অন্তরাত্মা যে চিরন্তন প্রাণের প্রকাশ, সেই প্রাণ মৃত্যুর অতীত। প্রান্তিক থেকে জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে যে দার্শনিক চিন্তা রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে-র মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এখানে তার চরম প্রকাশ।

এই কাব্যের কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত নিরাভরণ এবং সরল। এখানে আমরা দেখি কবির ধ্যান-দৃষ্টি যেন প্রসারিত হয়ে গেছে। ঋষি কবির প্রজ্ঞালব্ধ অনুভূতির প্রকাশ এই কবিতাগুলি—"মুক্ত স্বচ্ছ দিব্য জ্যোতির্ময় আজ তাঁহার অন্তরের কবি পুরুষের রূপ ; বিরলভাষ, বিরলালংকার, স্বচ্ছ, ঋজু বাণীমূর্তিতে সেই জ্যোতিদীপ্ত পুরুষের প্রকাশ। এই পুরুষের অলংকারে কোন্ প্রয়োজন ? কাজেই মিল নাই, উপমা নাই, বর্ণনা নাই, ঝংকার নাই, সজ্জা বিন্যাস কিছুই নাই। শুধু দু'একটি কথা, যে কথা ক'টি না বলিলে নয়—স্পষ্ট, সরল, সংহত, কঠিন কয়েকটি কথা, যেন মন্ত্র, যেন চরমতম অভিজ্ঞতার পরমতম বাণী।"[২]

এই কাব্যে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে অন্তিম যাত্রার জন্য প্রশান্ত মানসিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায় ১ সংখ্যক কবিতায়—

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬ খণ্ড (বি. ভা. ১৩৬৫), পৃ. ৬৪৭

২. ড. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬৯), পৃ.২৪৭

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

মৃত্যুকে অতিক্রম করে আত্মস্বরূপের পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তাই উদাসীন দৃষ্টিতে তাঁর এতদিনের কাব্য সাধনার দিকে তাকিয়ে মনে করছেন এগুলি মূল্যহীন,—৯ সংখ্যক কবিতায়—

বাণীর মূরতি গড়ি
এক মনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।

... ...

কোন্ স্বপ্ন বাঁধিবারে
বহিয়া ধূলির ঋণ
দেখা দিল
মানবের দ্বারে

... ...

কখন সে অন্য মনে গেছে ভুলি—
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্‌বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো,

... ...

পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।

দুঃখের তপস্যায় কবির যে অনুভূতি হয়েছে তার একদিক ৭ সংখ্যক কবিতায়—

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে,
সন্ধান মেলে না তার।

কালে সবই ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও যেন কিছু রয়ে যায়। জীবন-মৃত্যুর মাঝে লয় পায় না। তাঁর বিশ্বাসের এই দিকটি প্রকাশ করেছেন ২ সংখ্যক কবিতায়—

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
একথা নিশ্চিত মনে জানি।

সৃষ্টির বিচিত্র পথে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ এবং মৃত্যুর ছলনা যে অনায়াসে সহ্য করতে পারে, সেই আপন অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, সেই পায় অক্ষয় শান্তির অধিকার। বিশ্বাসের নিবিড়তায় কবি আত্মস্বরূপ দর্শন করলেন ১১ সংখ্যক কবিতায়—

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

আত্মার জ্যোতির্ময় রূপের উপলব্ধি তাঁর হয়েছে, দৃষ্টি অসীম শূন্যে প্রসারিত, তবু তিনি মর্ত্যজীবন ও মানবের প্রীতির কথা ভুলতে পারেন নি। তাই তাঁর ইচ্ছা ১০ সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে—

আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের পরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যের এই আলোচনায় আমরা সাধারণভাবে এই সময়ের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্বকে চিহ্নিত করতে পারি। এই সময়ে কবি শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ক্লান্ত বিব্রত এবং বৃহত্তর কোন বোধ ও বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হতে আগ্রহী। এই কবিতাগুলি তাই শুধু কবিতাই নয়, এ হল অসাধারণ মানুষের নির্মোহ, সাহসিক কিছু উপলব্ধি এবং স্বীকারোক্তিও।

কোন নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে সাহিত্যকে বিশেষ করে কাব্যকে বিচার করা সম্ভব নয়। গণ্ডিকে অতিক্রম করে নূতন কিছু সৃষ্টি করাই প্রতিভার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য এর উজ্জ্বল নিদর্শন। এই কাব্যগুলির বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। কাব্য কোন বিশেষ রীতির আনুগত্য স্বীকার না করলেও এর মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র থাকে যা এই শেষ পর্যায়ের কবিতার বহু বিচিত্র রূপের মধ্যেও বর্তমান। এটাই এই কাব্যগুলির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

এই সময়ের কাব্যগুলি রবীন্দ্র-কবিমানসের এক একটি পর্যায়কে অতিক্রম করার ইতিহাস। প্রকৃতি, সমাজ, মানব এবং ব্যক্তিজীবন প্রভৃতিকে কবি নূতনভাবে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে কাব্যরূপ দিয়েছেন। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ আর অবিমিশ্রভাবে রূপমুগ্ধ রোমান্টিক কবি নন। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে মিশেছে বাস্তবা ভূতি। কল্পনা, অনুভব এবং বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবার ইতিবৃত্ত এই শেষ পর্যায়ের কবিতা।

> মনের মধ্যে ঘোলা স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে
> ভেসে চলে ফেনিয়ে ওঠা অসংলগ্নতা।
>
> —জন্মদিনে, ২৪ সংখ্যক কবিতা

নিতান্ত ব্যক্তিগত লেখার মধ্যেও ব্যক্তি 'আমি' বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। আবার এই বিশ্বমানব চেতনা মানববন্দনায় সংহত হয়েছে।

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত সন্ধানী। জীবজগতের অতি ক্ষুদ্র সদস্য কীট, মাকড়সা, কুকুর ইত্যাদিরাও তাঁর কৌতূহলের বাইরে ছিল না। আবার

এরই পাশাপাশি চলেছে 'আদিজ্যোতি'র ধ্যান। রবীন্দ্র-পরবর্তী অতি আধুনিক বাংলা কাব্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুব কাছে চলে এসেছে। কাব্যের স্পর্শকাতরতা যেন কিছুটা কমে গেছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গদ্য-কবিতার ক্ষেত্রে অনেক তুচ্ছ বস্তুকে কাব্য রূপ দিয়েছেন, কিন্তু বস্তুটাই তাঁর কাছে শেষ সত্য হয় নি, রসতীর্থপথে গিয়েই তাঁর যাত্রা শেষ হয়েছে। তাঁর কবিস্বভাবের এই দিকটি সমালোচিত হয়েছে। তিনি অভিযোগ স্বীকারও করেছেন। এই সময়ের কাব্যে তাঁর কাব্যকলার অপূর্ণতার মহান স্বীকৃতি বিনম্র সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

এই কাব্যগুলি লেখার পিছনে কবির শুধুমাত্র শিল্পীর প্রেরণা নয়, বহু অভিজ্ঞতাও যুক্ত হয়ে গেছে। এদের সবগুলি কাব্যের পক্ষে শোভন হয় নি হয়ত, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার মহান উপলব্ধির স্বীকৃতি হিসাবে এগুলি মূল্যবান। গদ্য-কবিতাগুলিতে সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিকতায় নেমে আসতে চেয়েছেন, কিন্তু এটা সর্বতোভাবে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজেও বুঝেছেন এটা। গদ্য-কবিতার উদ্ভাবন তাঁর এই পর্যায়ের কাব্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলেও দীর্ঘকাল তিনি এর চর্চা করেন নি। যে 'সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন' নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তাই হয়তো তাঁকে জনসমাজের অতি নিকট-সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত। তাই স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন নিতান্ত নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা তাঁর এই পর্যায়ের কবিতায় গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের কথা যত না বলতে পেরেছেন মহামানবের আবির্ভাবের বিশ্বাসে তিনি স্বস্তি বোধ করেছেন বেশি। তিনি যে সাধারণ জনজীবনের দোসর ছিলেন না একথা অতি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন।—

আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে বাস্তবের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

—নবজাতক, 'এপার ওপার'

রাজনীতি বা সমাজ-পরিবেশকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সমগ্র মানবমহিমার কাছে এসব গৌণ হয়ে গেছে। জীবনের শেষভাগে স্বার্থপর, সমাজ ও রাষ্ট্রের নগ্ন রূপ দর্শন করে কবি মহামানবের আবির্ভাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

শেষ পর্যায়ের কাব্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের রূপান্তর। একেবারে শেষতম কাব্য-পরিমণ্ডলটিতে কবি নবতর এক উপলব্ধিতে স্থিত হয়েছেন—'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম।' এই সাংকেতিক কবিতাগুলিতেই কবির মহত্তম সার্থকতা। কবি চেতনার গভীরে প্রবেশ করেছেন, জীবন-মৃত্যু সেখানে এক হয়ে গেছে। এই জাতীয় তীব্র সংবেদনশীল কবিতা বাংলা কাব্যে সংখ্যায় অধিক নয়। এবং এগুলি উত্তরকালে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও কাব্যের সংমিশ্রণের অপূর্ব নিদর্শন হয়ে রইল। বাহ্যিক এবং আত্মিক সংকট যে কিভাবে সর্ব প্রতিকূলতার উর্ধ্বে এক সুদূর রহস্যময় কাব্য-রূপ লাভ করতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলিই তার প্রমাণ।

কাব্যের আলোচনায় কখনও শেষ কথা বলা যায় না। আর এই শেষ পর্যায়ের কাব্য যা উত্তরকালের কাছে প্রচণ্ড বিস্ময় তার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটন অক্লান্ত সাধনা ও মনন-সাপেক্ষ। প্রতিবার পাঠেই পাঠক আবিষ্কার করেন নূতন ইঙ্গিত। তাই রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যের স্বরূপ এখনও অনাবিষ্কৃত। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—'যে দুর্দম প্রাণশক্তির পরিচয় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন, তার পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনার জন্য আশি বছরও··· যথেষ্ট নয়। কিন্তু এই তিথি অপূর্ণ রইলো, পঞ্চদশী পূর্ণিমায় পৌছলো না।'[১]

১. কবিতা পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ১.

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী—কাব্য-পরিক্রমা।

২. অরুণকুমার বসু—রবীন্দ্র-বিচিন্তা।

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-মনীষা, রবীন্দ্র-বিতান।

৪. আবু সঈদ আইয়ুব—আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ।

৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা।

৬. কণক বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

৭. ক্ষুদিরাম দাস —চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়।

৮. গুণময় মান্না—রবীন্দ্র-কাব্যরূপের বিবর্তন-রেখা।

৯. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবিরশ্মি।

১০. জগদীশ ভট্টাচার্য—কবি-মানসী।

১১. তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ পর্ব।

১২. দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—রবীন্দ্রমন ও রবীন্দ্রসাহিত্য।

১৩. ধীরানন্দ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা।

১৪. ধীরেন্দ্র দেবনাথ—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু।

১৫. নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা।

১৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী (১ম-৪র্থ খণ্ড)।

১৭. প্রতিমা ঠাকুর—নির্বাণ।

১৮. প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ।

১৯. বিশ্বপতি চৌধুরী—কাব্যে রবীন্দ্রনাথ।

২০. হরপ্রসাদ মিত্র—রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ।

২১. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর্যপ্রভাব।

২২. শচীন সেন—রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়।

২৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানস।

২৪. শিশিরকুমার ঘোষ - রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য।

২৫. শুদ্ধসত্ত্ব বসু—রবীন্দ্র-কাব্যে গোধূলি পর্যায়।

২৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সৃষ্টিসমীক্ষা, বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা।
২৭. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা।
২৮. সুবোধ সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ।
২৯ সুশীলকুমার গুপ্ত—রবীন্দ্র-কাব্যপ্রসঙ্গ : গদ্য কবিতা।
৩০. স্বামী গম্ভীরানন্দ—উপনিষদ রচনাবলী।
৩১. Caird John—The Philosophy of Religion.
৩২. Rabindranath Tagore, Centenary Volume.
৩৩. P. B. Shelley—Adonais.
৩৪. T. S. Elliot—Points of view.